স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে
পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক
অজয় বর
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২
রেজিস্ট্রেশন নাম্বার-A00IR1200218

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. পার্থ প্রতিম বসু
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৫

Certified that the Thesis entitled

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ submitted by me for the award of the Degree of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Partha Pratim Basu, Professor, Department of International Relations, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor:

PROFESSOR
Dept. of International Relations
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Dr. Partha Pratim Basu
Professor
Department of International Relations
Jadavpur University
Kolkata 700032
Dated 24.04.25

Candidate:

(Ajay Bar)
Dated

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মায়ের প্রতি,

যাঁদের ভালবাসা, ত্যাগ ও আশীর্বাদ ছাড়া এই পথচলা সম্ভব হত না।

এই গবেষণা সন্দর্ভটি তাঁদের চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		i-iii
সংকেতাবলি		iv-vi
সারণি সূচি		vii-x
চিত্র তালিকা		xi
প্রথম অধ্যায়ঃ	ভূমিকা	১-২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীঃ একটি সামগ্রিক পরিচয়	২৭-৫৯
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি	৬০-১১৪
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	স্বাধীনতার পর বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ	১১৫-১৮৩
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি কেস স্টাডি	১৮৪-২২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	উপসংহার	২২৬-২৪২
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি		২৪৩-২৫৮
পরিশিষ্ট		২৫৯-২৬৫

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে 'সংখ্যালঘু' শব্দটি শুধুমাত্র একটি সংখ্যাগত ধারণা নয়, বরং এটি এক জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, যা রাষ্ট্রীয় কাঠামো, জাতীয় পরিচয়ের নির্মাণ ও নাগরিকত্বের চর্চায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর অবস্থান ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এই চর্চা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেখানে ধর্ম, জাতি, ভাষা ও জাতিগত বৈচিত্র্য অত্যন্ত প্রবল এবং একইসাথে সংঘাতপূর্ণও। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মত দেশগুলোতে সংখ্যালঘুদের অধিকার, নিরাপত্তা, প্রতিনিধিত্ব ও অন্তর্ভুক্তি বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, এবং অনেক সময় তা রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মভিত্তিক পরিচয় ও সংখ্যাগত শ্রেণিবিন্যাস ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রচর্চায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে আসছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থান বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়, যারা একদিকে দেশভাগের জটিল অভিজ্ঞতা বহন করে এনেছে এবং অন্যদিকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠেছে—তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান একটি জটিল, বহুস্তরীয় গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু চর্চা কেবল একটি একাডেমিক অনুশীলন নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান—যেখানে গবেষক ও চিন্তাশীল নাগরিকদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু কণ্ঠস্বরকে সামনে আনা এবং ক্ষমতার অসম বণ্টনকে উন্মোচন করা। আমার গবেষণার বিষয় **"স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ"**। এই গবেষণা পত্রে 'সংখ্যালঘু' ধারণাটিকে 'ধর্মীয়' মানদণ্ডের নিরিখে বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবন অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই দুই সম্প্রদায় দক্ষিণ এশিয়ার বিভাজনের উত্তরাধিকার বহন করছে, এবং তাদের বাস্তবতা সংখ্যালঘু চর্চার গভীরতর ধারা অনুধাবনে সাহায্য করে। এই গবেষণায় আমার ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক আগ্রহের উৎস নিহিত আছে দক্ষিণ এশিয়ার বিভাজন-পরবর্তী ইতিহাস, সংখ্যালঘুত্বের অভিজ্ঞতা, এবং রাষ্ট্র ও পরিচয়ের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও জাতিগঠনমূলক সংযোগ সব সময়ই আমাকে আকৃষ্ট করেছে—বিশেষত যখন দেখি, একটি ভৌগোলিক সীমারেখা কেবলমাত্র ভূমি বিভাজন করে না, বরং তা মানুষের স্মৃতি, আত্মপরিচয় ও সামাজিক সম্ভাবনাকেও ভিন্নধর্মী বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের জটিল বাস্তবতা, পাশাপাশি এখানকার মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রাষ্ট্রের প্রতি আস্থার প্রশ্ন—এই দুই অভিজ্ঞতা আমাকে ভাবতে সাহায্য করেছে সংখ্যালঘুত্বকে শুধুমাত্র সংখ্যাগত পরিসংখ্যান হিসেবে নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক সামাজিক

অবস্থান হিসেবে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রের নীতি ও ক্ষমতার কাঠামোর মধ্য দিয়ে তারা কীভাবে টিকে থাকে এবং নিজেকে রূপান্তরিত করে, তা অনুধাবন করা আমার গবেষণার অন্যতম চালিকা শক্তি।

গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য ও গবেষণা সন্দর্ভ সঠিকভাবে রূপায়নের জন্য একজন গবেষোকের নিরলষ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তা সার্থকভাবে তা রূপায়িত হয়। একজন গবেষক তার নিরলস প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গবেষণা কার্য সম্পাদন করলেও পারিপার্শ্বিক বহু মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তা কখনোই সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না। আমার গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা, সহযোগিতা ও প্রেরণা লাভ করেছি। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার এই গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য সবথেকে বেশি যিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার গবেষণা সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পার্থ প্রতিম বাসু মহাশয়। তাঁর অনুপ্রেরণা, সামগ্রিক সহযোগিতা, মূল্যবান পরামর্শ, প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় আমার গবেষণা সন্দর্ভ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি মানসিক দিক থেকে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রানিত করেছেন। তাই আমি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক পার্থ প্রতিম বাসু মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রিসার্চ এডভাইজারি কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রতি – অধ্যাপক অনিন্দ্য জ্যোতি মজুমদার মহাশয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ; অধ্যাপক শেখর শীল মহাশয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ তাঁদের মূল্যবান মতামত ও গঠণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমার গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবাশিস চ্যাটার্জী মহাশয়ের প্রতি, যিনি কেবল আমার গবেষণাকাজে পরামর্শ প্রদান করেননি, বরং পুরো গবেষণাকালীন সময়ে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ-খবর রেখেছেন, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর সহমর্মিতা, সদা-উৎসাহী মনোভাব এবং অনুপ্রেরণাদায়ক উপস্থিতি আমার গবেষণাপথের কঠিন সময়গুলো সহজ করে তুলেছিল। আমি তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিজয় কুমার দাস মহাশয় ও অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে প্রেরণা ও সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

আমার গবেষণা কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন তারকনাথ দাস রিসার্চ সেন্টারের শ্রীমতি কঙ্কনা দাস মহাশয়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের গ্রন্থাকারিক পার্থ দা, তুষার দা। তাঁদের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রান্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ গ্রন্থাগার (MAKAIAS), সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্ডো- বাংলাদেশ

রিলেশনস গ্রন্থাগার (CRIBR), জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য সরকারের আর্কাইভ, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের (পার্ক সার্কাস পশ্চিমবঙ্গ), আধিকারিকদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমার গবেষণা সন্দর্ভের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করে সাহায্য করেছে।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার ভ্রাতৃসম সন্দীপ সামন্তকে তাঁর অসীম সহায়তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন গবেষণাপথের কঠিন মুহূর্তগুলোকে অনেক সহজ করে তুলেছিল। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই আলি দা, সৌরিশ দা, সুশান্ত দা, মিঠুন দা, ও অভীক দা, আমার সহপাঠী মনোজিত মণ্ডল, শুভঙ্কর দাস, আমার জুনিয়র গোকুল, নওয়াজ, রাশিদুল কে। গবেষণাকালে তাঁদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী মাসিমা-মেসোমশাই ও অর্ণব দা'কে যাদের সান্নিধ্য আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সেই সকল উত্তরদাতাদের, যাঁরা অকপটে তাদের জীবনের কথা, সংগ্রাম, আশাভরসা ও হতাশার গল্প ভাগ করে নিয়েছেন—তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও কণ্ঠ এই গবেষণাকে কেবল তথ্যনির্ভর নয়, বরং মানবিক অর্থবোধে পূর্ণ করে তুলেছে। এই গবেষণা প্রকল্প নির্মানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের [UGC- University Grants Commission] কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের আর্থিক সাহায্য এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা দান করেছে।

সবিশেষ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বাবা-মা এবং শ্বশুরমশাই ও শাশুড়ি মা'কে তাঁদের আশীর্বাদ এবং নিঃশর্ত সমর্থন ছাড়া আমার এই গবেষণার যাত্রা সম্ভব হত না। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দাদা সঞ্জয়, উত্তম, মুকুল, ভাই জন্মেঞ্জয় ও উজ্জ্বল, দিদি শিলা ও কৃষ্ণা কে। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ ও ভালবাসা জানাই আমার স্নেহধন্যা অপর্ণা (অপা) ও লাবন্যকে যাদের সাহচর্য ও নিঃশর্ত ভালবাসা গবেষণার কঠিন সময়ে আমার জন্য এক অনুপম প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিণী রীনা সামন্ত'কে, যাঁর নিরলস সমর্থন, অন্তহীন ধৈর্য, এবং নিঃশর্ত ভালোবাসা ছাড়া এই দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার যাত্রা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। গবেষণার নানা ক্লান্তিকর মুহূর্তে, সংশয় ও হতাশার দিনে, তিনি নীরবে আমার শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অবিচল উৎসাহ, সমানুভূতি ও বিশ্বাস আমাকে নতুন করে আশাবাদী করেছে, সাহস জুগিয়েছে। আমি তাঁর প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অজয় বর

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

সংকেতাবলি (ABBREVIATION)

ALRD	:	Association of Land Reform and Development
AIFB/FBM	:	All India Forward Bloc/ Forward Bloc Marxist
BAL	:	Bangladesh Awami League
BBC	:	Biplabi Bangla Congress
B. CONG/BC	:	Bangla Congress
BCP	:	Bangladesh Communist Party
BHL	:	Bangladesh Hindu League
BIF	:	Bangladesh Islamic Front
BJP	:	Bharatiya Janata Party
BJP (N-F)	:	Bangladesh Jatiya Party (N-F)
BML	:	Bangladesh Muslim League
BNP	:	Bangladesh National Party
BPP	:	Bangladesh Progressive Party
BWP	:	Bangladesh Workers Party
CONG	:	Indian National Congress
CONG (O)	:	Congress (Organization)
CONG(R)	:	Congress (Ruling)
CONG (I)	:	Congress (Inaira)
CONG (S)	:	Congress (Socialist)
CPI	:	Communist Party of India
CPM/CPIM	:	Communist Party of India (Marxist)
CPML/CPI (ML)	:	Communist Party of India (Marxist-Leninist)
DSP	:	Democratic Socialist Party
EPR	:	Educational Participation Rate
GF	:	Gono Forum

GL	:	Gorkha League
HFCs	:	Hindu Forward Castes
HM	:	Hindu Mahasabha
IJOF	:	Islamic Jatio Oikya Front
INDF	:	Indian National Democratic Front
IOJ	:	Islamic Oikya Jote
J. DAL	:	Jatiya Dal
JIB	:	Jamaat-E-Islami Bangladesh
JK/JKP/JP	:	Jharkhand Party
JP (M)	:	Jatiya Party (Manju)
JP/JD	:	Janata Party/Dal
JS	:	Jana Sangha
JSD	:	Jatiya Samajtantrik Dal
KAPP	:	Krishak Mazdoor Proja Party
KSJL	:	Krishak Sramik Janata League
L. DAL	:	Lok Dal
LSS	:	Lok Sevak Sangha
MCD	:	Minority Concentrate District
MLG/MUL	:	Muslim League
MMA	:	Ministry of Minority Affairs
MSDP	:	Multi Sectoral Development Programme
NAP	:	National Awami Party
NCRLM	:	National Commission for Religious and Linguistic Minorities
NLM	:	National Literacy Mission
PAEP	:	Pakistan Administration of Evacuees Property
PML	:	Progressive Muslim League
PSP	:	Proja Socialist Party

RCP/RCPI	:	Revolutionary Communist Party of India
RPI/RP	:	Republican Party of India
RSP	:	Revolutionary Socialist Party
RSP (ML)	:	Revolutionary Socialist Party (Marxist-Leninist)
SBP	:	Samjukta Biplabi Party
SGSY	:	Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana
SOC	:	Socialist Party
SRC	:	Socio Religious Community
SUC	:	Socialist Unity Center
TMC/AITMC	:	Trinamool Congress/ All India Trinamool Congress
WBSP	:	West Bengal Socialist Party
WBMDFC	:	West Bengal Minority Development and Finance Corporation
WPI/WP	:	Workers Party of India

সারণি সূচি

পৃষ্ঠা

সারণিঃ ২.১. দক্ষিণ এশিয়া দেশসমূহের ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাস (শতাংশের নিরিখে) ৪০

সারণিঃ ৩.১. ১৯৭১-২০১১-এর সেন্সাস-এর বিচারে পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলক ধর্মীয় জনসংখ্যার বিন্যাস নিট বৃদ্ধি (শতাংশে) ৬২

সারণিঃ ৩.২. ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার ৬৩

সারণিঃ ৩.৩. স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার শতাংশে (১৯৫১-২০১১) ৬৭

সারণিঃ ৩.৪. পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশের অধিক মুসলমান জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলার সাক্ষরতার হার (শতাংশে) ৬৯

সারণিঃ ৩.৫. মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া গ্রাম এর সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত মান (শতাংশে) ৭১

সারণি: ৩.৬. মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া গ্রাম এর সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর পেশাগত অবস্থান (শতাংশে) ৭৬

সারণিঃ ৩.৭. পারিবারিক গড় মোট মাসিক আয়ের শ্রেণীকরণ (শতাংশের নিরিখে) ৭৯

সারণিঃ ৩.৮. পরিবারভিত্তিক উপার্জনকারী ও নির্ভরশীল সদস্যদের বণ্টন ৮১

সারণিঃ ৩.৯. বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মান এর একটি পরিসংখ্যানগত উপস্থাপন (শতাংশের হিসেবে) ৮৩

সারণিঃ ৩.১০. পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) এর অধীনে ঋণ বিতরণের প্রতিবেদন (মার্চ, ২০১১) ৯৪

সারণিঃ ৩.১১. আর্থিক বছর অনুযায়ী ঋণ সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা (Financial Year-wise total number of loan beneficiaries) ১০১

সারণিঃ ৩.১২. Financial Year Wise Total Number of Scholarship Beneficiaries ১০২

সারনিঃ ৩.১৩. সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুবিধাভোগী পরিসংখ্যান ১০৩

সারণিঃ ৩.১৪. স্বাধীন বাংলাদেশের আদমশুমারিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শতকরা হার ১০৯

সারণিঃ ৩.১৫. খুলনা বিভাগের জেলা ভিত্তিক সংখ্যালঘু হিন্দু জনসখ্যার শতকরা হার (২০১১-২০২২) ১১০

সারণিঃ ৪.১. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১১৯

সারণিঃ ৪.২. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১২১

সারণিঃ ৪.৩. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১২৩

সারণিঃ ৪.৪. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১২৫

সারণিঃ ৪.৫. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১২৮

সারণিঃ ৪.৬. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৩০

সারণিঃ ৪.৭. পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৩২

সারণিঃ ৪.৮. পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৩৪

সারণিঃ ৪.৯. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৩৫

সারণিঃ ৪.১০. পশ্চিমবঙ্গের ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৩৭

সারণিঃ ৪.১১. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৩৯

সারণিঃ ৪.১২. পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৪১

সারণিঃ ৪.১৩. পশ্চিমবঙ্গের ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৪৩

সারণিঃ ৪.১৪. পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৪৫

সারণিঃ ৪.১৫. পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৪৭

সারণিঃ ৪.১৬. পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৪৯

সারণিঃ ৪.১৭. পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা) ১৫১-১৫২

সারণিঃ ৪.১৮. বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ- ১৯৭৩) ১৫৫

সারণিঃ ৪.১৯. বাংলাদেশ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৭৯) ১৫৮

সারণিঃ ৪.২০. বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৮৬) ১৬০

সারণিঃ ৪.২১. বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৯১) ১৬৩

সারণিঃ ৪.২২. বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৯৬) ১৬৭

সারণিঃ ৪.২৩. বাংলাদেশ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-২০০১) ১৭১

সারণিঃ ৪.২৪. বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-২০০৮) ১৭৪

সারণিঃ ৪.২৫. বাংলাদেশ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ-২০১৪) ১৭৮

সারণিঃ ৪.২৬. বাংলাদেশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ-২০১৮) ১৮০-১৮১

সারণিঃ ৫.১. ১৯৭১ সালের উল্লেখযোগ্য গণহত্যাগুলির একটি সার্বিক চিত্র দেওয়া হয়েছে। ১৯৩-১৯৪

সারণিঃ ৫.২. অভিন্ন বঙ্গ ও বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের জনসংখ্যা শতাংশ ২০৬

সারণিঃ ৫.৩. অর্পিত সম্পত্তি আইনে সংখ্যালঘুদের বেদখলীকৃত জমির পরিমাণ (১৯৭২-২০০৬) ২০৭

সারণিঃ ৫.৪. ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু সংখ্যা ২১০

সারণিঃ ৫.৫. পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যায় উদ্বাস্তু সংখ্যার শতাংশভিত্তিক হার ২১১

সারণিঃ ৫.৬. পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু উপনিবেশ ২১২

চিত্র তালিকা

চিত্র: ৩.১.	মুসলিম জনগোষ্ঠীর মহিলা-পুরুষ এর শিক্ষাগত ব্যবধান	৭২
চিত্রঃ ৩.২.	উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থান	৭২
চিত্রঃ ৩.৩.	মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম ও শহরের পেশাগত অবস্থান	৭৭
চিত্রঃ ৩.৪.	সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলা ও পুরুষ এর পেশাগত অবস্থান	৭৭
চিত্রঃ ৩.৫.	পারিবারিক গড় মাসিক আয়ের চিত্র	৮০
চিত্রঃ ৩.৬.	পরিবারভিত্তিক উপার্জনকারী ও নির্ভরশীলতার গ্রাফিক চিত্রায়ন	৮২
চিত্রঃ ৩.৭.	Graphical Presentation of Loan Beneficiaries	১০১
চিত্রঃ ৩.৮.	Graphical Presentation of Total Number of Scholarship Beneficiaries	১০২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতার পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এশিয়া মহাদেশে নতুন নতুন আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের একটি প্রবণতা সূচিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাষ্ট্র নির্মাণের এই প্রক্রিয়া একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের প্রতিরোধ আন্দোলনের ফল, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বাস্তব পরিণতি। এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-এর ভিত্তিতে ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাজন কেবল একটি ভূখণ্ড ভাগের ঘটনা নয়; এটি ছিল এক সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নির্মাণ, যা উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এক অস্থির, বেদনার্ত ও জটিল বাস্তবতার সূচনা করে। দেশভাগের প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্মীয় পরিচয়—যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য পাকিস্তান এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের জন্য ভারত রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু এই দ্বৈত জাতীয়তাবাদের ধারণা উপমহাদেশের বহুবিধ ধর্ম, ভাষা ও জাতিগত বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করেছিল। ফলে যে রাষ্ট্রগুলি গঠিত হল, সেগুলিতে বিশেষ একটি ধর্ম 'রাষ্ট্রীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা' প্রতিষ্ঠা পেলেও অন্যান্য বহু ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠী 'সংখ্যালঘু' হিসেবে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। যেমন- ভারতের মুসলিমরা, যারা দেশভাগের পরেও ভারতে থেকে গিয়েছিল, তারা রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও প্রায়শই তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হতে থাকে। একইভাবে পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দুরাও 'ভারতের প্রতি অনুগত' - এই অভিযোগে প্রান্তিকতা, সহিংসতা ও ভূমি-অধিকার হারানোর মতো নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। বস্তুতপক্ষে, দেশ বিভাজনের একটি অন্যতম ফল ছিল বাংলার দ্বিখণ্ডন, যার ফলে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু স্বাধীনতার পরও সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ হয়নি; বরং নতুন রাষ্ট্রেও তারা 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। সুতরাং দেশভাগ শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, এটি একটি চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া, যা সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে নিরন্তর পুনর্গঠন করে চলেছে, যা বর্তমানে গবেষণার অন্যতম একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

ভারতবর্ষ যদিও স্বাধীনতা লাভের পর একটি 'গণতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সহ নানাবিধ উদ্যোগ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য গৃহীত হলেও বাস্তব চিত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নের মুখে

পড়ে। ভারতীয় মুসলমানরা দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের কাঠামোগত বৈষম্য, উন্নয়নের অসম বণ্টন এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে পশ্চাদপদতার শিকার। এই প্রেক্ষাপটে ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত সাচার কমিটি দেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র উন্মোচিত করে। উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, মুসলমানরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের চেয়েও অনগ্রসর অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ কম, কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্ব প্রায় নগণ্য।[1] এইসব বাস্তবতা স্পষ্ট করে তোলে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক আদর্শ আর বাস্তব রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরের মাঝে একটি সুস্পষ্ট ফাঁক রয়েছে। এই বৃহত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠে আসে, যা দেশভাগের পর ভারতে থাকা অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে রয়ে যায়, একদিকে রাজ্যটি দীর্ঘদিন বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ঐতিহ্য বহন করেছে, অন্যদিকে এখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান আশানুরূপ নয়। বিশেষ করে রাজ্যের মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দারিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, এবং প্রশাসনিক বঞ্চনার চিত্র প্রকট। যদিও নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলিমদের ভোটব্যাংক হিসেবে দেখা হয়েছে বহুবার, তথাপি তা তাদের ক্ষমতায়নের প্রতীক হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ স্বাধীনতার পরবর্তী সাত দশকে একাধিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে পরিবর্তন, ভূমি সংস্কার, শিল্পায়ন, গ্রামীণ ও শহুরে বিকাশের প্রক্রিয়া, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপান্তর — সবকিছুই সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একইসঙ্গে, দেশভাগের ফলে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন এবং এখানে আসার পর তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া স্থানীয় সমাজ কাঠামো ও আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যে নতুন মাত্রা যোগ করে।

বস্তুতপক্ষে, সংখ্যালঘু (Minority) শব্দটি বর্তমানকালে বহু ব্যবহৃত ও চর্চিত শব্দ। এখন প্রশ্ন হল সংখ্যালঘু কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ অর্থে বলা যেতে পারে, সংখ্যাগত বিচারে যারা সংখ্যায় বেশি তারা সংখ্যাগুরু, এবং যারা সংখ্যায় কম তারা সংখ্যালঘু। এক্ষেত্রে সংখ্যায় কম-বেশি নির্ধারণ করার জন্য জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ডকে ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ, যেখানে বহু জাতি, ভাষা ও ধর্মাবলম্বীর মানুষের বসবাস রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সকল উপাদানগুলিকে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টির নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই ধর্মীয় বিবেচনায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর (যেমন- মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও

[1] Sachar Committee Report, (November, 2006), 'Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India', Govt. Of India

জৈন) মানুষজনকে সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে, 'সংখ্যালঘু' শব্দটি শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর পরিমাণ নির্দেশ করে না, বরং এর মধ্যে নিহিত থাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনে অসমতা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাইরন ওয়েনার এর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েনার (Myron Weiner) তাঁর 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?" প্রবন্ধে বলেছেন যে, "A People who do not share what they regard as the central symbols of the society invariably view themselves as a minority"[2] অর্থাৎ যে সকল মানুষ নিজেদেরকে সমাজের মূলস্তরের প্রতীক বা অংশ হিসেবে মনে করে না তারা সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুত্ব এক বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা, যা প্রায়শই সংখ্যার তুলনায় রাষ্ট্র–সমাজ কাঠামোর সঙ্গে জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান গবেষণায় সংখ্যালঘুত্বকে একটি প্রক্রিয়াগত ও সামাজিক নির্মাণ হিসেবে দেখা হয়েছে—যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দু সম্প্রদায় উভয়েই প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে।

উইল কিমলিকার (Will Kymlicka) তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী, সংখ্যালঘুদের মূলত দুই ধরণের শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—"ন্যাশনাল মাইনরিটি" এবং "এথনিক/ইমিগ্রান্ট মাইনরিটি"। ন্যাশনাল মাইনরিটি সাধারণত একটি স্বতন্ত্র জাতি বা ঐতিহাসিক অঞ্চলভিত্তিক গোষ্ঠী, যাদের রয়েছে আলাদা সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিচয় (যেমন ভারতের কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী)। অপরদিকে ইমিগ্রান্ট মাইনরিটিগণ অন্য দেশ থেকে অভিবাসনপ্রাপ্ত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে বসবাস করেও সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা থাকে[3]। এই ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু উদ্বাস্তুরা ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও রাষ্ট্রীয় নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তারা "ইমিগ্রান্ট মাইনরিটি" হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং একদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা ভারতের বৃহত্তর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে সামাজিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং রাজনৈতিক প্রতীকীকরণের শিকার। অপরদিকে, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুরা সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ, কিন্তু অভিবাসী অভিজ্ঞতা, এবং একটি নতুন রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে অভিযোজন ও অন্তর্ভুক্তিকরণের সংগ্রাম তাদের আবার এক ভিন্ন ধরণের 'সংখ্যালঘুতা'তে আবদ্ধ করেছে। এই দুই ধরণের সংখ্যালঘুত্বের মধ্যে একটি মৌলিক সাযুজ্য হল– উভয় সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রিক নাগরিকত্বের কাঠামোর মধ্যে নিজেদের স্থান নিয়ে এক অনিশ্চয়তা বোধ করেন। তাই এই গবেষণায় সংখ্যালঘুত্বকে কেবল সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, বরং অভিজ্ঞতার, বঞ্চনার ও নাগরিকতার রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতির পরিবর্তনের

---

[2] Weiner, Myron, (1998) 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?' In P. Chatterjee (ed). State and Politics in India, Calcutta, Oxford University Press, p. 462.

[3] Kymlicka, Will (1995), 'Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights', New York, Oxford University Press, P.P. 11-25.

পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা তা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাকে আরও বিস্তৃত এবং প্রাসঙ্গিক করতে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাস্তবতাকেও পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং কেন তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে চলে আসছে (বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে)-সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, দুটি আলাদা রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে থাকা এই দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাব তুলে ধরে, অন্যদিকে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাঠামোতে সংখ্যালঘুদের অবস্থান কীভাবে নির্ধারিত হয়, সে সম্পর্কেও একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কারণ তুলনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, একই সাংস্কৃতিক-ভাষাগত ঐতিহ্যের দুই অংশ কীভাবে ভিন্ন রাষ্ট্রিক কাঠামো ও সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানে পৌঁছেছে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বাস্তবতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কেবলমাত্র তথ্যগত নয়, বরং এটি উপমহাদেশীয় ধর্ম-রাষ্ট্র-পরিচয়ের আন্তঃসম্পর্কিত সংকট ও সম্ভাবনার একটি মূল্যবান অনুসন্ধান। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার একটি মৌলিক যুক্তি নিহিত রয়েছে তাদের ইতিহাস, ভৌগোলিক সংলগ্নতা, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীর কাঠামোর ভিন্নতর বাস্তবতায়। উভয় অঞ্চলই একসময় অবিভক্ত বঙ্গের অংশ ছিল, ফলে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশে অভিন্ন।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review):

সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণামূলক সমস্যা ও ধারণা লাভের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যার দ্বারা গবেষণামূলক বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই গবেষণার ক্ষেত্রে Literature Review দ্বারা সংখ্যালঘুর ধারণা, সামগ্রিকভাবে ভারতের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থান, এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুরা আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে কতখানি উন্নত হয়েছে, কোথায় এখনও বঞ্চনা বিরাজমান, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তব অবস্থান কী? - তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশবিভাজন ও তার পরবর্তী সময়কালে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

লুইস ওয়ার্থ (Louis Wirth) 'Morale and Minority Groups' (1941)[4] তাঁর এই প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির সামাজিক অবস্থা ও জাতীয় ঐক্যের উপর তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। তিনি

[4] Wirth, Louis (1941), 'Morale and Minority Groups', American Journal of Sociology, Vol. 47, No. 3, The University of Chicago Press, p.p. 415-433.

সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সংজ্ঞায়িত করেন এমন জনগোষ্ঠী হিসেবে, যারা শারীরিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে বৈষম্যের শিকার হয় এবং নিজেদের 'ভিন্ন' হিসেবে চিহ্নিত করে। ওয়ার্থ দেখান, সংখ্যালঘুদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অভাবনীয় বৈষম্য এবং ইতিহাসগত নিপীড়ন তাদের জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশেষ করে জাতিগত বিভাজন, ভাষাগত বাধা, এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা সংখ্যালঘুদের জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তিনি যুক্তি দেন, যদি সংখ্যালঘুদের আশা দেওয়া হয় যে তারা সাম্যের মাধ্যমে মূলধারার অংশ হতে পারবে, তবে তারা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ওয়ার্থ মনে করেন যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও বঞ্চনা শুধু সামাজিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে না; বরং বহিরাগত প্রচারণার জন্য সমাজকে বিভক্ত করে দুর্বল করে তুলতে পারে, যেমন নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট প্রচারণার ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তিনি জোর দেন, জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হলে সংখ্যালঘুদের প্রতি সমতা ও মর্যাদার নীতিতে মনোযোগী হতে হবে।

Ted Robert Gurr এবং James R. Scarritt এর 'Minorities Rights at Risk: A Global Survey' (1989)[5] এই প্রবন্ধটি পৃথিবীর ২৬১টি অ-সার্বভৌম, সংখ্যাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং পৃথক ও অসম আচরণের শিকার গোষ্ঠীর ওপর আলোকপাত করে, যাদের লেখকদ্বয় "minorities" বা সংখ্যালঘু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এখানে সংখ্যালঘু বলতে শুধু সংখ্যা নয়, বরং এমন সম্প্রদায় বোঝানো হয়েছে যাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে পৃথক সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় পরিচয় রয়েছে এবং যাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। প্রবন্ধের প্রথম অংশে 'Rights at Risk' ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার – বিশেষত নিরাপত্তা ও জীবিকা – হুমকির মুখে রয়েছে। তাঁরা বলেন, এই ঝুঁকি রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মাধ্যমে, অথবা সামাজিক প্রথার মাধ্যমে তৈরি হতে পারে। প্রবন্ধটি সংখ্যালঘুদের চারটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করে: (ক) রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার গোষ্ঠী, যারা সমান রাজনৈতিক অধিকার পায় না বা দমনমূলক রাষ্ট্রীয় নীতির শিকার হয়; (খ) অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার গোষ্ঠী, যাদের জীবিকার সুযোগ সীমিত বা বঞ্চিত; (গ) স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার গোষ্ঠী, যারা অঞ্চলভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার দাবি করে; (ঘ) ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু, যারা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর আধিপত্য করে। এখানে "rights at risk" বোঝাতে এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যা আসল অধিকারের লঙ্ঘনের বদলে সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে। এটি ছিল একটি নতুন পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ বৈশ্বিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিমাপ করতে পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য উপাত্ত পাওয়া কঠিন। তাঁরা এটাও ব্যাখ্যা করেন যে, সমাজে অনেক গোষ্ঠী হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু তারা ক্ষমতার বাইরে থাকায় "restricted majorities" হিসেবে বিবেচিত হয়, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী বা ইরাকে শিয়া মুসলমানরা।

[5] Gurr, Ted Robert, and James R. Scarritt (1989), 'Minorities Rights at Risk: A Global Survey', Human Rights Quarterly, Vol. 11, No. 3, The Johns Hopkins University Press, p.p. 375-405.

উইল কিমলিকা 'Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights' (1995)[6] বইটিতে মূলত উদারনৈতিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকারের স্থান ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, উদারনৈতিক ন্যায্যতার ধারণাকে পুনরায় চিন্তা করা জরুরি, কারণ উদারনীতি কেবল ব্যক্তিগত অধিকারের সুরক্ষাকেই নয়, সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কিমলিকা এখানে 'জাতিগত সংখ্যালঘু' (ethnic minorities) এবং 'জনগোষ্ঠী' (national minorities)–এর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য তৈরি করেন এবং দেখান যে, এই দুই ধরনের গোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত দাবি ভিন্ন ধরণের সমাধান দাবি করে। কিমলিকা দেখান যে, সমতা (equality) নিশ্চিত করতে হলে অনেক সময় সংস্কৃতি-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বিশেষ অধিকার (group-differentiated rights) দিতে হবে। তবে এই বিশেষ অধিকারের ধারণা তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা উদারনৈতিক মূলনীতির পরিপন্থী নয় বরং তারই সম্প্রসারণ। তিনি "কান্ট্রোল ওভার কালচার" (control over culture) ধারণার মাধ্যমে দেখান যে ব্যক্তির মুক্তি ও আত্মনির্ধারণ (self-determination) যথার্থভাবে অর্জিত হয় তখনই, যখন সে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে পারে। সাংস্কৃতিক অধিকার তাই শুধুমাত্র গোষ্ঠীভিত্তিক দাবি নয়, বরং ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার পূর্বশর্ত। বইটিতে কিমলিকা পশ্চিমা উদারনৈতিক দর্শনের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে দেখান যে, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা দাবি করা হলেও বাস্তবে রাষ্ট্র সবসময় নির্দিষ্ট সংস্কৃতির পক্ষে অবস্থান নেয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি কানাডা, সুইজারল্যান্ড এবং ভারতসহ একাধিক বহুসাংস্কৃতিক রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর যুক্তি হল, উদারনৈতিক মৌলনীতি মেনে চলেও রাষ্ট্রগুলি সংখ্যালঘু জাতিসমূহের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি বিধান করতে পারে এবং উচিতও। তবে কিমলিকা সতর্ক করেন যে, সবধরনের গোষ্ঠীগত দাবি সমানভাবে বৈধ নয়। বিশেষ করে, যদি কোনো গোষ্ঠী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী দাবি করে, তবে সে দাবি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এভাবে তিনি "অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা" (internal restrictions) এবং "বাহ্যিক সুরক্ষা" (external protections)–র মধ্যে পার্থক্য করে দেখান। অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা মানে গোষ্ঠী নিজেদের সদস্যদের স্বাধীনতা খর্ব করে; যা কিমলিকা প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে বাহ্যিক সুরক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির বাইরের চাপ থেকে আত্মরক্ষার বৈধ ব্যবস্থা।

চার্লস টেলর এর 'The Politics of Recognition' (1992)[7] প্রবন্ধটি আধুনিক পরিচয় ও মর্যাদার রাজনীতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ। টেলর যুক্তি দেন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির আত্মপরিচয় গঠনে সামাজিক

---

[6] Kymlicka, Will (1995), 'Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights', New York, Oxford University Press.

[7] Taylor, Charles (1992), 'The Politics of Recognition' In A. Gutmann, (ed). 'Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition', New Jersey, Princeton University Press, p.p. 25-74.

স্বীকৃতি অপরিহার্য। তিনি বলেন, আধুনিক সমাজে কেবল সাম্যের দাবি নয়, বরং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের স্বীকৃতিও ন্যায্যতার একটি মৌলিক শর্ত। টেলর দেখান যে, রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার দাবির আড়ালে অনেক সময় প্রভাবশালী সংস্কৃতির আধিপত্য বজায় থাকে, ফলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি তাদের আত্মপরিচয়ে আঘাত অনুভব করে। তাঁর মতে, সংস্কৃতি ও ভাষার স্বীকৃতি কেবল সৌজন্য নয়, ন্যায়ের অপরিহার্য দাবি। তবে স্বীকৃতির দাবি মূল্যায়নের জন্য তিনি মানবাধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সার্বজনীন নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। বহুসাংস্কৃতিক সমাজে ন্যায়বিচার ও মর্যাদা সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নে টেলরের চিন্তাভাবনা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভিখু পারেখ (Bhikhu Parekh), 'Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory' (2000)[8] এই বইয়ে দেখিয়েছেন যে আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি অধিকাংশ সময় একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি—বিশেষত পশ্চিমা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি—ধরে নিয়ে নীতি তৈরি করে, ফলে সংখ্যালঘু সংস্কৃতিগুলি প্রান্তিক থেকে যায়। তিনি যুক্তি দেন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজে ন্যায় নিশ্চিত করতে হলে কেবল সহনশীলতা নয়, বরং পারস্পরিক সম্মান ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি জরুরি। সংখ্যালঘুদের ধর্ম, ভাষা ও জীবনাচারকে যদি রাষ্ট্র ও সমাজ মর্যাদা না দেয়, তাহলে তা কেবল সাংস্কৃতিক বৈষম্যই নয়, রাজনৈতিক অপ্রতিনিধিত্ব ও ন্যায়ের অভাব সৃষ্টি করে। পারেখ বলেন, সংস্কৃতি আপেক্ষিক ও বহুমাত্রিক, তাই রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণেও বহুস্বর, আন্তঃসংলাপ ও সাংস্কৃতিক নমনীয়তা প্রয়োজন। এই বইটি দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সংখ্যালঘু অধিকারের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

দিলিপ কুমার মহারানা (Dilip Kumar Maharana) 'In Defence of Indian Perspective of Multiculturalism' (2010)[9] প্রবন্ধে ভারতীয় বহুসাংস্কৃতিকতাবাদের একটি গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী রূপায়ণ উপস্থাপন করে, যেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সংবিধানিক বাস্তবতা—পশ্চিমী দেশগুলোর মতো সরকারিভাবে ঘোষিত বহুসাংস্কৃতিক নীতির অনুপস্থিতিতেও—প্রকৃত অর্থে বহুসাংস্কৃতিকতা ধারণ করে আছে। প্রবন্ধটি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির একমুখী ব্যাখ্যার বিপরীতে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে তুলে ধরেছে। মহারানা দেখিয়েছেন যে ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য—ধর্ম, ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির দিক থেকে—একটি বাস্তবতা, যা কেবল রাজনৈতিক শ্লোগানে সীমাবদ্ধ নয় বরং জনজীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়। তিনি বলেন, ভারতের বহুসাংস্কৃতিকতা সংবিধানের মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু অধিকার ও ভাষাগত নীতিমালার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে, যদিও

[8] Parekh, Bhikhu (2000), 'Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory', Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

[9] Maharana, Dilip Kumar, (2010), 'In Defence of Indian Perspective of Multiculturalism', The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 1, Indian Political Science Association, p.p. 69-83.

তা কোনো ঘোষিত "মাল্টিকালচারাল পলিসি" নয়। তিনি আরও তুলে ধরেছেন যে ভারতের সামাজিক বাস্তবতায় 'কম্পোজিট কালচার', 'সার্ব ধর্ম সমভাব', 'বাসুদৈব কুটুম্বকম'-এর মতো ধারণাগুলো কেবল তাত্ত্বিক নয়, বরং এগুলো ভারতীয় নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনচর্চার অংশ। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়, ধর্মীয় স্থানে সকলের অংশগ্রহণ, খাবার, পোশাক, সংগীত ও ভাষার মিশ্রতার মাধ্যমে যে সহাবস্থান তৈরি হয়েছে, তা ভারতের নিজস্ব এক বহুমাত্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

মাইরন ওয়েনার তাঁর "India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?"[10] প্রবন্ধে ভারতের ধর্মীয়, ভাষাগত, জাতিগত ও সামাজিক সংখ্যালঘুদের অবস্থান, চাহিদা এবং আত্মবোধের জটিল বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে। তিনি সংখ্যালঘু ধারণাটিকে শুধুমাত্র সংখ্যার নিরিখে না দেখে, সমাজবদ্ধ আত্মপরিচয়, ক্ষমতার কাঠামো এবং প্রতীকী স্বীকৃতির আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, ভারতে সংখ্যালঘুত্ব একটি আপেক্ষিক ধারণা যা ব্যক্তির অবস্থান, সামাজিক শ্রেণি ও আত্মচেতনার উপর নির্ভর করে। যেমন, মুসলিমরা ভারতে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংখ্যালঘু হলেও জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দুরাই নিজেদের সংখ্যালঘু বলে গণ্য করেন। এখানে তিনি সংখ্যালঘুদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন: ধর্মীয়, ভাষাগত, আদিবাসী এবং জাতিগত/বর্ণগত সংখ্যালঘু। প্রতিটি শ্রেণির ভেতরেও বিভক্তি রয়েছে, যেমন মুসলিমদের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক পার্থক্য, কিংবা শিখদের মধ্যে জাত-শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দাবি ছিল নিজস্ব ভাষাভিত্তিক স্বরাজ্য, যার ফলে ভারতের রাজ্য পুনর্গঠন হয় ১৯৫০-৬০ এর দশকে।

ওয়েনার দেখিয়েছেন, সংখ্যালঘুদের আকাঙ্ক্ষা মূলত "হোমল্যান্ড" (Homeland), "স্বীকৃতি" (Recognition), "সংরক্ষণ" (Reservations), ও "নিরাপত্তা" (security) এর দাবি ঘিরে আবর্তিত হয়। মুসলিমদের জন্য ১৯৪৭ পূর্ববর্তী পাকিস্তান দাবি, শিখদের জন্য পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলন, কিংবা গোর্খাল্যান্ড ও আসাম আন্দোলন—সবই ভূখণ্ডভিত্তিক জাতিগত দাবির বহিঃপ্রকাশ। এর পেছনে রয়েছে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক টিকে থাকার গভীর মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ। প্রবন্ধটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ওয়েনার ক্ষমতা ও প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের মধ্যকার সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সংখ্যালঘুরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবি করেন না, বরং সামাজিক প্রতীকে নিজস্বতার স্বীকৃতি চান। অনেক সংখ্যালঘু মনে করেন, যারা রাষ্ট্রীয় প্রতীকের সাথে একাত্ম হতে পারেন না, তারা প্রকৃত অর্থে 'co-opted' হয়েছেন। এই প্রবন্ধটি শুধুমাত্র ভারতের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি বোঝার জন্য নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থান বিশ্লেষণে এক গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে, যা এই গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

[10] Weiner, Myron, (1998) 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?' In P. Chatterjee (ed). State and Politics in India, Calcutta, Oxford University Press, p.p. 459-495.

Rowena, Robinson (ed). Minority Studies, (2012)[11] গ্রন্থটি ভারতীয় সমাজে সংখ্যালঘু পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সমাজতাত্ত্বিক রোওয়েনা রবিনসনের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও নৃবৈজ্ঞানিক উদাহরণের সংমিশ্রণে গঠিত, যেখানে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রের সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিথষ্ক্রিয়ার জটিল বাস্তবতা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকা পর্বে রবিনসন বহুসংস্কৃতিবাদী কাঠামোর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের অবস্থান বিশ্লেষণ করেন এবং সংবিধান, সংরক্ষণ ও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গও আলোচনা করেন। প্রথম অধ্যায়টি একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন তোলে—কীভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রভাবনা এবং সামষ্টিক জীবনধারার ভিত্তিতে ভারতীয় গণতন্ত্র টিকে আছে। রবিনসন এর মতে, এর উত্তর নিহিত ভারতের একটি বহুজাতিক ফেডারেশন হিসেবে ধারণায়, যা নৈতিক বহুত্ববাদ অনুসরণ করে এবং ব্যক্তি অধিকার ও সামষ্টিক অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। বস্তুতপক্ষে, প্রথম তিনটি অধ্যায় সংখ্যালঘু ধারণার তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে, যেখানে ভারতকে এক বহুজাতিক ফেডারেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা নৈতিক বহুত্ববাদ অনুসরণ করে। শাহ বানো মামলার আলোকে মুসলিম সংখ্যালঘু পরিচয়ের রাষ্ট্রীয় পুনর্নির্মাণ ও তফসিলভুক্ত জাতির ধর্মীয় মাত্রা সম্পর্কেও বিশ্লেষণ রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কচ্ছের মুসলিম, ঔরঙ্গাবাদের বৌদ্ধ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার খ্রিস্টানদের সংখ্যালঘু বাস্তবতা উন্মোচিত হয়, যেখানে দেখা যায় কিভাবে তারা ধর্ম, জাত ও গোত্র ভিত্তিক পরিচয়ের সংযোগস্থলে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাঠামোর সঙ্গে সমঝোতা করে চলে। পারসিদের আধুনিকতাবাদী অন্বেষণ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সংখ্যালঘু মর্যাদা দাবি – উভয় উদাহরণ হিন্দুধর্ম ও সংখ্যালঘুত্বের আইনগত অস্পষ্টতাকে তুলে ধরে। শিখ পরিচয়ের নির্মাণ ও মুসলিম পরিচয়ের প্রতি বলিউড ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সাংস্কৃতিক রাজনীতি সম্পর্কেও গভীর বিশ্লেষণ রয়েছে। এই গ্রন্থটি প্রচলিত সংখ্যালঘু সংজ্ঞার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়ে নানা সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে সংখ্যালঘুত্বের তাৎপর্য খোঁজে। সংখ্যালঘু পরিচয় যে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে গঠিত হয় এবং তার রাজনৈতিক তাৎপর্য সমাজ-রাষ্ট্র ও আইনি প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয় – এ সত্যটিকে গ্রন্থটি সফলভাবে তুলে ধরে।

Rowena Robinson-এর প্রবন্ধ 'Religion, 'Socio-economic Backwardness & Discrimination: The Case of Indian Muslims' (2008)[12] একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ যেখানে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা এবং ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে বৈষম্যের জটিল সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধে রোবেনা রোবিনসন মূলত তিনটি বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করেছেন: পশ্চাদপদতা, প্রান্তিকতা এবং বৈষম্য। তিনি 'Sachar Committee Report', ২০০১ সালের জনগণনা এবং

[11] Robinson, Rowena, (ed). (2012), 'Minority Studies', New Delhi, Oxford University Press.

[12] Robinson, Rowena, (2008), 'Socio-economic Backwardness & Discrimination: The Case of Indian Muslims', Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 44, No. 2. Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources, p.p. 194-200.

অন্যান্য সাম্প্রতিক তথ্যসূত্র ব্যবহার করে মুসলিমদের সামাজিক বঞ্চনার বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, শিক্ষাগত পশ্চাদপদতা নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে মুসলিমদের সাক্ষরতা হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এবং শহরাঞ্চলে। কিছু রাজ্যে (যেমন কেরালা) এই পার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম হলেও পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও আসাম রাজ্যে মুসলিমদের শিক্ষাগত অবস্থা খুবই খারাপ। উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ ও স্নাতক সম্পন্ন করার হারে মুসলিমরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক পিছিয়ে, এমনকি তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের থেকেও। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিমরা প্রধানত শহরাঞ্চলে স্বনিয়োজিত পেশায় জড়িত—যেমন রাস্তার হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এই ধরনের কর্মসংস্থানের ফলে তারা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসার ঝুঁকিতে থাকে। ব্যাংক ঋণে প্রবেশাধিকারে মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কম সক্রিয়। কর্মসংস্থানের দিক থেকেও তারা প্রধানত অনিয়মিত শ্রমিক এবং সরকারি ও বড় বেসরকারি খাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম।

তৃতীয়ত, বৈষম্যের প্রসঙ্গে রোবিনসন তুলে ধরেছেন যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম বা অঞ্চলগুলিতে সামাজিক ও পরিকাঠামোগত সুবিধা অত্যন্ত সীমিত—যেমন পাকা রাস্তা, ডাকঘর, হাসপাতাল ইত্যাদির অভাব স্পষ্ট। এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বৈষম্য লক্ষণীয়। তিনি বলেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের বঞ্চনার পেছনে ধর্মীয় পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা প্রান্তিকতা ও পশ্চাদপদতাকে আরও গভীর করে তোলে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতা মুসলিম পরিবারের শিক্ষা ও জীবিকা পরিকল্পনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জোয়া হাসান (Zoya Hasan) 'Politics of Inclusion: Caste, Minorities and Affirmative Action' (2009)[13] এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির (inclusion) রাজনীতি, বিশেষত ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিনিধি হওয়ার প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংখ্যালঘুদের অধিকার, সংরক্ষণ নীতিমালা এবং সমানাধিকারের ধারণা নিয়ে দীর্ঘকালীন বিতর্ক ও বিভ্রান্তির বিশ্লেষণ করে। হাসান দাবি করেন যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ইতিবাচক বৈষম্যের নীতিমালা প্রণয়নে রাষ্ট্রের দ্বিধান্বিত মনোভাব এবং এর পেছনে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে গঠিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অপব্যাখ্যা একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত মুসলিমদের ক্ষেত্রে, যাদের সরকারী চাকরি, শিক্ষাক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে চরম রকমের অনুপস্থিতি রয়েছে, তা 'সাচার কমিটি'র তথ্য দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে। হাসান অমর্ত্য সেনের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় বর্জনের তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, বর্জন কেবল রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে হয় না, বরং সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও ঘটে। তিনি মুসলিম ও খ্রিষ্টান দলিতদের সংরক্ষণ দাবি এবং হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জাতপাত নির্ধারনের

[13] Hasan, Zoya, (2009), 'Politics of Inclusion: Caste, Minorities and Affirmative Action', New Delhi, Oxford University Press.

সাংবিধানিক দ্ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে জোয়া হাসান শুধুমাত্র অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেননি; বরং তিনি একটি বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, অন্তর্ভুক্তির প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো সীমিত সম্পদ ও সুযোগ নিয়ে নানা বঞ্চিত গোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

রাজীব সিংহ, 'Citizenship, Exclusion & Indian Muslims' (2010)[14] এই প্রবন্ধে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব-সংকট, সামাজিক বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণহীনতার বহুমাত্রিক চিত্র উপস্থাপন করে। তিনি টি. এইচ. মার্শালের নাগরিকত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে নাগরিকত্ব শুধুমাত্র আইনি অধিকার নয়, বরং সেটি সক্রিয় রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে। কিন্তু মুসলমানদের একটি বড় অংশ নানা ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত কারণে এই অধিকারগুলি কার্যত প্রয়োগ করতে পারছে না। প্রবন্ধটি দেখায় যে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সংবিধান, যেখানে সমতা, ন্যায় ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য। ঐতিহাসিকভাবে দেশভাগ, ধর্মীয় বিভাজন, এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের 'divide and rule' নীতির ফলে মুসলমানরা সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পরেও মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব কমে গেছে এবং নির্বাচন ব্যবস্থায় তারা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। এই প্রবন্ধে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ বলে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা, সরকারি চাকরি, ব্যাংক ঋণ এবং ব্যবসায়িক সুযোগ থেকে তারা প্রায় বঞ্চিত। সচার কমিটির রিপোর্টের তথ্য ব্যবহার করে লেখক দেখিয়েছেন যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অসুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এই অবস্থার পেছনে সরকারের উদাসীনতা, সামাজিক কুসংস্কার এবং বৈষম্যমূলক নীতিগুলোকেই দায়ী করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তা ও ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নাগরিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে আরও বিপন্ন করেছে। প্রবন্ধটি উল্লেখ করে যে মুসলিমরা আজ ভারতের মধ্যে এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছে যেখানে তাদের একদিকে দেশদ্রোহীতার সন্দেহ, অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হওয়া 'তোষণের' অভিযোগ—দুইয়ের মাঝে ভারসাম্যহীন এক বাস্তবতায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

জয়া চ্যাটার্জি তাঁর 'The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-1967' (2007)[15] বইটি বাংলার ইতিহাস ও ভারতের বিভাজন নিয়ে প্রচলিত ধারণাগুলোর বিপরীতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। সাধারণত, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির পরিণতি হিসেবে দেখা হয়। বইটি দেশভাগের বিশাল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিণতি মূল্যায়ন করে। বইটি দেখায় যে কীভাবে

[14] Singh, Rajeev, (April-June, 2010), 'Citizenship, Exclusion & Indian Muslims', The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 2. Indian Political Science Association, p.p. 497-510

[15] Chatterji, Joya, (2007) 'Bengal Hindu Communalism and Partition: 1932-1947', Cambridge, Cambridge University Press,

এবং কেন সীমানা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল, সেইসাথে কীভাবে নতুন জাতিরাষ্ট্র তৈরির ফাইল বাংলা এবং ভারত উভয় ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব উত্থান, জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক দৃশ্যপটে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটেছিল।

সুনীত চোপড়া, তাঁর 'Problems of the Muslim Minority in India' (1976)[16] এই প্রবন্ধে ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং চ্যালেঞ্জ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। লেখক শ্রেণীগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং একটি সমাধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। লেখক মূলত বামপন্থী ও শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যান্য কারণগুলোর বিশ্লেষণ কিছুটা সীমিত। মুসলমানদের শিক্ষার অভাব এবং সামাজিক গতিশীলতা (social mobility) সংক্রান্ত আলোচনা অনুপস্থিত।

Manoj Kumar Singha তাঁর 'Minority Rights: A Case Study of India' (2005)[17] প্রবন্ধে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার, সাংবিধানিক সুরক্ষা, আইনগত কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি বিশদভাবে আলোচনা করে। লেখক মানবাধিকার, সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজের টেকসই উন্নয়নে সংখ্যালঘু নীতি কীভাবে গঠিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বইটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছে।

আবদুল শবান, সম্পাদিত, 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence' (2018)[18] বইটির মূল প্রতিপাদ্য ও কাঠামো হল ভারতের মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে। এছাড়া ভারতের মুসলিমরা জাতীয় রাজনীতিতে একটি "ভোট ব্যাংক" হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে অবহেলিত তা ফুটে উঠেছে। ২০০৬ সালের সাচার কমিটির রিপোর্টের প্রভাব এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বইটি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত, যেখানে বিভিন্ন গবেষক, সাংবাদিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। এই বইটিতে M.J. Akbar, তাঁর 'Minority and

[16] Chopra, Suneet, (1976), 'Problems of the Muslim Minority in India', Social Scientist, Vol.5, No.2, p.p. 67-77.

[17] Singha, Manoj Kumar, (2005) 'Minority Rights: A Case Study of India', International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 12, No. 4, p.p. 355-374.

[18] Shaban Abdul, (2018), 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge.

Minorityism: The Challenge before Indian Muslims' (2018)[19] প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুরা রাজনীতির শিকার হয়েছে এবং কীভাবে তাদের প্রান্তিকীকরণ করা হচ্ছে তা তুলে ধরেছেন। সেইসাথে 'সংখ্যালঘুত্ব' (Minorityism) ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বৈত আচারণ মুসলিমদের রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা ব্যবহারের প্রবনতা রাষ্ট্রীয় নীতি ও প্রশাসনের মধ্যে বদ্যমান পক্ষপাতদুষ্টতার দিক তুলে ধরেছেন।

রাম পুনিয়ানি (Ram Puniyani) তাঁর 'Muslims and Politics of Exclusion' (2018)[20] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক মূলধারার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দেশভাগ-পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে সমসাময়িক হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক উত্তরণ পর্যন্ত, মুসলমানদের 'অন্য' রূপে নির্মাণ করে একপ্রকার 'রাষ্ট্রীয় অপর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বর্জন শুধু ভোটব্যাংকের রাজনীতি নয়, বরং উন্নয়ন, শিক্ষা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং গণমাধ্যমের মধ্যে প্রোথিত একটি কাঠামোগত বৈষম্য। পুনিয়ানি যুক্তি দেন যে, একদিকে মুসলমানদের তোষণের অভিযোগ উঠলেও বাস্তবে তারা শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক হিংসা ও নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি তাদের আরও 'ঘেটোয়াইজেশন' বা পৃথকীকরণের দিকে ঠেলে দেয়। এই প্রবন্ধে তিনি ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি পরিচালিত 'বর্জনের রাজনীতি' কে একবিংশ শতকের বৃহত্তর সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রচিন্তার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। এই লেখাটি গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মুসলিম সংখ্যালঘুদের কাঠামোগত বঞ্চনা, রাজনৈতিক উপস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সংকটকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে সহায়তা করে। তবে এখানে সমস্যার বিশ্লেষণ বিশদ হলেও নীতিগত সমাধানগুলো তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত।

নূরজাহান সাফিয়া নিয়াজ ও জে. এস. আপ্তে তাঁর 'Muslim Women and Law Reforms: Concerns and Initiatives of the Excluded within the Excluded' (2018)[21] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ভারতের মুসলিম নারীরা দ্বৈতভাবে প্রান্তিক- একদিকে তারা নারী হিসেবে বঞ্চিত, অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে বৈষম্যের শিকার। বইটি ভারতের মুসলিমদের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ।

---

[19] Akbar, M.J. (2018) 'Minority and Minorityism: The Challenge before Indian Muslims' In A. Shaban (Ed). 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge. p.p. 25-36.

[20] Puniyani, Ram, (2018), 'Muslims and Politics of Exclusion' In A. Shaban (Ed). 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge, p.p. 88-106.

[21] Niaz, Noorjehan Safia and Apte, J. S., (2018) 'Muslim Women and Law Reforms: Concerns and Initiatives of the Excluded within the Excluded'. In A. Shaban (Ed.) 'Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence', London and New York, Routledge.

Muin-Ud-Din Ahmad Khan-এর প্রবন্ধ 'Economic Conditions of the Muslims of Bengal under the East India Company (1737–1860)' (1967)[22] একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বাংলার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরে।

প্রবন্ধে বলা হয়েছে, পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) মাধ্যমে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটলে বাংলার মুসলমানরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হারায় এবং হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়িক শ্রেণির উত্থান ঘটে। কোম্পানি আমলে তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক চাপ (গোমস্তারা, নতুন জমিদার এবং নীলকর) মুসলিম কৃষক ও প্রাক্তন জমিদার শ্রেণিকে নিঃস্ব করে ফেলে। গোমস্তারা জোরপূর্বক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করত, নতুন জমিদার শ্রেণি জমির উপর নিষ্ঠুর খাজনা আরোপ করত, আর নীলকররা কৃষকদেরকে কম পারিশ্রমিকে নীল চাষে বাধ্য করত। এছাড়াও লাখিরাজ (করমুক্ত) ভূমি পুনরুদ্ধার নীতির ফলে হাজার হাজার মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেণি সামাজিকভাবে বিছিন্ন ও সাংস্কৃতিকভাবে পেছনে পড়ে যায়, কারণ তারা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফারসি ভাষাভিত্তিক শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমান সমাজ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।

Bonita Aleaz, 'Madrasa Education, State and Community Consciousness: Muslims in West Bengal' (2005)[23] এর প্রবন্ধটি একটি গভীরতর ও তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ গবেষণা, যা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নীতিগত প্রভাব বিশ্লেষণ করে। এই প্রবন্ধে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার তিনটি মাত্রিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন: রাষ্ট্র, মুসলিম সম্প্রদায় এবং শিক্ষার মাধ্যমে পরিচিতি ও চেতনার গঠনের প্রক্রিয়া। Aleaz দেখিয়েছেন যে, যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি প্রাথমিকভাবে সহানুভূতিশীল, তবুও কাঠামোগত সংস্কার, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কিংবা অবকাঠামোগত সহায়তার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা প্রায় গৌণ। এই শিক্ষাব্যবস্থার কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ মূলধারার অর্থনীতি বা শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে না। তিনি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান চারটি শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন (হানাফি উলেমা, মোহাম্মদী, র‍্যাডিকাল এবং নিম্নবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়) তুলে ধরেছেন, যা মাদ্রাসাগুলোর ধরণ ও পাঠ্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসার মধ্যকার পার্থক্য এবং হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমভিত্তিক বিশ্লেষণও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হচ্ছে এই যে, Aleaz দেখিয়েছেন কীভাবে এই শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম সমাজকে আরও বেশি 'inward-directed' বা আত্মকেন্দ্রিক

[22] Khan, Muin-Ud-Din Ahmad, (1967), 'Economic Conditions of the Muslims of Bengal under the East India Company (1737–1860), Islamic Studies, Vol. 6, No. 3. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, p.p-277-288.

[23] Aleaz, Bonita (2005), 'Madrasa Education, State and Community Consciousness: Muslims in West Bengal', Economic and Political Weekly, Vol. 40. No. 6. Economic and Political Weekly, p.p. 555-564.

করে তুলছে, ফলে তারা জাতীয় জীবন ও নাগরিক চেতনায় প্রবেশ করতে পারছে না। তিনি এটিকে একটি বিকল্প 'সিভিল সোসাইটি'-এর কাঠামো হিসেবে দেখিয়েছেন, যা রাষ্ট্রীয় মূলধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

জাকির হুসেন এবং অমৃতা চ্যাটার্জি, 'Primary Completion Rates across Socio-Religious Communities in West Bengal' (2009)[24] প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ও অ-মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাথমিক শিক্ষালাভ সংক্রান্ত অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তাঁরা দেখান যে, শহর ও গ্রাম—উভয় ক্ষেত্রেই মুসলিমদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার হিন্দু উচ্চবর্ণ ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম, এবং তাঁরা পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে এটা প্রমাণ করেন যে, এই প্রবণতা দীর্ঘ সময় ধরেই বিদ্যমান এবং সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের বিশেষ লক্ষণ নেই। এর পিছনে মূলত নিম্ন আয়, বড় পরিবার, পরিবার প্রধানের কম শিক্ষা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ তুলে ধরেন। তবে এগুলিই একমাত্র কারণ নয়, এখানে অবকাঠামোগত ঘাটতিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে তুলে ধরেন যেমন—একাধিক শিক্ষার্থী একটি শ্রেণিকক্ষে, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের অসামঞ্জস্য, এক শ্রেণিকক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয়, অথবা ভবনবিহীন বিদ্যালয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সূচকগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলোতে সরকার পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেয়নি। যদিও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্কলারশিপ বা মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণের মতো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়। ফলত মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষা অর্জনের হার অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। এই শিক্ষাগত পশ্চাদপসরণ শ্রমবাজারেও তাদের অংশগ্রহণ ও সচ্ছল কর্মসংস্থানে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করছে। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তাঁদের দারিদ্র্যের উচ্চ হারে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতায়, যা পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রাম—উভয় ক্ষেত্রেই প্রকট। এই কারণে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত মুসলিম সমাজের শিক্ষাগত প্রয়োজন পূরণে লক্ষভিত্তিক, অবকাঠামোগত ও সামাজিক সচেতনতা-নির্ভর উদ্যোগ গ্রহণ করা, যাতে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে ধর্মভিত্তিক বৈষম্য প্রশমিত হয়।

প্রণব কুমার দাস ও সুগত মর্জিত, 'Socio-economic Status of Muslims in West Bengal: Reflections on a Recent Report' (2016)[25] প্রবন্ধটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত দুটি আলাদা সমীক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে রচিত। এটি একদিকে যেমন ২০০৭-০৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত Minority

[24] Husain, Zakir and Amrita Chatterjee (2009), 'Primary Completion Rates across Socio-Religious Communities in West Bengal', Economic and Political Weekly, Vol. 44, No. 15, Economic and Political Weekly, p.p. 59-67.

[25] Das, Pranab Kumar and Sugata Marjit (2016), 'Socio-economic Status of Muslims in West Bengal: Reflections on a Recent Report', Economic and Political Weekly, Vol. 51, No. 46, Economic and Political Weekly, p.p. 20-24.

Concentration Districts (MCD) প্রকল্পভুক্ত সমীক্ষার তথ্য উপস্থাপন করে, অন্যদিকে ২০১৩ সালে SNAP নামক বেসরকারি সংস্থার পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে দেখায়। তাঁরা দেখান যে, MCD সমীক্ষাটি একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অ-মুসলিমদের পরিস্থিতিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে পড়া জেলার চিহ্নিতকরণ এবং সেখানে উন্নয়নমূলক হস্তক্ষেপের পথ সুগম করা। এটি ধর্মভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক যেমন সাক্ষরতা, কর্মসংস্থান, গৃহস্থালি অবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন করেছিল। অন্যদিকে, SNAP রিপোর্টটি কেবল মুসলিম পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করায়, তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একটি বড় সীমাবদ্ধতা। প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে, SNAP রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী যে মুসলিমদের অবস্থা ২০১৩ সালে অত্যন্ত করুণ, তা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। বরং MCD এবং SNAP উভয় রিপোর্টের তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনমান, বিদ্যুৎ ও পানীয়জলের প্রাপ্যতা, সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষার স্তরে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বিশেষত, SNAP রিপোর্টে যে ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে, তার অনেক কিছুই MCD রিপোর্টের তুলনায় ভালো বা একই পর্যায়ে রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে অশিক্ষার হার এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষালাভের হার কিছুটা বেড়েছে। একইভাবে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও মুসলিম অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা এখনও অত্যন্ত সীমিত।

Abhijit Dasgupta, Masahiko Togawa and Abul Barkat edited 'Minorities and the state, Changing Social and Political Landscape of Bengal' (2011)[26] বইটি মূলত দূটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের অবস্থান কীরূপ, তাদের বিভিন্ন সমস্যাজনিত দিকটি তুলে ধরেছে। অপর দিকে দ্বিতীয় খন্ডে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের কী কী ধরণের সমস্যার সমূখীন হতে হচ্ছে তাদের মানবাধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে কী না সে সম্পর্কে লেখকগণ তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধে সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'The Minorities in Post-Partition West Bengal: The Riots of 1950'[27] প্রবন্ধে ১৯৫০ সালে কলকাতা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সংখ্যালঘু সমস্যার দিকগুলি অনুসন্ধান করেছিলেন। আর এই দাঙ্গার কারণগুলি কী কী তা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মূলত সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করতে

[26] Dasgupta, Abhijit, Masahiko Togawa and Abul Barkat, (2011), 'Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal', SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, India.

[27] Bandhopadhya, Sekhar. (2011) 'The Minorities in Post-Partition West Bengal: The Riots of 1950'. In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) 'Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal', SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 3-17.

গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু সম্পর্ক বিভক্ত করার রাষ্ট্রীয় নীতিই সাম্প্রদায়িক উদ্বেগের পিছনে অন্যতম কারণ। এই অধ্যায়ে মূলত সংখ্যালঘু বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিরোধী মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন লেখক, এবং দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িক হিংসার অবাঞ্ছিততা সম্পর্কে ঐক্যমত্য থাকলেও নতুন জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্থান কোথায় এ ব্যাপারে দ্বিধাবোধ ছিল।

'On the Margins: Muslims in West Bengal'[28] প্রবন্ধে অভিজিৎ দাসগুপ্ত দেখিয়েছেন যে কীভাবে রাষ্ট্রীয় নীতিগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ইতিবাচক পদক্ষেপ বা Affirmative Action থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় প্রান্তিকরনের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীনতার ছ'দশক পরেও তিনি মূলতঃ তিনটি বৃহত্তর ক্ষেত্রের উপর আলোকপাত করেছেন- দলিত এবং অনগ্রসর মুসলিমদের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ (Affirmative Action), স্থানীয় স্তরের রাজনীতি (Local Level Politics), এবং জনসংখ্যার পরিবর্তন (Demographic Change)। তিনি দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, বিভিন্ন পেশাভুক্ত গোষ্ঠীর মানুষ এবং অন্যন্যা অনগ্রসর শ্রেনী (OBC) হিসাবে সুযোগ সুবিধার অধীকারী হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত দলিত ও অনগ্রসর শ্রেনী এই সকল সুযোগ-সুবিধার বাইরে। তিনি দেখিয়েছেন যে, সম্প্রদায় ভিত্তিক ও ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতিতে কীভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রাজনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করছে সেটাও তিনি এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন।

সমীর কুমার দাস তাঁর' Wrestling with My Shadow: The state and the Immigrant Muslims in Contemporary West Bengal'[29] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার গবেষণায় অনুপ্রবেশ একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শ্রেনীকে 'অনুপ্রবেশকারী' মুসলিম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। লেখক, অভিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অভিবাসী সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিগুলির গতিপ্রকৃতি আলোচনা করেছেন।

Tetsuya Nakatani তাঁর 'Partition Refugees on Borders: Assimilation in West Bengal'[30] প্রবন্ধে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, দেশভাগের সময় অনেক হিন্দু

---

[28] Dasgupta, Abhijit. (2011), 'On the Margins: Muslims in West Bengal'. প্রাগুক্ত, p.p. 18.38.

[29] Das, Samir Kumar, (2011), 'wrestling with My Shadow: The state and the Immigrant Muslims in Contemporary West Bengal'. In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) "Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal", SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 39-65

[30] Nakatani, Tetsuya. (2011) 'Partition Refugees on Borders: Assimilation in West Bengal', প্রাগুক্ত, p.p. 66-90.

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেই থেকে গিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে, এবং এখানে এসে তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে একান্তীকরনের জন্য নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি মূলত নদীয়া জেলার কয়েকটি গ্রামের ক্ষেত্র সমীক্ষা করে উপলব্ধী করেছেন যে, সীমানা লাগোয়া বা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী মানুষজন মূলত বিভিন্ন শ্রেনীর, বিভিন্ন প্রকৃতির অর্থাৎ তারা সমজাতীয় ছিলনা। তাদের মধ্যে ছিল কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোকজন, এবং কিছু অনুপ্রবেশকারী বা শরণার্থী। লেখক মূলত বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে তারা কী ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে এবং একটি নতুন জায়গায় এসে তারা কীভাবে বন্দোবস্ত করেছেন সেই সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন উক্ত প্রবন্ধে, যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে আসে।

'Political Economy of Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with the Vested Property Act'[31] প্রবন্ধে Abul Barkat সংখ্যালঘু বিষয়ক রাষ্ট্রীয় নীতির সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শত্রু সম্পত্তি আইন বিধিবদ্ধকরণ ও বাস্তবায়ন এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন নামে এর ধারাবাহিকতা বজায়ের মূলে রয়েছে গভীর এক ঐতিহাসিক চক্রান্ত, যার লক্ষ্য ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারী শাসকরা পাকিস্তানকে ইসলামিকরণের পথে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রথম থেকেই তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের এবং বাঙালী সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করা। এই Enemy Property Act যা Vested Property Act নামে পরিচিত, এই আইনের কার্যকরীতার অভিঘাতগুলো খুবই স্পষ্ট। এটি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত, হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতা ও মুক্তি চেতনার প্রতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটায়। ফলস্বরূপ, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতাহীনতা, অসহায়ত্ব, দারিদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতাসহ বঞ্চনার এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এর ফলে লেখক হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ করেছেন এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ক্রমশ যে হ্রাস পাচ্ছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ১৯৬৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ৬০০ জন হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মানুষ হারিয়ে গিয়েছে, যার অধিকাংশই বাংলাদেশের সীমানা লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

Rangalal Sen তাঁর 'Role of Civil Society in Combating Violance aganist Religious Minorities during the Post-2001 General Elections of Bangladesh'[32] প্রবন্ধে তিনি মূলত ২০০১

[31] Barkat, Abul. (2011) 'Political Economy of Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with the Vested Property Act', প্রাগুক্ত, p.p. 91-118.

[32] Sen, Rangalal. (2011) 'Role of Civil Society in Combating Violance aganist Religious Minorities during the Post-2001 General Elections of Bangladesh' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) 'Minorities

সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে সাধারন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কীভাবে হিংসাত্মক আক্রমণ ঘটেছে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেনী বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা ভোটদানের অধিকার থেকে কীভাবে বঞ্চিত হয়েছে, কিংবা তাদেরকে তাদের পছন্দের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

Masahiko Togawa তাঁর 'Hindu Minority in Bangladesh: Migration, Marginalization, and Minority Politics in Bengal'[33] প্রবন্ধে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তাদের বর্তমান অবস্থান কোথায় সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সর্বমোট হিন্দু জনসংখ্যা 11.2 Million যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা 9.1 ভাগ। কিন্তু ১৯৪০ সালের আদমসুমারী অনুসারে এই সংখ্যাটা ছিল শতকরা 22 শতাংশ। এইভাবে দেশভাগের সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি শুধুমাত্র শরণর্থী সমস্যাকে তুলে ধরেননি। একইসাথে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দু সংখ্যালঘু শ্রেনী দৈনন্দিন জীবনে নানারকম আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানসিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে যা তাদের বাধ্য করেছে অন্যত্র চলে যাওয়ার।

'Status of Hindu Women: Spheres of Human Rights Violation in Bangladesh'[34] প্রবন্ধে Sadeka Halim বিশ্লেষণ করেছেন যে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের মানবাধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, তারা কী ধরনের বৈষম্যমূলক আচরনের সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু মহিলাদের অবস্থান বিচার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, হিন্দু মহিলারা মূলতঃ বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক'। তিনি দেখান যে, বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ তাদেরকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে রেখেছে এবং তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর 'প্রান্তিক মানব; পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা' (১৯৯০)[35] বইটি দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভারতে আগমনের দীর্ঘস্থায়ী ও বেদনাদায়ক ইতিহাসকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে

---

and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal', SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 119-132.

[33] Togawa, Masahiko. (2011) 'Hindu Minority in Bangladesh: Migration, Marginalization, and Minority Politics in Bengal', প্রাগুক্ত, p.p. 133-164.

[34] Halim, Ssdeka. (2011) 'Status of Hindu Women: Spheres of Human Rights Violation in Bangladesh', In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) "Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal", SAGE Publications India Pvt Ltd, New Delhi, p.p. 165-183.

[35] চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯০), 'প্রান্তিক মানব; পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা', কলকাতা, দীপ প্রকাশন।

ধরেছে। গ্রন্থটির শুরুতেই লেখক উদ্বাস্তু সমস্যাকে সাম্প্রতিককালের এক হৃদয়বিদারক মানবিক বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, পাঞ্জাবের মতো বাংলায় কোনো হঠাৎ ও এককালীন ধ্বংসাত্মক জনবিনিময় হয়নি; বরং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বিতাড়নের প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘকালব্যাপী, যন্ত্রণাময় ও পর্যায়ক্রমিক। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের শুধুমাত্র শারীরিক নয়, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক নিপীড়নও সংঘটিত হয়েছে। লেখক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও স্থানীয় মুসলমানদের একটি অংশের যৌথ ভূমিকায় হিন্দুদের উপর একতরফা দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে তাদের ধনসম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এই জনস্রোত কখনো প্রচণ্ড, কখনো ক্ষীণ হলেও – তা কখনোই সম্পূর্ণ থামেনি।

Justice Surendra Kumar Sinha, তাঁর 'A BROKEN DREAM: Rule of Law, Human Rights & Democracy' (2018)[36] গ্রন্থটি একটি আত্মজীবনীমূলক দলিল, যেখানে তিনি বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের চরম সংকট ও বিকারের চিত্র তুলে ধরেছেন। সিনহা, যিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সংখ্যালঘু হিন্দু প্রধান বিচারপতি ছিলেন, তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্বিচারে নিপীড়নের মুখোমুখি করে তোলে। বইটিতে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে ভূমি দখল, ধর্মীয় সহিংসতা ও প্রশাসনিক নিপীড়নের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি, এবং কীভাবে তারা বিচারব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত হন।

আবুল মনসুর আহমেদ, তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৯৯),[37] গ্রন্থে দীর্ঘ ব্রিটিশ বেঙ্গল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ কালপর্বে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের বিবর্তনসহ দেশবিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ছবি প্রকট হয়েছে এই স্মৃতিচারনামূলক গ্রন্থে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে নানান ভূমিকা এবং সম্মুখীন হওয়া বহু সংকট এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

সালাম আজাত, তাঁর, 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করেছে' (২০০১)[38] এবং 'বাংলাদেশে বিপন্ন সংখ্যালঘু' (২০০৯)[39] গ্রন্থ দুটিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও বাংলাদেশ ভাগের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। সাম্প্রদায়িক

---

[36] Justice Sinha, Surendra Kumar "A BROKEN DREAM: Rule of Law, Human Rights & Democracy", Lalitmohan-Dhanabati Memorial Foundation.

[37] আহমেদ, আবুল মনসুর, (১৯৯৯), 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল।

[38] আজাদ, সালাম, (২০০১) 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করেছে', কলকাতা, সাস পবলিকেশন্স।

[39] আজাদ, সালাম, (২০০৯) 'বাংলাদেশে বিপন্ন সংখ্যালঘু', কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স।

বিষবাষ্প কিভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনকে বাংলাদেশ দুর্বিষহ করে তুলেছিল সে ইতিহাসও তিনি আলোচনা করেছেন।

শাহরিয়ার কবির তাঁর 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন' (২০০৫)[40] গ্রন্থে ২০০১ নির্বাচনোত্তর বি.এন.পি জামাত জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের সংগঠিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও ধর্ষণ, হত্যা ও নানারকম অত্যাচারের ঘটনা তথ্যাকারে তুলে ধরেছেন।

মোল্লা আমীরুল ইসলাম তাঁর 'হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-২০১১): খুলনা জেলা' (২০১৮)[41] গ্রন্থে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে বর্তমান বাংলাদেশ কাল পর্বে খুলনা জেলার পূর্ব পাকিস্তানভুক্তি, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের কারণ, বিবরণ ও ফলাফল তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তত্ত্বের প্রাচুর্যতার পাশাপাশি মানুষের সাক্ষ্য এই গবেষণামূলক গ্রন্থকে অনন্য সমৃদ্ধ করেছে।

তথাগত রায়ের 'যা ছিল আমার দেশ' (২০২২)[42] গ্রন্থে পূর্ববঙ্গে সংঘটিত ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৭১ সালের গণহত্যা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর সাম্প্রদায়িক শক্তির অত্যাচারে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশ নির্বাচনী সহিংসতার কিভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বলপূর্বক দেশত্যাগের পথে ঠেলে দিয়েছে তাও এই গ্রন্থে প্রতিপাদ্য হয়েছে।

Kathinka Sinha-Kerkhoff, তাঁর 'Tyranny of Partition: Hindu in Bangladesh and Muslims in India, (2006)[43] ও সুলতানা নাহারের 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও ভারত' (১৯৯৪)[৩৮] এই গ্রন্থগুলিতে ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র সম্পাদিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোতে বাংলাদেশের হিন্দুদের তুলনায় ভারতের মুসলমানদের তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানের চিত্র উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতা এবং দেশান্তরের ভয় ও ভারতের মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার চিত্র প্রতিভাত হয়েছে।

রিসার্চ গ্যাপ (Research Gap)

ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বহু গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে সাচার কমিটি (২০০৬), রাঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন (২০০৭) ইত্যাদির

---

[40] কবির, শাহরিয়ার, (২০০৫) 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন', ঢাকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নিমূল কমিটি।

[41] ইসলাম, আমীরুল মোল্লা, (২০১৮) 'হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-২০১১): খুলনা জেলা', ঢাকা, সুবর্ন প্রকাশনী।

[42] তথাগত, (২০২২), 'যা ছিল আমার দেশ', কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ।

[43] Kathinka Sinha- Kerkhoff, (2006) 'Tyranny of Partition: Hindu in Bangladesh and Muslims in India', New Delhi, Gyan Publishing.

রিপোর্ট মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার ব্যাপক চিত্র তুলে ধরেছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক, সেখানে স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিশ্লেষণমূলক গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। বিদ্যমান গবেষণাগুলি প্রায়ই নির্দিষ্ট সময়পর্ব (যেমন সাম্প্রতিক দশক) বা নির্দিষ্ট ইস্যু (যেমন শিক্ষা বা কর্মসংস্থান) কেন্দ্রীক ছিল; কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরবর্তী ধারাবাহিক সময়জুড়ে তাদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তনশীলতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি সুসংহত গবেষণার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাপ পূরণের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিবর্তিত রূপ ও গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে একটি সামগ্রিক এবং তত্ত্বভিত্তিক চিত্র নির্মাণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর আলোকে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিমদের পরিচয় ও অধিকার নির্মাণের প্রক্রিয়া এখনও ব্যাপক গবেষণার দাবি রাখে। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত বৈষম্য, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোতে সংখ্যালঘুদের অবস্থান — এইসব বহুমাত্রিক বিষয়ে একটি সামগ্রিক, প্রক্রিয়াভিত্তিক ও সমসাময়িক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত রয়েছে। তাছাড়া, স্বাধীনতার পরবর্তী দীর্ঘ সময়জুড়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক অবস্থানের ক্রমবিকাশ, প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন, এবং এইসব পরিবর্তনের পেছনে রাষ্ট্রীয় নীতি ও সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা নিয়ে সামগ্রিক বিশ্লেষণ এখনও প্রায় অনুপস্থিত, এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এলেও, তা প্রধানত ভোটব্যাংক রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র ভোটার বা রাজনৈতিক সমর্থক হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে, বাস্তব ক্ষমতায়নের (নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা, নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার) বিশ্লেষণ গবেষণায় প্রাধান্য পায়নি। ফলে, মুসলিম সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কেবলমাত্র প্রতীকী ছিল নাকি প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়েছে — এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর এখনও অনুপস্থিত রয়েছে। অপরদিকে, বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও উদ্বাস্তু সমস্যা, ভূমি অধিকার ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত গবেষণা রয়েছে, তবে স্থানীয় সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তির (assimilation) দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার স্তর নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখনও সীমিত। উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রজন্মভিত্তিক আত্মপরিচয় নির্মাণের গবেষণা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

এই গবেষণা ব্যবধানের পটভূমিতেই নিম্নোক্ত গবেষণা প্রশ্নাবলী প্রণীত হয়েছে, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কিত জটিল বাস্তবতাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণামূলক প্রশ্নাবলী (Research Questions):

সামগ্রিক সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review থেকে এবং সমস্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

(১) দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

(২) স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে?

(৩) স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ কতদূর তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহায়ক হয়েছে?

(৪) পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গিয়ে কোন কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং নিজেদের স্থানীয় সমাজে অন্তর্ভুক্তিকরণ করতে কতখানি সফল হয়েছেন?

গবেষণার উপাদান

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের জনগণনা রিপোর্ট ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান, ভারত ও বাংলাদেশের সংবিধান ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আইন, ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রনালয় (Ministry of Minority Affairs) কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিপত্র, এবং ভারতের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন (National Commission for Minority) এর রিপোর্ট ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর (Minority Affairs & Madrasah Education Department) ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (west Bengal Minority Development & Finance Corporation) কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ, এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পত্রপত্রিকা ও নির্বাচনী ইশতেহার, সংখ্যালঘু ভিত্তিক সংগঠনগুলোর পত্রপত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একইসাথে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি কার্যবিবরণী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কার্যবিবরণী, বার্ষিক প্রতিবেদন, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনার ও বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার-এর বিভিন্ন তথ্য, এবং নির্দিষ্ট সময়কালে প্রকাশিত সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কে যুক্তিনির্ভর

করার জন্য মুখ্য উপাদান হিসেবে যুক্ত হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষার (Field Survey) মাধ্যমে স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য। এর পাশাপাশি গৌণ উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পুস্তক, রাজনৈতিক নেতাদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ, আত্মজীবনী, বিভিন্ন প্রজেক্ট রিপোর্ট, বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণামূলক কাজ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNHCR, Minority Rights Group International, Pew Research Centre, UN General Assembly, UN Social & Economic Council, এবং United States Commission on International Religious Freedom কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন নথিপত্র, সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিষয়ক আইন ও অধিকারসমূহ, উদ্বাস্তু সংক্রান্ত দলিলপত্র উদ্বাস্তু সমস্যা ও সংখ্যালঘু অধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বুঝতে সহায়তা করেছে। তবে এ সমস্ত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন এবং ইতিহাসের যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি বা Research Methodology খুব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার কাজ করার আগে গবেষণাটি কিভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই গবেষণাটি মূলত বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক প্রকৃতির। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি সমীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধনে নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণাপত্র নির্মাণের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। যেমন, প্রথম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা, এগুলি বিভিন্ন লেখ্যাগার, গ্রন্থাগার, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে চয়ন করে তার ব্যবহার এবং সবশেষে নির্বাচিত তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে উপনীত হওয়া।

এই গবেষণায় বাস্তবতার সরাসরি অনুধাবনের জন্য একটি এম্পিরিক্যাল (Empirical) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাই এম্পিরিক্যাল পদ্ধতি হিসেবে তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা (fieldwork), সাক্ষাৎকার (interviews), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (Focus Group Discussion) করা হয়েছে। মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বোঝার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ধুলিয়ান পৌরসভা ও তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর বসতি, পুনর্বাসন, সামাজিক অভিযোজন ও আত্মপরিচয়ের নির্মাণ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির ও পুনর্বাসন কলোনি (বিশেষ করে নদীয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্প, রানাঘাট, রঘুনাথপুর, ও শান্তিপুর) অঞ্চলে সরাসরি অবস্থান করে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোবদ্ধ ও আধা-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী (life history) সংগ্রহের

মাধ্যমেও ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই এম্পিরিক্যাল পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলো পরে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য শ্রেণিবদ্ধ ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল উপাদানগুলি কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য বিধানসভা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র (পার্ক সার্কাস পশ্চিমবঙ্গ), মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিস গ্রন্থাগার (কলকাতা), Centre for Research in Indo-Bangladesh Relations (CRIBR) Libarary (Jodhpur Park, Kolkata), থেকে সংগৃহীত তথ্য এই গবেষণা সন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে সাহায্য করেছে।

অধ্যায় বিন্যাস (Chapter Outline)

বর্তমান সন্দর্ভটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় নির্দিষ্ট একটি মূল বিষয়কে আলোকপাত করেছে এবং সামগ্রিক গবেষণার কাঠামো গঠনে সহযোগিতা করেছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণা প্রকল্পের ভূমিকা - এখানে গবেষণার পটভূমি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, সাহিত্য অভীক্ষা, গবেষণামূলক সমস্যার বিবৃতি, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণার উপাদান এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে, যা গোটা গবেষণার পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীঃ একটি সামগ্রিক পরিচয় - এই অধ্যায়ে সংখ্যালঘু সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের ধারণা ও মতবাদ, এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীবিন্যাসের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়াতে সংখ্যালঘু পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ যথা- ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ এর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে তাদের অবস্থান এবং সাংবিধানিক অধিকার সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজতাত্ত্বিক চরিত্র সম্পর্কেও একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলির ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি - এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস তুলে ধরার পাশাপাশি সেখানকার মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, পেশাগত বিন্যাস, আয় ও জীবনযাত্রার মান বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

সমূক্ষেপ (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এবং তৃনমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে গৃহীত পদক্ষেপ) এবং সংখ্যালঘু উন্নয়নে তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে গঠিত বঞ্চনার ধারা এবং আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নীতিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি ও প্রান্তিকতার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর (বিশেষভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুগোষ্ঠী) সামাজিক বঞ্চনা এবং নিরাপত্তাহীনতার চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে উভয় অঞ্চলের (যেমন- পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উন্মোচন করা হয়েছে, যাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুত্বের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও প্রকাশ বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ স্বাধীনতার পর বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ – এই অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, রাজ্য আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব, এবং ভারতীয় গণতন্ত্রে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যালঘু নীতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে একটি তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিধানসভা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ধর্মীয় সংখ্যালঘু মনোনয়নের ক্ষেত্রে কিভাবে সংখ্যানুপাতিক অবমূল্যায়ন করেছিল এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বহীনতার বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছিল তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি কেস স্টাডি - এই অধ্যায়ে মূলত বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর আগমনের কারণ, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অভিগমনের স্থান ও তাদের জীবন প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, দেশভাগ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া, সামাজিক অভিযোজন ও পরিচয় নির্মাণের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপসংহার - গবেষণার শেষ অংশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সার্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মূল পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সংখ্যালঘুদের টিকে থাকার কৌশল, অভিযোজনের পথরেখা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশ এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকতর ন্যায়সঙ্গত অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু সুপারিশও উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীঃ একটি সামগ্রিক পরিচয়

সংখ্যালঘু শব্দটি শুধুমাত্র জনসংখ্যাগত সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতার ভারসাম্যের সাথেও সম্পর্কিত। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে সেই গোষ্ঠীগুলোকে বোঝানো হয়, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর তুলনায় ক্ষমতা, সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রভাবের দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। বিশ্বের সব দেশই সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। মূলত একটি দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং বর্ণগত দিক থেকে যাদের সংখ্যা কম এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথক ও অসম আচরণের শিকার তাদের ওই দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা হয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তারা বৈষম্যের শিকার সম্প্রদায়। আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশের আদিবাসীরা কিংবা অন্যদেশ থেকে আসা অভিবাসীরা সংখ্যালঘু। আবার ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলি প্রায়শই সুবিধাবঞ্চিত, বৈষম্যের শিকার হয় এবং জন ও রাজনৈতিক জীবনে অর্থবহ অংশগ্রহণ থেকে বাদ পড়ে। তাই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রভাবশালীর চাপ সহ্য করে তাদের পরিচয়, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভাষা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে অনবরত। এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকা এবং তাদের অধিকারের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং সহায়তা প্রয়োজন। তাই সংশ্লিষ্ট দেশের পাশাপাশি জাতিসংঘসহ অন্যান্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে কাজ করে চলেছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের ন্যায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত দেশগুলিতেও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবস্থান দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়া মূলত বৈচিত্র্যময় জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র। এই অঞ্চলের দেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি নানা ধরনের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বসবাস করে, যারা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে, ধর্ম, ভাষা, জাতিগত পরিচয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে সংখ্যালঘুরা প্রায়শই বৈষম্য, নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থান, তাদের সমস্যা ও সরকারি নীতিমালা ভিন্ন হলেও কিছু সাধারণ চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়—যেমন ধর্মীয় বৈষম্য, রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণ, সম্পদ দখল, সামাজিক নিপীড়ন ও আইনি প্রতিবন্ধকতা। অনেক দেশ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সংবিধান ও আইন প্রণয়ন করলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা বিদ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠবাদী রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্ব, জাতিগত সংঘাত ও জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিস্তৃতি সংখ্যালঘুদের জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিত কে সামনে রেখে গবেষণা সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে সংখ্যালঘুর ধারণা ও বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মতামত বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

পরিচয়, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, আইনগত স্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর একটি পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সংখ্যালঘুর ধারণা, সংজ্ঞা ও বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মতামতঃ

সংখ্যালঘু (Minority) শব্দটি বর্তমানকালে বহু ব্যবহৃত ও চর্চিত একটি শব্দ। সখ্যালঘু শব্দটির সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা না থাকলেও বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে। সাধারণত সংখ্যালঘু হল একটি রাজ্যের জনগণের একটি অ-প্রধান গোষ্ঠী যারা সাধারণত সংখ্যাগতভাবে কম এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার তুলনায় তাদের আলাদা জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যারা একটি আলাদা পরিচয় সম্পর্কে সচেতন এবং এটিকে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছুক।

আন্তর্জাতিক স্থায়ী ন্যায়বিচার আদালত (The Permanent Court of International Justice) সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নির্ধারণ করেছে। এই উপাদানগুলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করে এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক কাঠামো প্রদান করে। নিচে প্রতিটি উপাদান বিশ্লেষণ করা হলো—

(a) স্বতন্ত্র গোষ্ঠী (Distinct Groups) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা বহন করে। এই স্বাতন্ত্র্য ধর্ম, ভাষা, জাতি কিংবা অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে।

(b) প্রকৃত সংখ্যালঘু (Real Minorities) সংখ্যালঘুর প্রকৃত অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য তাদের সংখ্যাগত দিকটি বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, একটি গোষ্ঠী শুধুমাত্র ভিন্ন সংস্কৃতি বা ভাষা ধারণ করলেই সংখ্যালঘু হয় না, বরং তা সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় সংখ্যায় কম হতে হবে।

(c) জাতি, ধর্ম বা ভাষার ভিন্নতা (Race, Religion or Language Difference from the Majority) সংখ্যালঘুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে জাতি, ধর্ম বা ভাষার দিক থেকে ভিন্নতা থাকা। এই ভিন্নতা সংখ্যালঘুদের একটি আলাদা পরিচয় গড়ে তোলে এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র কাঠামো তৈরি করে।

(d) সংহতির অনুভূতি (Sentiment of Solidarity) সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ সংহতির অনুভূতি বিদ্যমান থাকে, যা তাদের ঐক্যবদ্ধ রাখে এবং তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই সংহতির ফলে তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়।

(e) স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা (Desire to Preserve Its Distinctive Characteristics) সংখ্যালঘুরা সাধারণত নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেমন ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে আগ্রহী

থাকে। এই সংরক্ষণ প্রচেষ্টা প্রায়ই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাথে সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(f) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আইনি ও বাস্তব সমতা (Peaceful Co-existence and Equality in Law and in Fact with the Majority) সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব কেবল তাদের আলাদা পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি নীতি অনুসরণ করা হয়। সংখ্যালঘুরা যদি আইনি ও বাস্তব সমতায় থাকে, তাহলে তারা সমাজে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সংহতির সাথে সহাবস্থান করতে পারে।[1]

এই উপাদানগুলো সংখ্যালঘুদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে এই সংজ্ঞাগুলোর উপর ভিত্তি করে নীতি নির্ধারণ করে থাকে। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার কারণে সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞা ও তাদের অধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ দেখা যায়।

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে সংখ্যালঘু (Minority) বলতে বোঝানো হয়েছে, "Small group of people differing from the majority in race, religion, language, or political persuasion."[2] অর্থাৎ এমন একটি অপেক্ষাকৃত ছোট জনগোষ্ঠী যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় জাতি, ধর্ম, ভাষা অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্ন।

ওয়েবস্টারের সেভেন্থ নিউ কলেজিয়েট ডিকশনারিতে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুরা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি অংশ, যারা প্রায়শ ভিন্ন আচারণ করে। ফিলিপ কোটাক (Phillip Kottak) তাঁর "Anthropology: The Exploration of Human Diversity" গ্রন্থে বলেছেন, সংখ্যালঘু হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রমমানের একটি অধীনস্ত গোষ্ঠী যাদের ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকার সংখ্যাগোষ্ঠীর থেকে কম থাকে।[3]

The New Encyclopedia Britannica সংখ্যালঘুর সংজ্ঞাতে উল্লেখ করেছে "Minorities is an aggregate of people who are distinct in race, religion, language or nationality from other members of the society in which they live and who think of themselves and are

---

[1] Deschenes, Jules, (1985), Promotion, Protection and Restoration of Human Rights at the National, Regional and International Levels. United Nations Economic and Social Council 181, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31. p.p. 18-19' file:///C:/Users/HP/Downloads/E_CN.4_Sub.2_1985_31-EN.pdf (accessed on 23.03.2024)

[2] Oxford University Press. (n.d.), 'Minority' In Oxford English Dictionary.

[3] Kottak, Conrad Philip, (2021), 'Anthropology: Appreciating Human Diversity', New York McGraw-Hill Education.

thought of by others, as being separate or distinct". অর্থাৎ সংখ্যালঘু বলতে বোঝায় একটি জনসমষ্টি যাঁরা জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত কিংবা জাতীয়তার ভিত্তিতে যে-সমাজে বাস করেন তাঁদের থেকে আলাদা, নিজেরাও তাই মনে করেন এবং অন্যরাও ভাবেন ওই রকম যে তাঁরা ভিন্ন প্রকৃতি।[4]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ প্রতিবেদক Fernand de Varennes ২০১৯ সালে সংখ্যালঘুর ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন যে: "An ethnic, religious or linguistic minority is any group of persons which constitutes less than half of the population in the entire territory of a State whose members share common characteristics of culture, religion or language, or a combination of any of these. A person can freely belong to an ethnic, religious or linguistic minority without any requirement of citizenship, residence, official recognition or any other status" অর্থাৎ "একটি জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু হল যে কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী, যা একটি রাষ্ট্রের সমগ্র ভূখণ্ডের জনসংখ্যার অর্ধেকের কম এবং যার সদস্যরা সংস্কৃতি, ধর্ম বা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা এদের যেকোনো সংমিশ্রণ ভাগ করে নেয়। একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে একটি জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘুর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, নাগরিকত্ব, বসবাস, আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা অন্য কোনো অবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই"।[5]

সংখ্যালঘুদের বৈষম্য প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতিসংঘের সাব-কমিশন(United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities)-এর বিশেষ দূত (Special Rapporteur) Francesco Capotorti মতানুসারে সংখ্যালঘু হল "a group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members-being nationals of the State- possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language".[6] অর্থাৎ সংখ্যালঘু হল- একটি গোষ্ঠী সংখ্যাগতভাবে একটি জাতির বাকি জনসংখ্যার তুলনায় কম, অনাধিপত্য অবস্থানে বিরাজমান, যাদের সদস্যরা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাকী

---

[4] The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition.

[5] Varennes, Fernand de (26 January, 2023), Report of the Special Rapporteur on minority issues, A/74/160, United Nations General Assembly, https://digitallibrary.un.org/record/3823138 (accessed on 23.03.2025)

[6] V. Pillai, Aneesh, Protection of Minorities under International Law, https://ebooks.inflibnet.ac.in/hrdp04/chapter/protection-of-minorities-under-international-law/ (Accessed 12 December, 2024)

সদস্যদের থেকে জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত ভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্রের অধিকারী এবং যারা সংহতির অনুভূতি প্রকাশ করে যা তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম কিংবা ভাষার সংরক্ষণকে নির্দেশ করে।

Jules Deschenes সংখ্যালঘুকে সংজ্ঞায়িত করেছেন "a group of citizens of a state, constituting a numerical minority and in a non-dominant position in that state, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the majority of the population, having sense of solidarity with one another, motivated, if only implicitly, by a collective will to survive and whose aim is to achieve equality with the majority in fact and in law".[7] অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের নাগরিকগোষ্ঠী যারা সংখ্যাগতভাবে সংখ্যালঘু এবং আধিপত্যহীন, যারা জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগতভাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর থেকে আলাদা, যাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি একাত্মতার অনুভূতি বিদ্যমান, যারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং যাদের লক্ষ্য প্রায়োগিক ও আইনগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে সমতা অর্জন করা।

তবে Minority বা সংখ্যালঘু টার্মটিকে আরও বিশেষভাবে ফোকাস করা হয় "The Problem of Minority Groups" নামক নিবন্ধে লুইস ওয়ার্থ এর ১৯৪৫ সালে প্রথম 'Minority Groups' বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী শব্দটা ব্যবহারের মাধ্যমে। Louis Wirth সংখ্যালঘুকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন "a group of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential and unequal treatment, and who therefore regard themselves as objects of collective discrimination. The existence of a minority in a society implies the existence of the corresponding dominant group enjoying higher social status and greater privileges. Minority status carries with it the exclusion from full participation in the life of the society. Though not necessarily an alien group the minority is treated and regards itself as a people apart."[8] অর্থাৎ সংখ্যালঘু বলতে এমন এক দল মানুষকে বোঝায়, যার সদস্যদেরকে তাদের দৈহিক বা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় এবং যারা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ও যারা যৌথভাবে নিজেদেরকে বিভেদমূলক আচরণে বস্তু বলে মনে করে। একটি সমাজে সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব বোঝায় যে সেখানে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ বা আধিপত্যকারী গোষ্ঠী রয়েছে, যারা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও অধিক সুবিধা ভোগ করে।

---

[7] Deschenes, Jules (1985), Promotion, Protection and Restoration of Human Rights at the National, Regional and International Levels. 181, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31. P. 30. file:///C:/Users/HP/Downloads/E_CN.4_Sub.2_1985_31-EN.pdf (accessed on 23.03.2024)

[8] Louis Wirth, (1993), 'The Problem of Minority Groups', New York Irvington Publication, p.p. 347-372.

সংখ্যালঘুদের অবস্থা সাধারণত সমাজের পূর্ণাঙ্গ জীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। যদিও তারা অপরিচিত বা বাইরের গোষ্ঠী নাও হতে পারে, তবুও তাদের সমাজে "পৃথক" হিসেবে দেখা হয় এবং তারাও নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে। যা সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ থেকে তারা বঞ্চিত থাকে।

এছাড়া সংখ্যালঘুকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে অধ্যপক মাইরন ওয়েনার তাঁর, 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?' প্রবন্ধে বলেছেন যে, "A People who do not share what they regard as the central symbols of the society invariably view themselves as a minority".[9] অর্থাৎ যে সকল মানুষ নিজেদেরকে সমাজের মূলস্তরের প্রতীক বা অংশ হিসেবে মনে করেনা তারা সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ওয়েনার সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একমাত্র "সংখ্যাগত" (numerical) সংখ্যালঘু ধারণাকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন। তিনি সংখ্যালঘুদের শুধুমাত্র কম সংখ্যক জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখেন না, বরং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহাসিক অবস্থান এবং আত্মপরিচয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করেন।

ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) ক্ষমতা, শ্রেণি ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁর মতানুসারে, সংখ্যালঘুরা শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক থেকে নয়, বরং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ক্ষমতাহীনতার কারণে বৈষম্যের শিকার হয়। তিনি বলেন "Power is the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance..."[10] অর্থাৎ ওয়েবার ক্ষমতার সংজ্ঞা দিয়ে বলেন যে, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে একজন ব্যক্তি তার ইচ্ছা অন্যদের উপর প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমনকি প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও।

অ্যান্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens) তাঁর Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (1991) বইতে আধুনিক সমাজে আত্মপরিচয়ের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন, যেখানে ব্যক্তিরা ক্রমাগত আত্ম-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় গঠন করে। তিনি বলেন যে আধুনিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি নতুন ধরনের বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির ফলে সংখ্যালঘুরা সাংস্কৃতিক সংহতি ও আত্মপরিচয়ের জন্য সংগ্রাম করে। তিনি বলেন

[9] Weiner, Myron, (1998) 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?' In P. Chatterjee (ed). State and Politics in India, Calcutta, Oxford University Press, p. 462.

[10] Weber, Max. (1978), 'Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology', Los Angeles, University of California Press, p. 53.

"In the context of modernity, the self becomes a reflexive project, sustained through a process of continuous self-monitoring."[11]

মিশেল ফুকো (Michel Foucault) সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গে ক্ষমতার ধারণা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যালঘুদের বিষয়ে "ডিসকোর্স" (discourse) তৈরি করে, যা তাদের প্রান্তিক করে রাখে। তিনি মূলত ক্ষমতা ও শৃঙ্খলার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তা ব্যাখ্যা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো "Power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we are endowed with; it is the name that one attributes to a complex strategical situation in a particular society."[12]

ইয়াসিন খান, তাঁর 'ভারতীয় গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার ও রাজনীতি' প্রবন্ধে সংখ্যালঘু বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সংখ্যাগত বিচারে যারা সংখ্যায় বেশি তারা সংখ্যাগুরু আর যারা সংখ্যায় কম তারা সংখ্যালঘু বলে চিহ্নিত। আসলে সংখ্যালঘু কারা, এ প্রসঙ্গে বলা যায় ভারতবর্ষে ভাষাগত ও ধর্মগত বৈচিত্র্য অনেক, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই সকল উপাদানগুলিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সৃষ্টির নির্ধারক হিসেবে কখনো-কখনো চিহ্নিত করা হয়। ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু বলতে কোন একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অন্যান্য ধর্মের বিশেষ করে সংখ্যাগুরু ধর্মের অধীনস্ত করা হয়। তখন সেই সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ এখানে ধর্মকেই মূল কারণ হিসাবে দেখা হয় একটি ধর্ম থেকে আরেকটি ধর্মকে পৃথক করার জন্য।[13]

এছাড়াও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা এই 'সংখ্যালঘু' প্রত্যয়টিকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। যেমন সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসন ১৯৮০ সালে লেখা তাঁর "Sociology" গ্রন্থে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেন। এগুলি হল-

প্রথমত, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা অন্যান্য গোষ্ঠীর দ্বারা নানাভাবে শোষিত লাঞ্ছিত হয়। ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদাবোধের দিক থেকে সংখ্যালঘুরা সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সংখ্যালঘুদের দুর্বলতা ও অসুবিধাজনক অবস্থাগুলোই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সুবিধাজনক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সমাজে নিম্ন মর্যাদা প্রদান করার মাধ্যমে প্রভাবশালীরা সংখ্যালঘুদের শ্রম ও সম্পদকে শোষণ করে। সংখ্যালঘুদের সদস্যরা যে কেবল প্রভাবশালীদের দ্বারাই বঞ্চিত হয় তাই নয়- সংখ্যালঘুরা প্রায় প্রভাবশালীদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও বিভেদ মূলক আচরণেরও

---

[11] Giddens, Anthony. (1991). 'Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age', Cambridge, UK: Polity Press, pp. 210-215.

[12] Foucault, Michel. (1977). 'Discipline and Punish: The Birth of the Prison', New York: Pantheon Books, p. 93

[13] খান, ইয়াসিন, (২০১৮), ভারতীয় গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার ও রাজনীতি, In সু. সেন, *ভারতীয় গণতন্ত্র প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা,* কলকাতাঃ লাকী পাবলিশার্স।

শিকার হয়। তাদেরকে অপব্যবহার করা হয়, অসংলগ্ন গালিগালাজ করা হয় এবং নানাভাবে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে লজ্জা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকভাবে সহজেই দৃশ্যমান এবং গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংখ্যালঘুদেরকে চিহ্নিত করা যায়। গায়ের রঙ, ধর্ম, ভাষা, জাতি ইত্যাদি বিচারে সংখ্যালঘুদের এমন একটি সমন্বিত সামাজিক একক মনে করা হয় যা সামাজিক দিক দিয়ে একটা তাৎপর্য বহন করে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় তা গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের জন্য প্রযোজ্য মনে করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে কেউ যতই ভালো হোক না কেন তাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব কমই দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী খুবই আত্ম-সচেতন এবং গোষ্ঠীর সবার মধ্যে একটি শক্তিশালী ঐক্যের ধারণা বিদ্যমান থাকে। রবার্টসন (Robertson) যাকে "oneness" এবং "consciousness of kind" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন ইহুদি, আমেরিকান নিগ্রো বা অন্য যেকোনো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের ধারণা প্রবল এবং তারা একে অপরের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য সাধারণ পরিচয় ঐক্যবদ্ধ হয়, গোষ্ঠীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে যদিও পার্থক্য থাকে, সেটা তারা ভুলে গোষ্ঠীস্বার্থ বড় করে দেখে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা সাধারণভাবে যে দুঃখ-কষ্ট, অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হন, সেটার কারণে নিজেদের পার্থক্য ভুলে গোষ্ঠীর চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়। সংখ্যালঘুরা যতই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকে, ততই তাদের মধ্যকার সংহতিবোধ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

চতুর্থত, সাধারণত কোন মানুষ স্বেচ্ছায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য হয় না, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করে তারা সদস্য হয়ে থাকে। সদস্যরা জন্মগত সূত্রে বা ঐতিহ্যগতভাবে একই বা সাধারণ পরিচয় বহন করে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কোন সদস্যের পক্ষে নিজের গোষ্ঠী ত্যাগ করা খুব কঠিন কাজ। কারণ, প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে কোন সংখ্যালঘু জন্মগতভাবে তার সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের কারও বাবা মার একজন কৃষ্ণাঙ্গ, আরেকজন শ্বেতাঙ্গ হলেও সেই ব্যক্তিকে কৃষ্ণাঙ্গ ধরা হয়, এবং তাকে সংখ্যালঘু বলেই বিবেচনা করা হয়।

পঞ্চমত, ইচ্ছা করেই হোক বা প্রয়োজনে তাগিদেই হোক, সংখ্যালঘুগোষ্ঠী সাধারণত এন্ডোগ্যামী বা আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহরীতি অনুসরণ করে। অর্থাৎ সংখ্যালঘুরা নিজে গোষ্ঠীর মধ্যেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে। প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কোন সদস্য সাধারণত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে বিয়ে করতে চাইবে না বা বিয়েতে অনীহা দেখাবে কেননা, তার দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুরা সামাজিকভাবে নিচু মর্যাদার অধিকারী, এবং তারা নানানভাবে অবহেলিত, নির্যাতিত এবং বঞ্চিত। অন্যদিকে সংখ্যালঘুরা নানান দিক বিবেচনা করেই নিজ গোষ্ঠীতেই পাত্র-পাত্রী অনুসন্ধান করেন।

এক্ষেত্রে তাদের গোষ্ঠীচেতনাই (consciousness of kind) বেশি কাজ করে। এর ফলে যা দাঁড়ায় তা হল সংখ্যালঘু সমাজে বংশ পরম্পরায় সংখ্যালঘু মর্যাদা (Minority Status) বজায় থাকে।[14]

সমাজতাত্ত্বিক রবার্টসনের চিন্তায় অসম আচরণ, শারীরিক বা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, আরোপিত মর্যাদা, গোষ্ঠী সংহতি ও আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহ এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও সংখ্যালঘুদের আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন, সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু উভয় গোষ্ঠী একে অপরের থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে। ফলে একে অপরের প্রতি অনেক সময় এরা ভিত্তিহীন বদ্ধমূল এবং বিরোধপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে; সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংখ্যাগুরুদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়; অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রভাবশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর ন্যায় সমান সুযোগ পেয়েও তারা নিজেদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর অনেকেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর তুলনায় নিজেদেরকে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে উৎকৃষ্ট মনে করতে পারে, আবার এর বিপরীত অবস্থাও দেখা যেতে পারে, যেখানে সংখ্যাগুরুদের অনেকেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারে ইত্যাদি।

বহুসংস্কৃতিবাদী তাত্ত্বিকরাও সংখ্যালঘুর ধারণা ও তাদের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। যেমন- বহুসংস্কৃতিবাদী তাত্ত্বিক উইল কিমলিকা (Will Kymlicka) দুই ধরনের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কথা বলেছেন-

(i) বহুজাতিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংখ্যালঘু (National minorities in multi -nation states)

(ii) পলি-এথনিক রাষ্ট্রে নৃকুলগত অভিবাসী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (Ethnic immigrant's minorities in poly-ethnic states)

জাতীয় সংখ্যালঘুরা যেখানে একটি সমগ্র জাতির স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছাকৃত সংযোজন থেকে উদ্ভূত হয়, সেখানে নৃকুলগত অভিবাসী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক অভিবাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। কিমলিকার যুক্তি হল উদারনৈতিক সংবিধানের মধ্য দিয়ে আমরা এমন এক ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারি যাতে কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি গোষ্ঠী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব করতে না পারে। সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য কিছু বিশেষ অধিকার দিতে হবে যা গোষ্ঠীভেদে ভিন্নতর হতে পারে। তাঁর পরিভাষায় যা 'Group- differentiated rights' হিসেবে পরিচিত। এই রূপ তিনটি অধিকার হল-

(i) স্বায়ত্তশাসন এর অধিকার (Right to self Government)।

(ii) ভাষা, ধর্ম, প্রথা, আচরণ অনুষ্ঠান, প্রতীক, মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রা রক্ষা করার অধিকার (Polyethnic rights)

---

[14] Robertson, Ian, (1978), 'Sociology', New York, Worth Publication, p.266.

(iii) গোষ্ঠী প্রতিনিধিত্বের অধিকার (Special representation rights) [15]

কিমলিকা একটি নতুন ধরনের উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংখ্যালঘু অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেন, যেখানে সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্রে রেখে সংখ্যালঘু অধিকারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি "societal culture" নামক ধারণা ব্যবহার করে দেখান যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধুমাত্র আইনগত বা রাজনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক। মানুষের পরিচয়, পছন্দ, এবং আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা অনেকাংশেই তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা গঠিত হয়। এই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটই ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ও বিকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকে।[16]

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিভাবে সকল গোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারে কিমলিকা তাঁর 'mirror representation' এর তত্ত্ব তুলে ধরেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্কৃতিক ও জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা যাতে আইনসভায় যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় এবং তারা তাদের গোষ্ঠী স্বার্থের কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। শুধু তাই নয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য সদস্যদেরও দায়িত্ব হল এই সমস্ত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা।[17]

চার্লস টেলর (Charles Taylor) তাঁর 'The Politics of Recognition' প্রবন্ধে স্বীকৃতির রাজনীতির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, সংখ্যালঘুর সংস্কৃতির অধিকার কে যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীকে ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির প্রতি এক ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (positive attitude towards different culture) পোষণ করে চলতে হবে। অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মী সংস্কৃতির সাথে সমঝোতা নয়, বরং ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিকে নিজ সংস্কৃতির ন্যায় সমমর্যাদা দিতে হবে। হতে পারে অন্যের সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান ও জীবনযাত্রা প্রণালী আলাদা কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। তার মধ্যে কোন ভুল নেই, তাই তা সমাজ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। তাই সংখ্যালঘুর সংস্কৃতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতির পাশাপাশি সমান স্বীকৃতি দিতে হবে।[18]

আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচলিত বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের উপরে প্রদত্ত ধারনাগুলি বিশ্লেষণ করে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে। যথা

জেন্ডার ও সেক্সভিত্তিক সংখ্যালঘু (Gender and Sex Minorities):

---

[15] Kymlicka, Will, (1995), 'Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights', New York, Oxford University Press,. P.P. 26-33

[16] তদের, পৃ.পৃ. ৭৫-১০৬।

[17] তদেব, পৃ.পৃ. ১৩৮-১৪৯।

[18] Taylor, Charles, (1992), 'The Politics of Recognition' In A. Gutmann, (ed). 'Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition', New Jersey, Princeton University Press, p.p. 25-73

জেন্ডার ও সেক্সভিত্তিক সংখ্যালঘু (Gender and Sex-based Minority) বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে, যারা লিঙ্গ (gender) বা জৈবিক লিঙ্গ (sex) পরিচয়ের কারণে সমাজে প্রান্তিক অবস্থানে থাকে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী থেকে পৃথক বলে বিবেচিত হয়। এই ধারণাটি মূলত সমাজবিজ্ঞান, লিঙ্গ অধ্যয়ন (Gender Studies) এবং মানবাধিকার অধ্যয়নে গুরুত্ব পায়। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান হলেও নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অধঃস্তন মর্যাদা লাভ করে, যাকে নারীবাদীগণ সংখ্যালঘুর মর্যাদা আখ্যায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে ফুকো এর অভিমত উল্লেখযোগ্য। ফুকো তাঁর "The History of Sexuality" (1976)[19] গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেন যে লিঙ্গ ও যৌনতা সামাজিক ক্ষমতার সাথে জড়িত এবং রাষ্ট্র বা সমাজ যেভাবে লিঙ্গ পরিচয় ও যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করে, তা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর প্রভাব ফেলে। এছাড়া পাশ্চাত্য সমাজে ১৯ শতক থেকে L.G.B.T.Q. গোষ্ঠী (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer) সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এই সম্প্রদায়গুলো লৈঙ্গিক বহুমাত্রিকতার প্রতীক।

প্রতিবন্ধী সংখ্যালঘু (disabilities minorities): প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন বা ডিজ্যাবিলিটি রাইটস মুভমেন্ট অক্ষম জনসমাজকে ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সংখ্যালঘু হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের মতে মূলত সুযোগের অভাবে তারা বঞ্চিত অবস্থায় আছে। ১৯৯৮ সালে যুক্তরাজ্যে মানবাধিকার আইন প্রণয়নের আগে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কীভাবে আচরণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তাদের মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই আইনে একটি ধারা ছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ যদি অন্যদের কর্মকাণ্ড, যেমন ক্ষতি বা অবহেলা, থেকে শিক্ষাগত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রক্ষা না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।

প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন এই ধারণাকে সুসংহত করেছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কেবল তাদের শারীরিক বা মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে বঞ্চিত নন, বরং তারা সমাজের দ্বারা বঞ্চিত একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কিংবা সংখ্যালঘুদের একটি বৃহত্তর জোটের অংশ। এই আন্দোলনের সমর্থকরা হীনমন্যতার ধারণার পরিবর্তে শারীরিক ও মানসিক কার্যকারিতার ভিন্নতাকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য বৈচিত্র্য হিসেবে তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু অটিস্টিক ব্যক্তি 'স্নায়ুবৈচিত্র্য' (neurodiversity)-এর গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন—যেমনভাবে বর্ণবাদের বিরোধীরা জাতিগত বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলেন। একইভাবে, বধির সম্প্রদায়কে প্রায়শই একটি প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীর পরিবর্তে একটি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এমনকি অনেক বধির ব্যক্তি নিজেদেরকে মোটেও 'প্রতিবন্ধী' বলে মনে করেন না; বরং তারা বিশ্বাস করেন, মূলধারার সমাজের জন্য তৈরি প্রযুক্তি ও সামাজিক কাঠামোর কারণে তারা বৈষম্যের শিকার হন।

---

[19] Foucault, Michel. (1976), 'The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction', New York, Pantheon Books, p.p. 26-27

রাজনৈতিক সংখ্যালঘু (Political Minorities): রাজনৈতিক সংখ্যালঘু বলতে সেই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়, যারা জনসংখ্যাগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশ না হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা, নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে দুর্বল অবস্থানে থাকে। এটি একটি আপেক্ষিক ধারণা, যা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। রাজনৈতিক সংখ্যালঘু সবসময় জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যালঘু না-ও হতে পারে, বরং তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্বের বিচারে প্রান্তিক অবস্থানে থাকতে পারে। কিছু গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল বা ব্যবস্থার বিপরীতে অবস্থান করে এবং নীতিগতভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। এই গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অপ্রতিনিধিত্বশীল থাকে বা তাদের কণ্ঠস্বর উপেক্ষিত হয়। কিছু ক্ষেত্রে জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় বা আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক সংখ্যালঘু হয়ে পড়তে পারে যদি তারা রাষ্ট্রের মূলধারার রাজনৈতিক কাঠামোয় প্রান্তিক অবস্থানে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীল খ্রিস্টান গোষ্ঠী – যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে তারা বিশাল অংশ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে কিছু রক্ষণশীল খ্রিস্টান গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক সংখ্যালঘু মনে করে। ভারতে দলিত ও উপজাতি গোষ্ঠী – যদিও সংরক্ষণ ও অন্যান্য নীতির মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও অনেক সময় এই গোষ্ঠীগুলি কার্যত রাজনৈতিক প্রান্তিক অবস্থানে থাকে।

এথনিক মাইনরিটি (Ethnic Minority): এথনিক মাইনরিটি বলতে একটি বৃহত্তর সমাজের মধ্যে বসবাসরত এমন গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং সাধারণত সংখ্যায় কম থাকে। এই গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা, ধর্ম বা জাতিগত পরিচয় বজায় রাখে, যা তাদের বৃহত্তর সমাজের মূলধারার থেকে আলাদা করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিদ্যমান, যেমন চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, রাখাইন ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে। ভারতে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, গন্ড, ভীল, ওরাওঁ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই গোষ্ঠীগুলি প্রধানত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। ভারতের সংবিধানে এদের 'তফসিলি উপজাতি' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

জাতিগত সংখ্যালঘু (Racial Minority): রেস বলতে মানব জাতির এক একটি উপবিভাগ বোঝায় যা অন্য বিভাগ গুলোর থেকে ভিন্ন। এদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো জৈবিক সূত্রেই পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়। মূলত চার ধরনের রেস আছে যথা ককেশয়েড বা শ্বেতাঙ্গ, মঙ্গোলয়েড, নিগ্রয়েড বা কৃষ্ণাঙ্গ এবং অস্ট্রালয়েড। একটি এলাকায় এরকম কোন রেস সংখ্যালঘু হতে পারে, যেখানে অন্য আরেকটি রেস সংখ্যাগুরু। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা সংখ্যালঘু।

ভাষাগত সংখ্যালঘু (Linguistic Minorities): ভাষাগত সংখ্যালঘু বলতে এমন জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যারা একটি রাষ্ট্র বা অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীর তুলনায় স্বল্পসংখ্যক এবং যারা নিজস্ব ভাষাগত পরিচিতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষা করার অধিকার নিয়ে বিশেষ আইনগত সুরক্ষা দাবি করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু (Religious Minorities): ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলতে এমন জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা একটি দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যায় কম এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে পৃথক। আন্তর্জাতিক আইনে, বিশেষত জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশনে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এমন একটি গোষ্ঠী যারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় পরিচয়, ঐতিহ্য, এবং আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এবং কখনও কখনও বৈষম্য ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। এই মানদণ্ডের নিরিখে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলিম ও জৈন ধর্মের বিশ্বাসী মানুষরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের বিশ্বাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে অবস্থান করে।

আন্তর্জাতিক স্তরে সংখ্যালঘু পরিচয় – দক্ষিণ এশিয়াতে তার স্বরূপঃ

বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে এক বা অন্য ধরনের সংখ্যালঘু নেই। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রায় ৩০০০ জাতি বা উপজাতিগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ পরিচয় এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন। বর্তমান বিশ্বের বিদ্যমান ১৯২টিরও বেশি রাজনৈতিকভাবে "সার্বভৌম" দেশের মধ্যে ১৭৫টিরও বেশি গঠনগতভাবে বহুজাতিক। সম্প্রতি T.R. Gurr তাঁর গ্রন্থ 'Minorities at Risk'[20] এ ২৩৩টি ভিন্ন 'অনগ্রসর সংখ্যালঘুদের' তথ্য উপস্থাপন করেছেন। যদিও এই পরিস্থিতি মহাদেশ থেকে মহাদেশে পরিবর্তিত হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে এই সংখ্যালঘু সারা বিশ্বে প্রায় সমস্ত দেশেই ভিন্ন অনুপাতে পাওয়া যায়।

ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ (জাতিগত সীমান্তের বিস্তৃতির হিসেবে) একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে (শান্তিপূর্ণ হোক বা না হোক) তা তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েক যুগ ধরে ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলিম পূণ্যার্থীরা বাংলাদেশে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম ধর্মসভায় (বিশ্ব ইজতেমা নামে পরিচিত) মিলিত হচ্ছে। একই রকমভাবে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার হিন্দুরা তীর্থযাত্রায় ভারতে আসছে। এবং থাইল্যান্ডের নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের নিযুক্ত করা হচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। মায়ানমারের স্থাপত্যশিল্পীরা বাংলাদেশে বৌদ্ধ মূর্তি তৈরিতে সাহায্য করছে। তবে অঞ্চলগুলোয় যখন ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন এই ধরনের আন্তঃসংযোগ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাধর জনগোষ্ঠী যারা জাতিসত্ত্বা, ধর্ম, ভাষার বিচারে মূলধারা পড়ে না, তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে

[20] Gurr, Ted Robert, (1993), 'Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts', Washington D.C, United States Institute of Peace.

সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ফলে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। আবার বৌদ্ধ নিরাপত্তাবাহিনীর দ্বারা মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নিগ্রহ চললে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা সহিংসতার আশঙ্কায় থাকে। এছাড়া শ্রীলঙ্কায় তামিল জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের হিন্দুদের ভারতের প্রতি একটা আলাদা টান আছে বলে ধরে নেওয়া হয়, যার ফলে তাদেরকে আক্রমণ, অপমান এবং উচ্ছেদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। যার ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরস্পর নির্ভরশীলতা বুঝে অঞ্চল ভিত্তিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

দক্ষিণ এশিয়া হল এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, যা ভৌগোলিক ও জাতিগত-সাংস্কৃতিক উভয় পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত। এই দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বরূপ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সার্ক-ভুক্ত(সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন) দেশ অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং আফগানিস্তান এই আটটি দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবস্থা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সার্কভুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের মধ্যে চারটি দেশ যথা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও মালদ্বীপ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বাকি চারটি দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা যথাক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সমস্ত দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবস্থাটা দেখে নেওয়া যাক।

সারণিঃ ২.১ দক্ষিণ এশিয়া দেশসমূহের ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাস (শতাংশের নিরিখে)

দেশ	হিন্দু	মুসলিম	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	শিখ	বোনধর্ম	অন্যান্য
ভারত	৭৯.৮	১৪.২	০.৭০	২.৩	১.৭	-	১.৩
নেপাল	৮১.১৯	৫.০৯	৮.২১	১.৭৬	০.০১	০.২৩	৩.৫৩
ভুটান	২২.৬	-	৭৪.৯	০.৫	-	১.৯	০.১
শ্রীলংকা	১২.৬	৯.৭	৭০.২	৭.৪	-	-	০.১
পাকিস্তান	১.৮৫	৯৬.৫		১.৫৯	-	-	০.০৭
বাংলাদেশ	৭.৯৫	৯১.০৪	০.৬১	০.৩০	-	-	০.১২
মালদ্বীপ	০.২৯	৯৮.৬৯	০.৬৫	০.২৯	-	-	০.০৮
আফগানিস্তান	-	৯৯.৭	-	-	-	-	০.৩

(তথ্যসূত্রঃ সার্কভুক্ত দক্ষিণ এশিয়া দেশসমূহের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে তথ্যসমূহ নেওয়া হয়েছে)

আফগানিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু

আফগানিস্তানের সমাজ কাঠামো একটি বহু জাতি ও বহু ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত হলেও, সেটি প্রকৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক বা সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং এই বৈচিত্র্যকে রাষ্ট্রক্ষমতা, নিরাপত্তা, এবং সামাজিক

মর্যাদার বণ্টনে অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে রাখা হয়েছে, যা দেশটির সামগ্রিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতাস্বরুপ। আফগানিস্তান মূলত দক্ষিণ এশিয়ার একটি ঘোষিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র, এর আইন কানুন চলে কট্টর ইসলামী রীতিনীতি মেনেই। একদা আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু বর্তমানে আফগানিস্তানের জনসংখ্যার ৯৯.৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রধানত হিন্দু, শিখ, বাহাই এবং খ্রিস্টানসহ আফগানিস্তানে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ০.৩ শতাংশ মাত্র। হিন্দু ও শিখরা আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গঠনে দীর্ঘদিন ধরে অবদান রেখেছে। তারা একসময় আফগানিস্তানের শহরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে সক্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে কাবুল, কান্দাহার ও জালালাবাদে। কিন্তু ১৯৭৮ সালের কমিউনিস্ট বিপ্লব, সোভিয়েত আগ্রাসন, গৃহযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে তালিবান শাসন এই গোষ্ঠীগুলোর ওপর ধারাবাহিক নিপীড়নের পথ উন্মুক্ত করে। রাষ্ট্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক ক্ষমতাকাঠামোর ভেতরে এই সংখ্যালঘুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থান ক্রমাগত সংকুচিত হয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। যারা এখনও দেশটিতে অবস্থান করছে, তারা মূলত মন্দির রক্ষার উদ্দেশ্যে বা ধর্মীয় দায়িত্ববোধ থেকে রয়ে গেছেন, তবে তাদেরও পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে, যা এই সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক কাঠামো ভেঙে দিয়েছে। আজ তারা আফগানিস্তানে প্রায় বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। ইউরোপীয় অ্যাসাইলাম সাপোর্ট অফিস (EASO) এর রিপোর্ট অনুসারে, ১৯৭০-এর দশকে আফগানিস্তানে হিন্দু ও শিখ জনসংখ্যা আনুমানিক ৭ লাখ থাকলেও, ১৯৯২ সালে তা কমে আসে ২ লাখ ২০ হাজারে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সংখ্যা কমে মাত্র কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সূত্র অনুসারে বর্তমানে দেশটিতে ১০,০০০ জন থেকে শুরু করে মাত্র ৭০০ জন হিন্দু ও শিখ অবশিষ্ট আছেন। বর্তমানে যারা দেশটিতে রয়ে গেছেন, তারা মূলত কাবুল, গজনি ও নানগারহার প্রদেশে বসবাস করছেন। কাবুলের "হিন্দু গোযার" ও "কারতে পরওয়ান" অঞ্চল দুটি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু-শিখ পাড়া হিসেবে পরিচিত। ধর্মীয় কার্যক্রম সীমিত হয়ে এসেছে মাত্র দুটি গুরুদ্বারে—একটি কাবুলে এবং একটি জালালাবাদে। জালালাবাদ শিখদের জন্য ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গুরু নানক ১৫শ শতকে এই স্থান সফর করেছিলেন। ২০১৯ সালে কাবুলভিত্তিক Porsesh Research and Studies Organisation (PRSO) পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী, আফগানিস্তানে বসবাসরত প্রায় ৯৬.৮% হিন্দু ও শিখ নাগরিক তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত। এছাড়াও, তাঁদের অর্ধেকের বেশি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতেও ভয় প্রকাশ করেন।[21] এছাড়া ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ এর মধ্যে বিভিন্ন সময় যুদ্ধের ফলে কাবুলের হিন্দু মন্দিরগুলো ধ্বংস হয়। এই যুদ্ধ থেকে বাঁচতে তখন অনেক সংখ্যালঘু আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক ২০১৮ সালেও জালালাবাদ শহরে আইএসের এক আত্মঘাতী হামলায় ১৯ জন প্রাণ হারান, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন সংখ্যালঘু শিখ

[21] EASO. (2020), Country of Origin Information Report – Afghanistan: Sikhs and Hindus. European Asylum Support Office. https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-afghanistan-may-2024 (accessed on 12.12.2024)

ধর্মাবলম্বী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আইএসের হুমকির ফলে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া আফগান সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ক্রমশে বেড়েই চলেছে, এবং তাদের বেশিরভাগই পার্শ্ববর্তী হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ ভারতে আশ্রয় নিচ্ছেন।[22] এই তথ্যগুলো থেকে স্পষ্ট যে, আফগানিস্তানে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় আজ চরম সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবন যাপন করছেন। তাদের বর্তমান অবস্থা একটি নিখুঁত উদাহরণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কীভাবে সংঘাতপ্রবণ রাষ্ট্রে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। অপরদিকে, বাহাই সম্প্রদায় আফগানিস্তানে খুব ছোট হলেও ধর্মীয় সহনশীলতার পরীক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। একইভাবে, আফগানিস্তানে গোপনে থাকা খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যারা প্রায়শই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা ব্যাপক নির্যাতনের শিকার এবং নিজেদের পরিচয় প্রকাশ না করে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র আফগান সমাজে ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয়ের উপস্থিতিকেই চিহ্নিত করে না, বরং এটি এক বহুমাত্রিক জাতি-ধর্ম-রাজনীতির সমীকরণে সংখ্যালঘুত্বের অন্তর্নিহিত জটিলতাকে প্রকাশ করে। আফগানিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবস্থা ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, এবং রাষ্ট্রের সমান আচরণ নীতির বাস্তবায়নের প্রশ্নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

পাকিস্তান:

পাকিস্তান একটি ধর্মীয়ভাবে সংবেদনশীল রাষ্ট্র, যা ১৯৪৭ সালে ইসলামিক রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্রের ধারণা পোষণ করলেও, পরে রাষ্ট্রের চরিত্র দ্রুত ইসলামিকীকরণের দিকে মোড় নেয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করা হয় এবং সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যেখানে বলা হয় মুসলমানদের জীবন ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। শুধুমাত্র মুসলমানদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যদিও সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা স্বীকৃত হয়েছে। তবে পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশটির রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দেয়, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি কাঠামোগত বৈষম্য, আইনি নিপীড়ন, এবং সহিংসতার মুখোমুখি হয়। ১৯৯৮ সালে পাকিস্তানের

[22] ডয়ওচে ভেলে (Deutsche Welle), (০১.১০.২০২০) অস্তিত্ব সংকটে আফগান হিন্দু ও শিখরা, https://www.dw.com/bn/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%B0%E0%A6%BE/a-55121944 (Accessed 10 April, 2024)

জাতীয় আদমশুমারি অনুসারে জনসংখ্যার ৯৬.২৮ শতাংশ মুসলমান, ১.৮৫ শতাংশ হিন্দু, ১.৫৯ শতাংশ খ্রিস্টান এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মাত্র ০.০৭ শতাংশ।[23]

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা পাকিস্তানে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগজনক। বিশেষ করে ১৯৭৪ সালে যখন আহমদিয়া সম্প্রদায়কে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ একটি সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে অমুসলিম ঘোষণা করে, এরপর থেকেই এই সম্প্রদায়ের মানুষদের উপাসনালয় ধ্বংস, গ্রেফতার এবং হত্যার মতো নিপীড়নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি তারা নিজেদের 'মুসলিম' বলেও পরিচয় দিতে পারেন না, যা সংবিধান ও ফৌজদারি আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।[24] এইভাবে পাকিস্তান ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য একটি বিপজ্জনক স্থানে পরিণত হয়। জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানকে আরও ইসলামীকরণের পথে নিয়ে যান, হুদুদ অর্ডিন্যান্স জারি করে মুসলিম সম্প্রদায়কে শরীয়ত আইনের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে।[25] একইভাবে, পাকিস্তানের ধর্ম অবমাননা আইন (Blasphemy Law), বিশেষত পাকিস্তান দণ্ডবিধির ২৯৫-বি ও ২৯৫-সি ধারাগুলো, প্রায়ই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানোর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর মহাসচিবের কার্যালয়ের পরিচালক ডেভিড গ্রিফিথস বলেন- "Pakistani authorities need no more evidence to see how dangerous the blasphemy laws are – they are abused to make false accusations that can, and have, led to unlawful killings and even whole communities being attacked and their homes burnt," অর্থাৎ "ব্লাসফেমি আইন কতটা বিপজ্জনক তা বোঝার জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই - মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য এগুলিকে অপব্যবহার করা হয় যা বেআইনি হত্যাকাণ্ডের কারণ হতে পারে, এমনকি পুরো সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ এবং তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়ার কারণও হতে পারে," সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে, পেশোয়ার হাইকোর্টে মানসিক প্রতিবন্ধী একজন ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৫৪ বছর বয়সী তাহির আহমেদ নাসিমকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তার বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হচ্ছিল। তাকে কমপক্ষে ছয়বার গুলি করা হয়েছিল।[26] এ ব্যাপারে ইউরোপীয় পার্লামেন্টও তার রিপোর্টে পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এতে উঠে এসেছে যে, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের – বিশেষত হিন্দু,

---

[23] Pakistan Minority Rights Group, https://minorityrights.org/country/pakistan/ (Accessed 12 April, 2024)

[24] Pakistan: Massacre of Minority Ahmadis (June 1, 2010) Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2010/06/01/pakistan-massacre-minority-ahmadis (accessed on 09.07.2023)

[25] রায়, মোহিত, (২০১৭), সংখ্যালঘু ও পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চিত ধর্মনিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ, ওয়াল্ড প্রেস, পৃ. ৪।

[26] Pakistan: Accusations of Blasphemy continue to endanger lives (25 August, 2020), Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/accusations-of-blasphemy-in-pakistan-continue-to-endanger-lives/ (accessed on 15.04.2023)

খ্রিস্টান, শিখ ও আহমদিয়া সম্প্রদায় – নিয়মিতভাবে বৈষম্য, সামাজিক বর্জন, সহিংসতা ও আইনি নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে ব্লাসফেমি (ধর্ম অবমাননা) আইনকে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা নিয়ে প্রতিবেদনটি উদ্বিগ্ন। এতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রায়ই প্রমাণ ছাড়াই গৃহীত হয় এবং জনতা কর্তৃক হামলা বা হত্যার ঘটনাও ঘটেছে।[27]

সংখ্যালঘু নারীরা আরও গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছে। বিশেষত সিন্ধু ও পাঞ্জাবে হিন্দু এবং খ্রিস্টান কিশোরীদের অপহরণ করে জোরপূর্বক ধর্মান্তর এবং বাল্যবিবাহের অভিযোগ রয়েছে। বিচার ব্যবস্থার অসারতা, পুলিশের পক্ষপাত এবং সামাজিক চাপের কারণে এসব ঘটনায় অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (TLP)-এর মতো চরমপন্থী ইসলামি সংগঠনগুলোর উত্থান এবং ইসলামিক স্টেটের (ISIS) মতো জঙ্গি সংগঠনগুলোর সহিংসতা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২২ সালে একটি শিয়া মসজিদে ISIS-এর হামলায় ৬০ জনের বেশি নিহত হন, যা ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রকট চিত্র তুলে ধরে। শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বৈষম্য সুস্পষ্ট। যদিও সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, বাস্তবে অনেক স্কুলে তারা ইসলামিক স্টাডিজ পড়তে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে অমুসলিমদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা সংখ্যালঘুদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্যকে উৎসাহিত করে। এই সমস্ত কারণে US Commission on International Religious Freedom (USCRIF) ২০২২ সালে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন (International Religious Freedom Act) এর অধীনে "Country of Particular Concern" (CPC) হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। (USCIRF Annual Report, 2022)[28]

পাকিস্তানের রাজনীতিতেও সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি সীমিত। যদিও সংবিধানে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে তাদের সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রয়েছে, বাস্তবে এই প্রতিনিধিরা বড় রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা প্রায়ই সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে সোচ্চার হতে পারেন না। এর ফলে সংখ্যালঘুদের কণ্ঠস্বর মূলধারার রাজনীতিতে প্রায় অনুপস্থিত থাকে।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো একটি অন্তর্নিহিত সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেলেও তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তা থেকে অনেক দূরে। আইনি সংস্কার, সমাজে সহনশীলতার প্রচার এবং

[27] European Parliament (2019-2024), Blasphemy laws in Pakistan, in particular the case of Shagufta Kausar and Shafqat Emmanuel, P9_TA(2021)0157, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0157_EN.pdf (accessed on 23.01.2024).

[28] United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Annual Report- Pakistan, (2023), https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2023-05/Pakistan.pdf (accessed on 23.02.2024).

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তোলাই হতে পারে এই সংকট উত্তরণের পথ।

মালদ্বীপ:

পর্যটকদের প্রিয় মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অত্যন্ত ধর্মীয়ভাবে একরৈখিক রাষ্ট্র। মালদ্বীপে মোট জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে ৯৮.৬৯ শতাংশ মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টান যথাক্রমে ০.২৯ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.৬৫ শতাংশ এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী রয়েছে মাত্র ০.০৮ শতাংশ। ২০০৮ সালের মালদ্বীপের সংবিধানে সুন্নি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধুমাত্র সুন্নি মুসলমানদের দেশের নাগরিকত্ব ধারণ করার অনুমতি রয়েছে এবং নাগরিকরাই শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বলতে কোনো গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের জন্য খুব একটা জায়গা নেই। তবুও, অভিবাসী কর্মী ও পর্যটনের কারণে কিছু সীমিত মাত্রার ধর্মীয় সংখ্যালঘু উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মালদ্বীপে প্রধানত ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে আগত অভিবাসী শ্রমিকরা বসবাস করেন, যাদের অনেকে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। তবে এসব ধর্মীয় পরিচয়কে প্রকাশ্যে পালন করতে তাদের বাধা দেওয়া হয় এবং অনেকে ধর্মীয় পরিচয় গোপন করে থাকেন, কারণ মালদ্বীপের দণ্ডবিধিতে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম প্রচার কিংবা প্রকাশ্যে পালন নিষিদ্ধ। কিছু ক্ষেত্রে মন্দির বা গির্জার অস্তিত্ব থাকলেও, সেগুলো মূলত ব্যক্তিগত বা দূতের ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধ। এছাড়া দেশটিতে সমস্ত বাসিন্দাদের তাদের সন্তানদের মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস শেখাতে হবে। এবং দেশের রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য প্রত্যেকের সুন্নি মুসলমান হতে হবে এবং সরকারি বিধি-বিধান ইসলামী আইনের উপর ভিত্তি করে চালিত হবে। তাই স্বাভাবিকভাবে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, এখানে মুসলিম ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয় না। তাই বিভিন্ন সময়ে যে অল্পসংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে তাদের উপর নেমে এসেছে নানাবিধ মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট অনুযায়ী অন্তত পনের জনকে তাঁদের রাজনৈতিক মতামত বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যাদের 'বিবেকের বন্দি' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই বছরের জুলাই মাসে মজলিস (মালদ্বীপের আইনসভা) একটি আইন পাশ করে, যেখানে 'স্বাধীনতা এবং সরকারের নীতির পরিপন্থী ধর্মীয় পরামর্শ প্রদান'-এর অভিযোগে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়।

ডিসেম্বর ১৯৯৪-এর সংসদীয় নির্বাচন ঘিরে বহু মানুষকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়, এবং অভিযোগ রয়েছে যে, কিছু বন্দিকে নির্যাতনও করা হয়েছিল। মালদ্বীপের রাজনৈতিক কাঠামো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নীতির বিরোধী। সেখানে রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আছে, ফলে কোনো সংগঠিত বিরোধী শক্তি গড়ে ওঠার সুযোগ নেই। মালদ্বীপে ধর্মীয় স্বাধীনতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই এবং সেখানে ধর্মীয় বৈষম্য ও নিপীড়নের এক দুঃখজনক চিত্র দেখা যায়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের

মুসলমান হওয়া বাধ্যতামূলক। অমুসলিমদের উপাসনালয় নির্মাণের সুযোগ না দেওয়া এবং ধর্মীয় মূর্তি বা প্রতীক আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা এই নিপীড়নের অংশ।

২০০৪ সালের আগস্টে মালদ্বীপে বড় ধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়, যার ফলে সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে সরকার এসব প্রতিশ্রুতি রূপায়ন করেনি এবং রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী বা ধর্মীয় অধিকারের জন্য লড়াই করা ব্যক্তিদের অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। এই প্রেক্ষাপটে মালদ্বীপের মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচনার মুখে পড়ে।[29] মালদ্বীপের সংবিধানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও এতে "যেকোনো ধরণের বৈষম্য" নিষিদ্ধ করার বিধান রয়েছে, তবুও এটি ধর্মকে বৈষম্যের নিষিদ্ধ ভিত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে না। সংবিধানে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে তবে তা যেনো ইসলামের নীতির পরিপন্থী না হয়। এই আইনে একজন মুসলিমের অন্য ধর্মে ধর্মান্তর নিষিদ্ধ। আইন অনুসারে, এই আইন লঙ্ঘনের ফলে ধর্মান্তরিত ব্যক্তির নাগরিকত্ব হারানো হতে পারে, যদিও একজন বিচারক শরিয়া আইনশাস্ত্র অনুসারে আরও কঠোর শাস্তি আরোপ করতে পারেন। যদিও আইনে এই ধরনের শাস্তির বিধান নেই, তবুও জনসাধারণ এবং ধর্মীয় পণ্ডিতরা প্রায়শই ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার (অর্থাৎ, ধর্মত্যাগের) ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান হিসেবে শরিয়া আইনশাস্ত্রকে বোঝেন।[30]

শ্রীলংকা:

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব দেশ এই শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শ্রীলঙ্কায় কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার প্রায় ৭০.১ শতাংশ বৌদ্ধ, ১২.৬ শতাংশ হিন্দু, ৯.৭ শতাংশ মুসলিম, ৬.২ শতাংশ খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ১.৪ শতাংশ জনগোষ্ঠী বসবাস করেন। শ্রীলঙ্কায় জাতিসত্তা এবং ধর্ম জটিলভাবে সম্পর্কিত, এখানে বেশিরভাগ সিংহলী বৌদ্ধ, বেশিরভাগ তামিল হিন্দু এবং বেশিরভাগ মুসলিম নিজেদেরকে আলাদা জাতিসত্তার অংশ বলে মনে করেন।[31] শ্রীলঙ্কা মূলত বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও এখানে বিভিন্ন ধর্ম পালন করা উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রয়েছে। শ্রীলঙ্কার এই ধর্মীয় প্রেক্ষাপট এদেশের ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক কিছু দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার জন্ম দিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় কয়েক দশক

[29] Maldives, Minority Rights Group, https://minorityrights.org/country/maldives/ (Accessed 13 April, 2024)

[30] Maldives (2023) International Religious Freedom Report, USCIRF https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/maldives/ (accessed on 23.01.2024)

[31] Sri Lanka, (Ministry of Finance and Planning), (2014), 'Census of Population and Housing 2012: Key Findings', Colombo: UNFPA, Department of Census and statistics, p.p. 30-33.

ধরে চলা গৃহযুদ্ধের ক্ষত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিদিনের জীবনে এখনও দৃশ্যমান। দেশটির উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের তামিল ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্য এখনও গৃহহীন হয়ে ইন্টারনালি ডিসপ্লেসড পপুলেশন (IDP) ক্যাম্পে জীবন কাটাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সামরিকীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে তামিল ও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদেরকে পর্যাপ্ত থাকার জায়গা দেয়া হয়নি, এবং আন্তর্জাতিক মান লংঘন করে তাদের জন্য খুব সীমিত আকারে জীবিকার সুযোগ রাখা হয়েছে। এমনকি ২০০৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার পরেও এখনো শ্রীলঙ্কার মিলিটারি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জায়গাজমি দখল করে রেখেছে "উচ্চমাত্রার নিরাপত্তার অঞ্চল" এর নামে। শ্রীলঙ্কা সরকার ১৯৭৯ সালের 'দ্য প্রিভেনশন অফ টেররিজম অ্যাক্ট' (The Prevention of Tourism Act) আইনের মাধ্যমে পুলিশকে বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়েছে কাউকে তল্লাশি করতে, গ্রেফতার করতে এবং শাস্তি দিতে। এই আইন অসমভাবে তামিল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

শ্রীলঙ্কায় ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের অবস্থান এবং বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য আইন ও আচরণ দ্বারা সুনির্ধারিত। গবেষণায় দেখা গেছে যে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত "সিংহলিকরণ" প্রক্রিয়া তামিল সংস্কৃতিকে মুছে দেওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সিংহলি ভাষায় রাস্তার পথনির্দেশিকা, গ্রাম ও স্থাপনার নাম লেখা এবং বৌদ্ধ স্থাপনা তৈরীর মধ্য দিয়ে।[32] বর্তমান দিনে শ্রীলঙ্কার অন্যান্য সব দুশ্চিন্তার সাথে বিভিন্ন রকম বিষাক্ত জাতীয়তাবাদ একটি বড় দুশ্চিন্তার কারণ। এই বিষাক্ত জাতীয়তাবাদ অনেক সময়ই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রচারিত এবং বৈষম্য, ঘৃণা ও সহিংসতা ছড়ায়। বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ শ্রীলঙ্কান রাজনীতিতে অনেকদিন ধরে একটি চালিকাশক্তি। এটি এমন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শ্রীলংকার বহুসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তামিল, মুসলিম ও খ্রিস্টানরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। ২০১৮ সালে কান্ডিতে ঘটা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সময় দেখা গেছে শত শত সিংহলি বৌদ্ধ মুসলিম গ্রাম গুলোতে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যের ব্যাপারটা আরও প্রকট হয় ২০১৯ সালে মুসলিম গ্রুপের দ্বারা সংঘটিত ইস্টার বোমা হামলার মাধ্যমে ২৬৮ জন প্রাণ হারানোর ফলে। এই ঘটনার ফলে বৌদ্ধ উগ্রবাদী সংগঠন 'বদু বালা সেনা' (BBS) নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাদের সংস্কৃতিক আচরণগুলো নিয়ে সমালোচনা করে আসছে যেমন তাদের পোশাকরীতি, নামাজের রীতি এবং হালালভাবে পশু জবাইয়ে রীতি নিয়ে। এছাড়া শ্রীলংকান খ্রিষ্টানদের সংগঠন ন্যাশনাল খ্রিস্টান ইভাঞ্জালিকা অ্যালায়েন্স অফ শ্রীলঙ্কা (NCEASSL) জানিয়েছে যে স্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলোর

[32] Anandakugan, Nithyani (2020), The Sri Lankan Civil War and Its History, Revisited in 2020, Harvard International Review, 31 August, 2020, https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war

মদদে উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ গ্রুপ প্রায় খ্রিস্টানদের উপাসনা বিঘ্ন ঘটায়।[33] তা সত্ত্বেও ধর্মীয় কারণে শ্রীলঙ্কা থেকে সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করে না।

নেপাল:

ভারত ও চীনের তিব্বত অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত সার্কভুক্ত দেশ নেপাল। নেপাল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। নেপালের কোন রাষ্ট্র ধর্ম নেই। নেপাল ২০০৮ সালে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা পর্যন্ত, হিন্দুধর্ম ছিল সরকারি ধর্ম। ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুসারে নেপালের জনসংখ্যার ৮১.২ শতাংশ হিন্দু, ৮.২ শতাংশ বৌদ্ধ, ৫.১ শতাংশ মুসলিম, ৩.২ শতাংশ কিরাত এবং ০.৫ শতাংশ অন্যান্য ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী রয়েছে। নেপালে কোন ধর্মের পক্ষপাতিত্বমূলক বা বিরোধী কোনো আইন নেই।

নেপালের সংবিধানের ধারা ২৬-এ ব্যক্তির নিজ ধর্ম পালন, প্রচার এবং সংরক্ষণের অধিকার স্বীকৃত হলেও, অন্যদিকে কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতাও আরোপ করা হয়েছে—যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখযোগ্যভাবে, ধারা ২৬(৩)-এ বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি অন্যকে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে রূপান্তর করাতে পারবে না, এবং এ ধরণের কর্মকাণ্ড শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ এই ধারা ধর্মান্তরের স্বাধীনতাকে কার্যত নিষিদ্ধ করে, যা "আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি" (ICCPR) এর ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যক্তির পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী। যেখানে বলা হয় যে, প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। এর অর্থ শুধু ধর্ম পালনের অধিকারই নয়, বরং নিজ ইচ্ছেমতো কোনো ধর্ম গ্রহণ বা পরিত্যাগ করারও অধিকার আছে। এই অধিকার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, প্রকাশ্যে বা গোপনে, উপাসনা, চর্চা, শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিধি পালন এর মাধ্যমেও কার্যকর হতে।[34] নেপালে মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় ধর্মীয় স্বাধীনতা চর্চায় অনেক বেশি সীমাবদ্ধতা অনুভব করে। যেখানে ৯২% হিন্দু তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম প্রকাশ্যে করতে পারেন, সেখানে খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে ৪৫% এবং ৫৫% মুসলিম এ বিষয়ে মতামত দিতে চাননি, যা একপ্রকার ভয়ের সংকেত। এই নিরুত্তরতা প্রকাশ করে যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর সামাজিক পর্যবেক্ষণ, শঙ্কা বা নিপীড়নের সম্ভাবনা বেশি। আবার হিন্দুদের মধ্যেও যারা দলিত, তারা ধর্মীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন, যা দেখায় যে

[33] ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ, (২০২১), দক্ষিণ ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ১৭ই জুন, পৃ.পৃ. ১১-১২। https://www.peacemakersnetwork.org/wp-content/uploads/2021/06/Bengali-Minority-Rights-and-Freedom-of-Religion-or-Belief-in-South-and-Southeast-Asia.pdf (Accessed 10 September, 2024)

[34] International Commission of Jurists, Challenges to Freedom of Religion or Belief in Nepal: A Briefing Paper (July 2018) p.p. 08-16. https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/08/Nepal-Freedom-of-religion-brief-Advocacy-Analysis-brief-2018-ENG.pdf (accessed on 09.10.2024)

শুধু ধর্ম নয়, জাতিগত অবস্থানও দুর্বলতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত বিভাজনেও বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। মুসলিম সম্প্রদায় প্রধানত কৃষিভিত্তিক পেশায় যুক্ত থাকলেও তার থেকে তারা উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে পারে না। সরকারী ও বিশেষায়িত সেবার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ হিন্দুদের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত, যা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাড়াতে সাহায্য করে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় – যেখানে ৭৭% হিন্দু সমাজের ইতিবাচক মনোভাবের কথা বলেন, সেখানে ৬৯% মুসলিম সমাজের নেতিবাচক মনোভাবের শিকার বলে জানান। এটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর বিদ্যমান বিদ্বেষ, সন্দেহ বা বৈষম্যের একটি পরিষ্কার চিত্র।

নেপালে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ একদিকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলেও বাস্তবে তা ধর্মীয় সংখ্যাগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব এবং সংখ্যালঘুদের বর্জনের মাধ্যমে ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। কোভিড-১৯ এর মতো দুর্যোগ পরিস্থিতি এই দুর্বলতাগুলোকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে, যা মূলত ধর্ম ও শ্রেণিগত প্রান্তিকতা মিলিয়ে তৈরি একটি জটিল সামাজিক বাস্তবতা। এতে প্রমাণ হয় যে শুধুমাত্র আইন থাকা যথেষ্ট নয়, বরং সেই আইনের বাস্তবায়নে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তি, সুরক্ষা এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি।[35]

ভুটান:

দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট একটি রাজতান্ত্রিক দেশ ভুটান। ভুটান সংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিকভাবে একটি বৌদ্ধ দেশ। এই বৌদ্ধধর্ম জাতির সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভুটানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম, যা ভুটানের জনসংখ্যার ৭৪.৯ শতাংশ জনগোষ্ঠী পালন করে। বৌদ্ধ ধর্মের পরে ভুটানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হলো হিন্দুধর্ম যা জনসংখ্যার ২২.৬ শতাংশ জনগণ পালন করেন। এছাড়া ভুটানের জনসংখ্যার ১.৯ শতাংশ বোনধর্ম বা প্রকৃতির উপাসক জনগোষ্ঠী, ০.৫ শতাংশ ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণ করা জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য ধর্মের ০.০১ শতাংশ জনগোষ্ঠী ভুটানে বসবাস করেন।

২০০৮ সালের ভুটানের সংবিধান স্বীকার করে যে "বৌদ্ধধর্ম হল ভুটানের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য" যা শান্তি, অহিংসা, করুণা এবং সহনশীলতার নীতি ও মূল্যবোধ প্রচার করে (ধারা ৩, ১), এবং ভুটানে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখার পাশাপাশি দেশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে উন্নীত করা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। (ধারা ৩, ৩)। একই সাথে, একই সনদে বলা হয়েছে যে ভুটানের নাগরিকদের "চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার থাকবে",

[35] Vulnerability and Religious Minorities in Nepal in the context of Covid-19 pandemic (2020), Samari Utthan Sewa (SUS), Nepal. http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-ANM-011-2020/ (accessed on 12.06.2024).

এবং জোর করে বা প্রলোভনের মাধ্যমে কাউকে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী হতে বাধ্য করা যাবে না (ধারা ৭, ৪)[36]। এই দ্বৈত নীতি সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, দেশের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও, বাস্তবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা ও বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভুটানের দক্ষিণাঞ্চলে নেপালি বংশোদ্ভূত লোতশাম্পা সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রচলন রয়েছে। 1990-এর দশকে, ভুটান সরকার "ভুটানাইজেশন" নীতির আওতায় প্রায় 100,000 লোতশাম্পাকে দেশত্যাগে বাধ্য করে, যা তাদের শরণার্থী হিসেবে নেপালে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বর্তমানে, প্রায় 7,000 লোতশাম্পা শরণার্থী নেপালের ক্যাম্পে অবস্থান করছে, এবং তাদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া এখনও অনিশ্চিত। খ্রিস্টানরাও ভুটানে সংখ্যালঘু এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত। সরকারিভাবে খ্রিস্টান গির্জাগুলোর নিবন্ধন অনুমোদিত নয়, ফলে তারা প্রকাশ্যে উপাসনা করতে পারে না এবং গির্জা নির্মাণে বাধা রয়েছে। খ্রিস্টানদের অনেক সময় সামাজিক বৈষম্য এবং সরকারি সেবা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।[37] ওপেন ডোরস খ্রিস্টানদের প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রে দেশটিকে তাদের বার্ষিক বিশ্ব নজরদারি তালিকায় তালিকাভুক্ত করে চলেছে, উল্লেখ করে যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ নাগরিকদের বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করার জন্য ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে, বিশেষ করে সেই সকল পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে যারা কখনও কখনও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকে পরিবারের জন্য লজ্জাজনক বলে মনে করেন এবং যারা খ্রিস্টান পরিবারের সদস্যদের অস্বীকার করেন। এছাড়াও ভুটান সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য ২০০৭ সালের ধর্মীয় সংগঠন আইন (Religious Organisations Act of 2007) এর অধীনে ধর্মীয় সংগঠন কমিশন (Commission for Religious Organisations) গঠন করে, যার কাছ থেকে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় সমাবেশ করার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং ধর্মীয় সংগঠন কমিশন (CRO) এর সাথে নিবন্ধন করতে হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ২০২০ সাল পর্যন্ত, CRO ১৪টি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অনুমোদন দিয়েছে, যদিও কোনওটিই সংখ্যালঘু ধর্মের ছিল না।[38]

বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশ একটি সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিভাজনের পর থেকেই বর্তমান

[36] Bhutan 2008 Constitution https://www.constituteproject.org/constitution/Bhutan_2008 (accessed on 03.06.2023)

[37] Religious Freedom Report 2023-Bhutan, Aid to the Church in Need (CAN) https://acninternational.org/religiousfreedomreport/reports/country/2023/bhutan (accessed on 20.08.2023)

[38] Office of International Religious Freedom (2020), International Religious Freedom Report: Bhutan, https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/bhutan/ (accessed on 12.07.2023)

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। পাকিস্তান আমলে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য ও দমননীতি ছিল প্রাতিষ্ঠানিক, যা পূর্ববাংলায় ধর্মীয় ও ভাষাগত অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈষম্যহীন একটি রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মৌলিক নীতিরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, ১৯৭৭ ও ১৯৮৮ সালে সংবিধানে পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামিক মূল্যবোধে রাষ্ট্র পরিচালনার ঘোষণা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলমান হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং আদিবাসী ধর্মবিশ্বাসীরা দীর্ঘকাল ধরেই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারি (২০২২) অনুযায়ী, হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭.৫ শতাংশ, বৌদ্ধ ০.৬ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৩ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী আরও ক্ষুদ্র সংখ্যায় বিদ্যমান। পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) এবং উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে কেন্দ্রীভূত জাতিগত সংখ্যালঘুরা সাধারণত অ-ইসলামিক ধর্ম পালন করে। ময়মনসিংহের গারোরা প্রধানত খ্রিস্টান, যেমন গাইবান্ধার কিছু সাঁওতাল। বেশিরভাগ বৌদ্ধই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য। বাঙালি এবং জাতিগত সংখ্যালঘু খ্রিস্টানরা সারা দেশে সম্প্রদায়ে বাস করে, যার মধ্যে বরিশাল জেলার বরিশাল শহর ও গৌরনদী, গোপালগঞ্জ জেলার বানিয়ারচর, ঢাকা শহরের মনিপুরীপাড়া এবং খ্রিস্টানপাড়া এবং গাজীপুর ও খুলনা শহরে তুলনামূলকভাবে বেশি ঘনত্ব রয়েছে। তবে, রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয়তাবাদী উত্তেজনা, বাস্তবিক সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপ, ধর্মীয় নিপীড়ন, এবং জমি দখলের মত ঘটনার কারণে সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা বিভিন্ন সময়ে হুমকির মুখে পড়েছে। ফলত সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ ক্রমবর্ধমান। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বহু ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। সরকারি চাকরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় অংশগ্রহণে অনেক সময় অঘোষিত বৈষম্য কাজ করে। এছাড়া, নির্বাচনকালীন সময়ে এবং ধর্মীয় উত্তেজনার মুহূর্তে সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা, প্রতিমা ভাঙচুর, জমি দখল ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের অভিযোগ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালে কুমিল্লা ও রংপুরসহ বিভিন্ন স্থানে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে বিভিন্ন সময়ে খ্রিস্টান চার্চে আক্রমণ, বৌদ্ধ বিহার জ্বালিয়ে দেওয়া এবং আদিবাসীদের ভুমি দখলের ঘটনাও ঘটেছে।[39]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীরা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার হন—একদিকে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য, অন্যদিকে নারী। এই দ্বৈত পরিচয়ের কারণে তারা যৌন হয়রানি, অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, এবং বিচারহীনতার

[39] Report on International Religious Freedom: Bangladesh (2023), U.S. Department of State. https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/bangladesh/ (accessed on 23.04.2024)

শিকার হয়ে থাকেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যে উঠে আসে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীদের নিরাপত্তাহীনতা তাদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ কমিয়ে দিয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলাদের উপর চালিত অত্যাচার তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। ২০১৭-১৮ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সংখ্যালঘু নারীদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।[40]

বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮ ও ৪১-এ ধর্মীয় স্বাধীনতা, বৈষম্যহীনতা এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এসব অধিকারের বাস্তবায়ন প্রশ্নবিদ্ধ। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকায় রাষ্ট্র নিরপেক্ষতার নীতিতে আঘাত এসেছে বার বার। সংখ্যালঘুদের দাবি, রাষ্ট্র যদি প্রত্যক্ষভাবে কোনো একটি ধর্মের পক্ষে অবস্থান নেয়, তবে তারা নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করতে পারেন না। তাছাড়া যখনই কোনও দেশ রাজনৈতিক ভাবে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে তখনই সেখানকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। অতি সম্প্রতি ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ছাত্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে, এবং তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে দেশ জুড়ে সহিংসতা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সহিংস হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৪ সালে ৫২টি জেলায় সংখ্যালঘুদের উপর কমপক্ষে ২০৫টি হামলার ঘটনা ঘটে।[41] ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর ২,২০০টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[42] অথচ বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের পূর্বশর্ত হলো সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থা ও গণমাধ্যমের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

---

[40] Mishra, Piyush (Dec. 20, 2024), 2,200 cases of violence against Hindus in Bangladesh, 112 in Pakistan: Government. India Today https://www.indiatoday.in/india/story/government-data-violence-against-hindus-minorities-bangladesh-pakistan-2652948-2024-12-20 (accessed on 05.03.2025)

[41] Minorities faced 205 attacks after fall of Sheikh Hasina government in Bangladesh: Hindu groups (August 10, 2024), The Hindu. https://www.thehindu.com/news/international/minorities-faced-205-attacks-after-fall-of-sheikh-hasina-government-in-bangladesh-hindu-groups/article68508954.ece (accessed on 02.03.2025)

[42] Mishra, Piyush (Dec. 20, 2024), 2,200 cases of violence against Hindus in Bangladesh, 112 in Pakistan: Government. India Today https://www.indiatoday.in/india/story/government-data-violence-against-hindus-minorities-bangladesh-pakistan-2652948-2024-12-20 (accessed on 05.03.2025)

তবে আশার বিষয় হলো, বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন, বাম রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংস্থা ও শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের অংশ একটি অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ গঠনে সচেষ্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিবাদ, সংখ্যালঘু কণ্ঠের উত্থান, এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্যোগ দেশে সহনশীলতার চর্চাকে উৎসাহ দিচ্ছে।

ভারত :

ভারত একটি ধর্মীয়ভাবে বহুবিচিত্র দেশ, যেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও ইহুদি জনগোষ্ঠী সহাবস্থান করে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১২১ কোটি ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার, যার মধ্যে হিন্দুধর্ম ৯৬.৬২ মিলিয়ন (৭৯.৮ শতাংশ), ইসলাম ১৭.২২ মিলিয়ন (১৪.২ শতাংশ), খ্রিস্টধর্ম ২৭.৮ মিলিয়ন (২.৩ শতাংশ), শিখ ধর্ম ২০.৮ মিলিয়ন (১.৭ শতাংশ), বৌদ্ধ ধর্ম ৮.৪ মিলিয়ন (০.৭ শতাংশ), জৈন ধর্ম ৪.৫ মিলিয়ন (০.৪ শতাংশ), জরথুষ্ট্র ধর্ম (পার্সি) (৫৭,৩০০), ইহুদি ধর্ম (প্রায় ৪,০০০)। বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী হলো ভারতের বৃহত্তম ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। শুধু তাই নয়, বিশ্বে ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পরই সবচেয়ে বেশি মুসলমান জনগোষ্ঠীর বসবাস করেন ভারতে। দেশে সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করেন চারটি রাজ্যে- উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক (৩৪ মিলিয়ন), পশ্চিমবঙ্গে (২৪ মিলিয়ন), বিহারে (১৭ মিলিয়ন) ও মহারাষ্ট্রে (১২ মিলিয়ন)। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম জম্মু-কাশ্মীর এবং কর্নাটকে প্রায় ৫ থেকে ১০ মিলিয়ন মুসলমান বসবাস করে। রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড ও তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রায় ৩-৫ মিলিয়ন মুসলমান বাস করেন। এছাড়াও দিল্লি, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাঞ্চলে বসবাস করেন ১.২ মিলিয়ন মুসলমান।[43]

প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় রাষ্ট্রের আত্মপরিচয় গঠিত হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের ভিত্তিতে, যেখানে প্রতিটি ধর্মের মানুষ যেন সমান অধিকার ও মর্যাদা পায়, সেই লক্ষ্যে সংবিধান কাঠামো নির্মিত হয়েছে। তবে এই নীতিগত অবস্থান বাস্তবজীবনে কতটা কার্যকর, সেটাই প্রশ্ন। ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি এবং সমাজে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থান, অধিকার, এবং অভিজ্ঞতা—এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি জটিল বাস্তবতা। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক পরিচয়, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সমানাধিকারের মতো মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে নানা সময়ে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার সূত্রপাত হয়েছে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সবসময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়ে একটি প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতেন। তাঁর চিন্তাভাবনায় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক সংহতির

[43] Govt. of India, (Ministry of Home Affairs), Census of India -2011, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India

ধারণার সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা গভীরভাবে জড়িত ছিল। নেহেরু বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে। তবে তিনি এটাও বোঝাতেন যে, শুধুমাত্র সমান অধিকার নিশ্চিত করলেই সংখ্যালঘুদের প্রকৃত নিরাপত্তা বা অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না। তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষা, ধর্মচর্চা ও শিক্ষাগত অধিকার রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা নয়, বরং ইতিবাচক সমর্থন প্রদর্শন করা উচিত। সংখ্যালঘুদের ওপর সংখ্যাগুরু সংস্কৃতি বা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া তিনি ঘোরতরভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর মতে, ভারতের মতো বহুত্ববাদী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষা করা কেবল সংবিধানের অনুবর্তী দায় নয়, বরং একটি নৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোর পেছনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রসঙ্গত বহুসংস্কৃতিবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক ভিখু পারেখ এর মতানুসারে নেহেরু যে জাতীয় দর্শনের (national philosophy of India) কল্পনা করেছিল তা ভারতীয় সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল "individual liberty, equality of opportunity, social justice, secularism, the spirit of rational inquiry...scientific temper, independence of action and judgement in world affairs of which non-alignment was a contingent expression, and so on"[44] অর্থাৎ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সুযোগের সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানের চেতনা ইত্যাদি- যা সবই ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ হিসেবে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন অবস্থানের প্রতিফলন হিসেবে তিনি "নন-অ্যালাইনমেন্ট"-এর পক্ষেও ছিলেন। তবে সংখ্যালঘুদের প্রসঙ্গে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি একটি জটিল বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করে। তিনি সংখ্যালঘু অধিকারের ধারণাকে মূলত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়—বিশেষত হিন্দুদের—নৈতিক উন্নতির এক ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, সংখ্যাগুরুদের সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের মধ্যেই একটি সাম্যবাদী ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত এক ধরনের নৈতিক আহ্বান ছিল, যা সংখ্যাগুরুদের কাছে সংখ্যালঘুদের জন্য সহানুভূতির প্রত্যাশা করে।[45] তবে এই ধরনের নৈতিক আহ্বান সংখ্যালঘু অধিকারের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত বা সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প নয়। বরং এটি একটি ঐতিহ্যগত এবং শিথিল মানসিকতার প্রতিফলন, যেখানে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংখ্যাগুরুদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের ওপর। এর ফলে সংখ্যালঘু অধিকারের ধারণা একটি দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়, কারণ এটি নির্ভর করে সংখ্যাগুরুদের সদিচ্ছা ও সহিষ্ণুতার উপর, কোনো বাধ্যতামূলক সাংবিধানিক নিশ্চয়তার উপর নয়।

---

[44] Parekh, Bhikhu (2006), 'Defining India's Identity', India International Centre Quarterly, Vol. 33, No. 1, p. 4

[45] Choudhary, Vikash K. (21 October 2021), The Idea of Religious Minorities and Social Cohesion in India's Constitution: Reflections on the Indian Experience, MDPI, P.4. https://www.mdpi.com/2077-1444/12/11/910 (accessed on 05.07.2023)

যাইহোক, ভারতের সংবিধানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় একাধিক সাংবিধানিক উদ্যোগ ও বিধান রাখা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো মূলত সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত অধিকার সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে। অনুচ্ছেদ ২৫ থেকে ২৮ ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে প্রত্যেক নাগরিককে নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও চর্চার স্বাধীনতা প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ২৫ – অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার ভোগ করবে, যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করে। অনুচ্ছেদ ২৬ অনুযায়ী, প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অধিকার আছে নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেগুলি পরিচালনা করার। তারা ধর্ম প্রচার, ধর্মীয় কাজ এবং সম্পত্তি পরিচালনার অধিকার রাখে, তবে এখানেও আইন এবং নৈতিকতার সীমারেখা আছে। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুসারে, কোনো ব্যক্তি কর প্রদানে বাধ্য হবেন না যদি তা কোনো বিশেষ ধর্মীয় কার্যক্রম বা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে কোনো ধর্মীয় কার্যকলাপে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য নাগরিকদের উপর কর আরোপ করতে পারে না। অনুচ্ছেদ ২৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান সংক্রান্ত নিয়ম নির্ধারণ করে। যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়, তবে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ। তবে, যদি প্রতিষ্ঠানটি সরকার থেকে আংশিক অনুদান পায় অথবা পুরোপুরি বেসরকারি হয়, তাহলে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে, তবে শিক্ষার্থীদের সেই শিক্ষায় অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। অনুচ্ছেদ ২৯ ও ৩০ সংখ্যালঘুদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে। অনুচ্ছেদ ২৯(১) অনুযায়ী, যেকোনো সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার রাখে। অনুচ্ছেদ ৩০ সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার প্রদান করে। এর ফলে সংখ্যালঘুরা তাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে পারে।[46] সংবিধানের ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও এতে সরাসরি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ নেই, তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে তাদের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর পথ তৈরি হয়।[47] এছাড়াও National Commission for Minorities Act, 1992 এর অধীনে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন (National Commission for Minorities) ১৯৯২ সালে গঠিত হয়, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের ওপর সংঘটিত বৈষম্য বা নির্যাতনের ঘটনার তদন্ত ও সুপারিশ করার জন্য। ১৯৯২ সালের এই আইন অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে পাঁচটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যেমন মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং জরথুস্ত্রীয় (পার্সি) কে কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর ২৭শে জানুয়ারী ২০১৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, জৈনদেরও আরেকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি

[46] Basu, Durga Das, (2011), 'Introduction to the Constitution of India', Nagpur, LexisNexis, p.p. 119-125.

[47] Ibid. p.p. 281-282.

প্রদান করে,[48] এবং এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয় সংখ্যালঘু কেন্দ্রিক জেলা (Minority Concentrated Districts – MCDs) এবং সংখ্যালঘু কেন্দ্রিক এলাকা (Minority Concentrated Areas – MCAs) শনাক্ত করার জন্য। ১৯৮৭ সালে প্রথম যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়, তা ছিল অপেক্ষাকৃত সরল—একটি জেলার মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ বা তার বেশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী থাকলে, সেই জেলাকে MCD হিসেবে বিবেচনা করা হত। এটি ছিল কেবলমাত্র ধর্মীয় জনসংখ্যার অনুপাত ভিত্তিক একটি শ্রেণিবিন্যাস। কিন্তু ২০০১ সালের আদমশুমারির পর এই শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন আনা হয়। এই মানদণ্ডে শুধু জনসংখ্যা নয়, বরং সেই নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতাও বিবেচনায় নেওয়া হয়। MCD নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলার স্তরে মূল্যায়ন করা হয় একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা, যেখানে নারীদের সাক্ষরতার হার, শিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থান ও নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। আরও গভীরভাবে দেখা হয় জীবনযাপনের মৌলিক সুবিধাসমূহের প্রাপ্তি, যেমন—পাকা ঘর, নিরাপদ পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ ও স্বাস্থ্যকর শৌচাগার। এইভাবে, শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয় নয়, বরং একটি সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা ভিত্তি করে সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিগুলি তৈরি হয়। ২০০৭ সালে এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপে ৯০টি জেলা MCD হিসেবে নির্ধারিত হয়। যার মধ্যে ৫৩টি জেলা 'ক্যাটেগরি এ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে—যেগুলি ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চাৎপদতার নিরিখে সমাজ-অর্থনৈতিক সূচক এবং মৌলিক নাগরিক সুবিধা— দুই ক্ষেত্রেই জাতীয় গড়ের নিচে অবস্থান করছিল। অবশিষ্ট ৩৭টি জেলাকে 'ক্যাটেগরি বি' তে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ২০ টি এবং ১৭ টি জেলাকে আবার যথাক্রমে উপশ্রেণি B1 (শুধু সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকে পিছিয়ে) এবং B2 (শুধু মৌলিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধার সূচকে পিছিয়ে) হিসেবে ভাগ করা হয়েছে।[49] এই শ্রেণিবিন্যাস উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য কার্যকর এক পদ্ধতি হিসেবে কাজ করেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ এটি ভারতীয় সংখ্যালঘু নীতিতে একটি অবকাঠামোগত সমতা ও ন্যায়বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংখ্যাগত যুক্তির বাইরে গিয়ে প্রান্তিকতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

এক্ষেত্রে Multi-sectoral Development Programme (MsDP) বা প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম (PMJVK) হল একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী, যার উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু-প্রধান অঞ্চলে (Minority Concentration Areas) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং মৌলিক পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তোলা। ২০০৮ সাল থেকে এ ধরনের প্রকল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং এখন তা NITI Aayog-এর Action Agenda-র অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৮৭০টি সংখ্যালঘু-প্রধান ব্লক, ৩২১টি

[48] National Commission for Minorities. Ministry of Minority Affairs, Government of India. https://ncm.nic.in/homepage/homepage.php (accessed on 23.01.2022)

[49] Govt. of India, (Ministry of Minority Affairs), (2015), Annual Reports-2010-11, New Delhi, P.P. 19-20.

শহর, ১০৯টি জেলা সদর এবং বহু সংখ্যালঘু-প্রধান গ্রামসমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মোট সংখ্যা ১,৩০০ এবং তা ৩২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩০৮টি জেলায় বিস্তৃত।[50]

তবে সংবিধানের এই প্রতিশ্রুতি প্রায়শই বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিকাশ কে. চৌধুরী তাঁর 'The Idea of Religious Minorities and Social Cohesion in India's Constitution: Reflections on the Indian Experience' এই গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেও সামাজিক সংহতির নামে অনেক সময় সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক অভিন্নতায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। যেমন, 'জাতীয় সংহতি'র ধারণাটি অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সংস্কৃতির ছায়া বহন করে, যেখানে সংখ্যালঘুর নিজস্বতা 'বিভেদ' হিসেবে দেখা হয়। চৌধুরী বলেন, এই ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রকল্প সংখ্যালঘুদের আত্মপরিচয় রক্ষার অধিকারকে সীমিত করে এবং "সাংস্কৃতিক সহনশীলতা"কে একমুখী করে তোলে।[51]

সাচার কমিটির (২০০৬) রিপোর্টে দেখা যায়, মুসলিম সম্প্রদায় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হয়েও শিক্ষাক্ষেত্রে, সরকারি চাকরিতে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধায় অনেক পিছিয়ে। তাদের জীবনমান দলিতদের কাছাকাছি, এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে খুবই কম।[52] আবার বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভোট কৌশলের অংশ হয়ে উঠেছে যাকে 'symbolic inclusion' বা 'সাংকেতিক অন্তর্ভুক্তি' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যেখানে নীতিগত বদলের পরিবর্তে শুধু নির্বাচনী ফায়দা তোলাই মুখ্য থাকে।

মহম্মদ সঞ্জির আলম "মুসলিমদের শিক্ষাগত অবস্থান" (Educational Status of Muslims) সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো ভারতে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ হ্রাস পাওয়া একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে এই হ্রাস প্রবণতা কেবল বয়সগত নয়, সামাজিক গোষ্ঠীভিত্তিকও, যেখানে মুসলিম পরিবারের সন্তানরা অন্য সমাজিক-ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় বেশি হারে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। ১৪–১৭ বছর বয়সী মুসলিম তরুণদের (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) শিক্ষাগত অংশগ্রহণ হার (EPR) জাতীয় গড়ের চেয়ে ১৩ শতাংশ কম, যা অন্যান্য সামাজিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর (SRGs) মধ্যেও সর্বনিম্ন। ১৮–২৫ বছর বয়সী গোষ্ঠীর (যা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তর কে নির্দেশ করে)

---

[50] Alam, Mohd. Sanjeer (2025), 'Educational Status of Muslims', in Hilal Ahmed et al. Rethinking Affirmative Action for Muslims in India, Hyderabad, Centre For Development Policy and Practice (CDPP), P.51

[51] Choudhary, Vikash K. (21 October 2021), The Idea of Religious Minorities and Social Cohesion in India's Constitution: Reflections on the Indian Experience, MDPI, p.p. 14-15 https://www.mdpi.com/2077-1444/12/11/910 (accessed on 05.07.2023)

[52] Sachar Committee Report (2006), Social Economic and Educational Status of Muslim Community in India

ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা বিদ্যমান। মুসলিমরা এখনও সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী হিসেবে রয়ে গেছে, যা দেখায় যে উচ্চতর শিক্ষা স্তরে প্রবেশাধিকার বাড়লেও, সমাজের ভেতরে শিক্ষা-অংশগ্রহণের সামাজিক কাঠামো একই রকম থেকে গেছে। এই পরিস্থিতি ২০০৬ সালের 'সাচার কমিটি রিপোর্ট' (SCR)-এ যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, আজও তার খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে এ ব্যাপারে। বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে (elementary level) যদিও সামাজিক-ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর (SRGs), যেমন মুসলিমদের মধ্যেও ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাগত অংশগ্রহণে লিঙ্গবৈষম্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষা স্তরে সেই বৈষম্য আবার প্রবলভাবে দেখা দেয়। এমনকি মুসলিম মেয়েরা উচ্চবিত্ত হিন্দু গোষ্ঠীর মেয়েদের (HFCs) তুলনায় অনেক বেশি পিছিয়ে থাকে, এবং এই ফারাকটি এমনকি অন্যান্য প্রান্তিক SRGs (যেমন দলিত বা আদিবাসী) গোষ্ঠীর মেয়েদের সঙ্গে তুলনাতেও বেশি।

ভৌগোলিক বৈষম্য মুসলিমদের জন্য আরও গভীরতর রূপে দেখা যায়। বয়সভিত্তিক দুটি গোষ্ঠী—১৪–১৭ বছর এবং ১৮–২৫ বছর—উভয় ক্ষেত্রেই গ্রামীণ ও নগর দুই অঞ্চলেই মুসলিম শিশুদের শিক্ষাগত অংশগ্রহণ হার (EPR) অন্যান্য সামাজিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর (SRGs) মধ্যে সর্বনিম্ন। অর্থাৎ, মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কেবল গ্রামীণ অবস্থান নয়, বরং সামগ্রিকভাবে একটি কাঠামোগত বঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠছে, যা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার বাইরেও প্রসারিত। এছাড়াও বিভিন্ন পেশাভিত্তিক, প্রযুক্তিগত ও ম্যানেজমেন্ট (PTM) কোর্সে অংশগ্রহণে অন্য সব গোষ্ঠীর চেয়ে মুসলিমরা পিছিয়ে।[53]

মহম্মদ সঞ্জির আলম আরও দেখিয়েছেন যে, শিক্ষাগত ক্ষেত্র ছাড়াও আর্থ-সামাজিক দিক থেকেও মুসলিমদের অবস্থা এখনও শোচনীয়। ভোগ এবং সম্পত্তি মালিকানার দিক থেকে দলিতদের (SCs/STs) তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থানে থাকলেও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের (HFCs) তুলনায় মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে। মুসলিমদের মধ্যে নিয়মিত বেতনভুক্ত কর্মীর সংখ্যা দলিত ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর (HOBCs) সাথে তুলনীয় হলেও HFCs-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।[54]

---

[53] Alam, Mohd. Sanjeer (February 2025), Educational Status of Muslims, in Hilal Ahmed and others, Rethinking Affirmative Action for Muslims in India, Centre For Development Policy and Practice (CDPP), Hyderabad. P.P. 59-82 https://www.researchgate.net/publication/389262038_Rethinking_Affirmative_Action_for_Muslims_in_India (accessed on 02.03.2025)

[54] তদেব, পৃ.পৃ. ৮৩-১০০।

এই বিপুল জনগোষ্ঠী যদি স্থায়ী দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বুভুক্ষার মধ্যে বসবাস করেন তাহলে যে এক বিরাট মানব-সম্পদের শুধু অপচয় ঘটেছে তাই নয়, একই সঙ্গে এই বিশাল জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে 'আলাদা' বলে ভাববার একটা বাস্তব ভিত্তি থেকে যাচ্ছে। এতে জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বাধা তৈরি হচ্ছে। এবং অপরদিকে অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যেও মুসলমানদের সম্পর্কের নানা রকম বিদ্বেষ মূলক ধারণা গড়ে উঠছে।

বাস্তবিকভাবে এ-কথা সত্য যে সমাজগতভাবে মুসলিম সংখ্যালঘুরা তাদের সমাজের আইন, চালচলন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যার ফলে ধর্মগত ও সংস্কৃতিগতভাবে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্নতা অনেকাংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে তাদের পৃথক করে দেয়। ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করলেও তাঁরা মূল স্রোতে একেবারে মিশে যেতে পারে না। যার পিছনে অনেক কারণ আছে, বিশ্বের যেকোনো দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর একই সমস্যা যথা-

প্রথমত, অস্তিত্বরক্ষার সংকটের প্রশ্নে সমাজে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের একধরণের হীনমন্যতা থাকে, যা তাঁদের ভিতরে বাইরে কুরে কুরে খায়।

দ্বিতীয়ত, দেশাত্মবোধের প্রশ্নে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রমাণ দিতে হয় বারবার।

তৃতীয়ত, সমাজে সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমতার প্রশ্নে এক আবশ্যিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এই অসমতা মানসিক দিক দিয়ে হতাশাগ্রস্থ এবং বিভ্রান্ত করে তোলে। এছাড়া সমাজে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যাগুরুদের চিরকাল ঔদাসীন্য তাঁদের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে দিয়েছে।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কেন্দ্র সরকার যে নীতি নিধারণী ও বাস্তবায়নমূলক কাঠামো গ্রহণ করেছে, তা একদিকে যেমন তাদের আর্থসামাজিক বঞ্চনার স্বীকৃতি দেয়, অন্যদিকে তেমনি এই বঞ্চনা মোচনে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার প্রতিফলন ঘটায়। তবে, এই জাতীয় কাঠামোর সফলতা, প্রভাব এবং বাস্তব প্রতিফলন অঞ্চলভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থান কেন্দ্রীয় নীতির আলোকে ভিন্নতর কিছু দিক তুলে ধরে, যা একটি নির্দিষ্ট রাজ্যিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গেও যুক্ত। অতএব, ভারতের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবনের পর এখন জরুরি হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক অবস্থান এবং তাদের ওপর প্রভাবিত নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ধরণ বিশ্লেষণ করা। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই দিকটিতেই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি

ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবে বিদ্যমান। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ নানা রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। এই অঞ্চলে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানরা মূলত কৃষি, হস্তশিল্প, ব্যবসা ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকে ধীরে ধীরে শিক্ষা ও আধুনিক চাকরির সুযোগ থেকে মুসলমানরা অনেকাংশে বঞ্চিত হতে শুরু করে, যার ফলে তারা ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও, সামগ্রিকভাবে তারা এখনও ভারতের অন্যতম অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রয়ে গেছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পিছিয়ে থাকার বাস্তব চিত্র বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট (২০০৬) ও পরবর্তী গবেষণাগুলোতে উঠে এসেছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রে দলিত ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের চেয়েও বেশি সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ সম্প্রদায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে। যদিও এ সম্প্রদায়ের একটি অংশ বাণিজ্য, রাজনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে, তবে সামগ্রিকভাবে তারা এখনো সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশগুলোর মধ্যে অন্যতম।[1]

সরকার বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য নানা নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করলেও তা কতটা কার্যকর হয়েছে এবং মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রেখেছে, তা বিশ্লেষণ করা জরুরি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষণার এই সন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি, তাদের শিক্ষার সুযোগ, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান, এবং সংখ্যালঘু উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি ও তার প্রভাবসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নিয়েছি। মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সীমান্তবর্তী জেলা, যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এই ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব, এবং একইসাথে জেলার পশ্চাদপদ অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সূচকসমূহ, মুর্শিদাবাদকে একটি প্রাসঙ্গিক ও গভীরভাবে বিশ্লেষণযোগ্য কেস স্টাডি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। তদুপরি, এই জেলায় সমাজ-অর্থনৈতিক বৈষম্য, কর্মসংস্থান সংকট, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সীমাবদ্ধতা, এবং

[1] Sachar Committee Report, (November, 2006), Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India, Govt. Of India

প্রশাসনিক সেবা প্রাপ্তির জটিলতা—সব মিলিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনমান বিশ্লেষণ করার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে। গবেষণার কাজটিকে আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভা ও তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, এই দুটি এলাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। ধুলিয়ান পৌর এলাকা একটি আধা-শহুরে প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করে, যেখানে নাগরিক পরিকাঠামো ও সেবার প্রাপ্তি তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং বঞ্চনার চিহ্ন এখনও প্রকটভাবে বিরাজমান। অপরদিকে, তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত একটি গ্রামীণ এলাকা, যেখানে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি এবং কর্মসংস্থানের অভাব ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। এই দুই অঞ্চল—একটি পৌর ও অপরটি পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধি হিসেবে—নগর ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনমান, সুযোগ-সুবিধা, এবং বঞ্চনার তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে একই জেলার ভেতরে দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়, যা গবেষণাটিকে আরও বিস্তৃত ও গভীরতর করে তোলে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর একটি বিশেষ পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেননা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি গভীর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর দুই অঞ্চল আলাদা হলেও জনগোষ্ঠীগুলোর ধর্মীয় পরিচয় এবং অভিজ্ঞতার মাঝে বহু মিল রয়ে গেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চাপ যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যালঘুদের অভিজ্ঞতা সেই প্রসঙ্গের তুলনায় বিচার করলে বোঝা যায়—এই দুই অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুরণন রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ নিয়ে এসে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস

পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় রাজ্যের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে। এই পশ্চিমবঙ্গ হল পূর্ব ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য, অবস্থানগত দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের অনগ্রসরতার দিকগুলি আলোচনা করার পূর্বে তাঁদের সংখ্যাগত বিন্যাসটা পর্যালোচনা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে ৪৪.৫ লাখ উদ্বাস্তু পূর্বতন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। এই চলে আসা উদ্বাস্তুদের পুরোটাই হিন্দু উদ্বাস্তু ছিল এমন নয়, উন্নত জীবিকার খোঁজে বহু মুসলিমও এ রাজ্যে পাড়ি জমায়। ১৯৭১ এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে ওপার বাংলা ছেড়ে এপার বাংলার মুসলিম

জনগণের চলে আসার হারটা বাড়তে থাকে। ১৯৭১-২০১১ সালের সেনসাস-এর তুলনামূলক ধর্মীয় জনসংখ্যাগত বিন্যাস্টা দেখলে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। (নিচের সারণি ৩.১- তে তুলে ধরা হলো)

সারণিঃ ৩.১. ১৯৭১-২০১১-এর সেন্সাস-এর বিচারে পশ্চিমবঙ্গের তুলনামূলক ধর্মীয় জনসংখ্যার বিন্যাস নিট বৃদ্ধি (শতাংশে)

সাল	মোট জনসংখ্যা	হিন্দুধর্ম	ইসলামধর্ম	খ্রিস্টানধর্ম	বৌদ্ধধর্ম	শিখধর্ম	জৈনধর্ম	অন্যান্যধর্ম
১৯৭১	৪,৪৩,১২,০১১	৩,৪৬,১১,৮৬৪ (৭৮.১১)	৯০,৬৪,৩৩৮ (২০.৪৫)	২,৫১,৭৮২ (০.৫৭)	১,২১,৫০৪ (০.২৭)	৩৫,০৮৪ (০.০৮)	৩২,২০৩ (০.০৭)	১,৯৪,১২৬ (০.৪৪)
১৯৮১	৫,৪৫,৮০,৬৪৭	৪,২০,০৭,১৫৯ (৭৬.৯৬)	১,১৭,৪৩,২৫৯ (২১.৫১)	৩,১৯,৬৭০ (০.৫৮)	১,৫৬,২৯৬ (০.২৮)	৪৯,০৫৪ (০.০৮)	৩৮,৬৬৩ (০.০৭)	২,৬৩,৪১৪ (০.৪৮)
১৯৯১	৬,৮০,৭৭,৯৬৫	৫,০৮,৬৬,৬২৪ (৭৪.৬৯)	১,৬০,৭৫,৮৩৬ (২৩.৫৭)	৩,৮৩,৪৭৭৯ (০.৫৬)	২,০৩,৫৭৮ (০.৩০)	৫৫,৩৯২ (০.০৮)	৩৪,৩৫৫ (০.০৫)	৪,৫২,৪০৩ (০.৬৬)
২০০১	৮,০১,৭৬,১৯৭	৫,৮১,০৪,৮৩৫ (৭২.৪৭)	২,০২,৪০,৫৪৩ (২৫.২৫)	৫,১৫,১৫০ (০.৬৪)	২,৪৩,৩৬৪ (০.৩০)	৬৬,৩৯১ (০.০৮)	৫৫,২২৩ (০.০৭)	৮,৯৫,৭৯৬ (১.১২)
২০১১	৯,১২,৭৬,১১৫	৬,৪৩,৮৫,৫৪৬ (৭০.৫৪)	২,৪৬,৫৪,৮২৫ (২৭.০১)	৬,৫৮,৬১৮ (০.৭২)	২,৮২,৮৯৮ (০.৩১)	৬৩,৫২৩ (০.০৭)	৬০,১৪১ (০.০৭)	৯,৪২,২৯৭ (১.০৩)

(তথ্যসূত্রঃ ১৯৭১-২০১১ সালে ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে সব তথ্য নেওয়া হয়েছে)

২০১১ সালের সেনসাস অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা হল ২,৪৬,৫৪,৮২৫ যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৭.০১ শতাংশ, এবং দেশের যে ২৫টি জেলার মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ ১০ লক্ষেরও বেশি, তার মধ্যে সবার আগে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা (৪৭ লক্ষ) এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা (২৯ লক্ষ)। এর পরে রয়েছে কেরলের মালাপ্পুরম জেলা (২৮ লক্ষ)। ১০ লক্ষেরও বেশি মুসলিম জনসংখ্যা সম্পন্ন ২৫ টি জেলার মধ্যে ৯টি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা জেলার মোট জনসংখ্যার ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে এবং ৮টি জেলার মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ শতাংশের বেশি এবং ৫০ শতাংশ কম।[2] পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যাগত বিন্যাস নিচের সারণি ৩.২ তে তুলে ধরা হলো।

[2] Govt. of India, (Ministry of Home Affairs), Census of India -2011, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.

সারণিঃ ৩.২. ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	মোট জনসংখ্যা	মুসলিম জনসংখ্যা	শতকরা হার
১	মুর্শিদাবাদ	৭১,০৩,৮০৭	৪৭,০৭,৫৭৩	৬৬.৮৮
২	দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা	৮১,৬১,৯৬১	২৯,০৩,০৭৫	৩৫.৫৭
৩	উত্তর চব্বিশ পরগণা	১,০০,০৯,৭৮১	২৫,৮৪,৬৮৪	২৫.৮২
৪	মালদাহ	৩৯,৮৮,৮৪৫	২০,৪৫,১৫১	৫১.২৭
৫	বর্ধমান	৭৭,১৭,৫৬৩	১৫,৯৯,৭৬৪	২০.৭৩
৬	উত্তর দিনাজপুর	৩০,০৭,১৩৪	১৫,০১,১৭০	৪৯.৯২
৭	নদিয়া	৫১,৬৭,৬০০	১৩,৮২,৬৮২	২৬.৭৬
৮	বীরভূম	৩৫,০২,৪০৪	১২,৯৮,০৫৪	৩৭.০৬
৯	হাওড়া	৪৮,৫০,০২৯	১২,৭০,৬৪১	২৬.২০
১০	কলকাতা	৪৪,৯৬,৬৯৪	৯,২৬,৪১৪	২০.৬০
১১	হুগলী	৫৫,১৯,১৪৫	৮,৭০,২০৪	১৫.৭৭
১২	পূর্ব মেদিনীপুর	৫০,৯৫,৮৭৫	৭,৪৩,৪৩৬	১৪.৫৯
১৩	কোচবিহার	২৮,১৯,০৮৬	৭,২০,০৩৩	২৫.৫৪
১৪	পশ্চিম মেদিনীপুর	৫৯,১৩,৪৫৭	৬,২০,৫৫৪	১০.৪৯
১৫	জলপাইগুড়ি	৩৮,৭২,৮৪৬	৪,৪৫,৮১৭	১১.৫১
১৬	দক্ষিণ দিনাজপুর	১৬,৭৬,২৭৬	৪,১২,৭৮৮	২৪.৬৩
১৭	বাঁকুড়া	৩৫,৯৬,৬৭৪	২,৯০,৪৫০	৮.০৮
১৮	পুরুলিয়া	২৯,৩০,১১৫	২,২৭,২৪৯	৭.৭৬
১৯	দার্জিলিং	১৮,৪৬,৮২৩	১,০৫,০৮৬	৫.৬৯
	পশ্চিমবঙ্গ	৯,১২,৭৬,১১৫	২,৪৬,৫৪,৮২৫	২৭.০১

(তথ্যসূত্রঃ ২০১১ সালে ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে সব তথ্য নেওয়া হয়েছে)

উপরের সারণি ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুর্শিদাবাদে মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার ৬৬.৮৮ শতাংশ এবং মালদায় ৫১.২৭ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য যে সব জেলায় মুসলিমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস করে তার মধ্যে রয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, হাওড়া, বীরভূম, বর্ধমান, কোচবিহার, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলি।

বস্তুতপক্ষে, সাচার কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Minority Affairs) মুসলিম সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সংখ্যালঘু কেন্দ্রীভূত জেলা (MCD) প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে ৯০টি জেলা চিহ্নিত করা হয়, যেখানে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ২০% বা তার বেশি এবং পিছিয়ে থাকার নির্দিষ্ট মানদণ্ডে জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। পিছিয়ে থাকা জেলা নির্ধারণের জন্য দুটি প্রধান সূচক ব্যবহার করা হয়েছিল: (i) ধর্মভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক যথা- সামগ্রিক সাক্ষরতার হার, নারী সাক্ষরতার হার, কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের হার, নারী কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের হার, এবং (ii) মৌলিক নাগরিক সুবিধা সূচক যথা- পাকা ঘরবিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংযোগ, শৌচাগার সুবিধা (ওয়াটার ক্লোজেট)

যেসব জেলায় সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ২০% বা তার বেশি এবং উপরের সূচকের কোনো একটি বা উভয়টি জাতীয় গড়ের চেয়ে কম ছিল, সেগুলিকে MCD প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলা MCD প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয় – কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা।[3]

সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সার্বিক উপস্থিতি তাতে এই ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে উন্নয়ন কখনওই সম্ভব নয়। রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের এই পিছিয়ে পড়ার কারণ নিয়ে লেখালেখি চলছে প্রতিনিয়ত। বিশেষত বাম রাজত্বকালে মুসলমানরা লক্ষণীয় মাত্রায় পিছিয়ে পড়েছে এমন অভিযোগ ক্রমশ তীব্র এবং তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল। সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে মুসলিমরা আজ চরম আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত বঞ্চনা আর প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে সমান সুযোগ অস্বীকৃত হওয়ার শিকার এবং তারা দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সার্বিক পশ্চাৎপদতার পাঁকের মধ্যে ডুবে রয়েছে। সমগ্র শাসন ও উন্নয়নের ব্যবস্থাটাই যতখানি গরিব দলিত ও গরিব আদিবাসীদের বঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে এবং স্বাধীনতার প্রায় ৭৫ বছর পরেও তাদের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছে, ঠিক ততখানি সংখ্যালঘুদেরও বিশেষ করে মুসলিমদেরও বঞ্চিত করে রেখেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবস্থানঃ

সমাজের যে কোন অংশের ক্ষমতা অর্জনের জন্য শিক্ষা সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকর হাতিয়ার বলে সর্বজন স্বীকৃত। যদিও এটা সত্য যে অর্থনৈতিক সুস্থতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রকৃতি ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের জন্য মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান সুনিশ্চিত করে, যা আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবর্তন সাধারণত

[3] Das, Pranab Kumar and Sugata Marjit (November 12, 2016), 'Socio-economic Status of Muslims in West Bengal: Reflections on a Recent Report', Economic and Political Weekly, Mumbai, P. 20

ভালো শিক্ষার স্বাভাবিক ফলাফল। শিক্ষার অগ্রগতি শুধুমাত্র দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়ের সুযোগ উন্নত করে না, বরং এটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বাড়ায়, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। বিশেষত, শিক্ষা অধিকতর সচেতন নাগরিক তৈরি করে, যারা উন্নত জীবনধারার পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসারেও ভূমিকা রাখতে পারে।

ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর সংবিধান গ্রহণের সময় রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির (Directive Principles of State Policy) অধীনে ৪৫ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক প্রসার নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়। অনুচ্ছেদ ৪৫-এ বলা হয়: "রাষ্ট্র সংবিধানের কার্যকর হওয়ার ১০ বছরের মধ্যে সকল শিশুর জন্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।" তবে এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিলম্ব হয়। ১৯৯৩ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে ঘোষণা করে যে, শিক্ষা পাওয়া জীবনের অধিকার (Right to Life)-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ থেকে উৎসারিত। এই রায়ের ফলে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়ার পথ সুগম হয়। ২০০২ সালে সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে শিক্ষা মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পায়। এটি সংবিধানের "জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার" (Right to Life and Personal Liberty) অনুচ্ছেদ ২১-এর সম্প্রসারণ হিসেবে সংযোজিত হয়। নতুন সংযোজিত অনুচ্ছেদ ২১-A অনুযায়ী: "রাষ্ট্র ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে, যেভাবে আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে"।[4]

শিক্ষাকে কেবলমাত্র সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দিলেই হবে না, প্রায়োগিক স্তরে তার কতটা সুপ্রভাব পড়ছে তা অত্যন্ত বিচার্য বিষয়। একইসাথে শিক্ষার পরিমাণগত দিকের পাশাপাশি তার গুণগত দিকটিও প্রণিধানযোগ্য। কেননা, অনেকসময় তথাকথিত 'সাক্ষর' ব্যক্তি বাস্তব জীবনে তাঁদের পড়া ও লেখার দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন না। এমনকি স্কুল ছাড়ার ৪-৫ বছরের মধ্যে তাঁদের একটি বড় অংশ সাক্ষরতা হারিয়ে ফেলেন। তাই জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (National Literacy Mission - NLM) সাক্ষরতার সংজ্ঞাকে শুধুমাত্র পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, দৈনন্দিন জীবনে এই দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেয়। সাচার কমিটি তার রিপোর্টে শিক্ষাগতমান অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায় ও অন্যান্য সামাজিক-ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (SRCs) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে নিচের সূচকগুলো ব্যবহার করেছেন:[5]

সাক্ষরতার হার (Literacy Rate): সাক্ষরতা শিক্ষাগত অগ্রগতির অন্যতম সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত সূচক। যদিও এটি শিক্ষার প্রকৃত মান নির্ধারণে সীমিত, তবে সাধারণভাবে ৭ বছর বা তার বেশি বয়সের যেসব ব্যক্তি পড়তে ও লিখতে পারেন, তাঁদের সাক্ষর গণ্য করা হয়।

---

[4] বসু, দুর্গা দাস, (২০১৫), 'ভারতের সংবিধান পরিচয়', লেক্সিস নেক্সিস, হরিয়ানা, ইন্ডিয়া, পৃ.পৃ. ১৩৭, ১৮৮

[5] Sachar Committee Report (November, 2006), Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India, Govt. of India, P. 51

নির্দিষ্ট শিক্ষাগত স্তর সম্পন্ন করা জনসংখ্যার অনুপাত: উচ্চশিক্ষা (Graduation) সম্পন্ন জনসংখ্যার অনুপাত শিক্ষাগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। মাধ্যমিক স্তর (Matriculation) সম্পন্ন করা শিক্ষার মধ্যবর্তী স্তরের মানদণ্ড নির্দেশ করে। প্রাথমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে জনসংখ্যার নির্দিষ্ট বয়সের অনুপাতে হিসাব করা হয়।

গড় স্কুলে অধ্যয়নকাল (Mean Years of Schooling): ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের গড় শিক্ষাগত অর্জনের পরিমাণ হিসাব করা হয়, যা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি একজন ব্যক্তির স্কুলে পড়াশোনার মোট গড় বছর নির্দেশ করে।

ভর্তির হার (Enrolment Rates): এই হার দ্বারা বোঝানো হয়, নির্দিষ্ট বয়সসীমায় থাকা কত শতাংশ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং সক্রিয়ভাবে ক্লাস করছে। এটি শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

সাধারণত ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানরা শিক্ষাগত অর্জনে অনেক পিছিয়ে থাকে, যা তাদের প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চ শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া এমনকি স্কুল শিক্ষা শেষ করার সম্ভাবনা হিন্দুদের তুলনায় আরও কম। এ বিষয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য ২০০৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের আদেশে বিচারপতি রাজিন্দর সাচারের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়, যা সাচার কমিটি নামে বহুল পরিচিত। ২০০৬ সালে সাচার কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই সাচার কমিটির প্রতিবেদনে ভারতে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে মুসলিম জনসংখ্যার একটি বিশাল সংখ্যক এখনও উপযুক্ত শিক্ষা এবং স্থিতিশীল কর্মসংস্থান ছাড়াই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। সাচার কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৪-০৫ সাল পর্যন্ত আইএএস-এ ৩%, আইএফএস-এ ১.৮% এবং আইপিএস-এ ৪% মুসলিম ছিল। ভারতীয় রেলওয়েতে ৪.৫% মুসলিম কর্মচারী ছিল এবং তাদের মধ্যে ৯৮.৭% নিম্ন পদে নিযুক্ত ছিল। স্বাস্থ্য ও পরিবহন খাতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ যথাক্রমে ৪.৪% এবং ৬.৫%। সাচার কমিটি আরও জানিয়েছে যে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের তুলনায় মুসলিম মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ অনেক কম।[6] ভারতের জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (২০২০) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেখানে বলেছে যে ৩-৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে, ২২% মুসলিম শিশু ও যুবক কখনও আনুষ্ঠানিক স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তি হয়নি। ২০১১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদনেও দেখা গেছে যে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি। মুসলমানদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার ৩১.৩% যা জাতীয় মানের নিচে। অন্যদিকে, মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার যথাক্রমে ৪৭.৫% এবং ১৪.১%। ইকোনমিক্স টাইমস অ্যানালিস্ট গ্রুপ (২০১৫) জানিয়েছে যে কর্পোরেট খাতে সিনিয়র

[6] Sachar Committee Report (2006), Social Economic and Educational Status of Muslim Community in India, Govt. of India, P. 52.

এক্সিকিউটিভ এবং পরিচালকদের মধ্যে প্রায় ৩% মুসলিমের উপস্থিতি রয়েছে।[7] এই তথ্যগুলি মুসলিমদের পশ্চাদপদতার স্পষ্ট সূচক হিসেবে তুলে ধরা যায়।

সারণিঃ ৩.৩. স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার শতাংশে (১৯৫১-২০১১)

সাল	সাক্ষরতার হার	পুরুষ	নারী
১৯৫১	২৪.০০	৩৪.১০	১২.৩০
১৯৮১	৪৮.৬৪	৫৯.৯৩	৩০.০৭
১৯৯১	৫৭.৭২	৬৭.২৪	৪৭.১৫
১৯৯৭	৭২.০০	৮১.০০	৬৩.০০
২০০১	৬৯.২২	৬০.২২	৭৭.৫৮
২০১১	৬৮.৭	৭২.৫	৬৪.৮

(তথ্যসূত্রঃ Report of the Madrasah Education Committee, Government of West Bengal, 2002, Part-II, p.17)

সারণি ৩.৩ – তে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে, যা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়ন, নীতি পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনস্বরূপ। ১৯৫১ সালে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ২৪%, যেখানে পুরুষদের মধ্যে এই হার ছিল ৩৪.১০% এবং নারীদের মধ্যে ১২.৩০%। এটি তখনকার ভারতীয় গড় সাক্ষরতার হারের তুলনায় অনেকটাই কম ছিল, যা মুসলিম সমাজের শিক্ষা-সংক্রান্ত পশ্চাদপদতার ইঙ্গিত দেয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়টিতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়লেও মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকাংশই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল, যার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং শিক্ষা সম্পর্কে অনীহা।

১৯৮১ সালে সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮.৬৪%, যা ১৯৫১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি ৫৯.৯৩% এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৩০.০৭% হয়। এই সময়ে সরকারি শিক্ষানীতি কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার হার তুলনামূলক কম ছিল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক বাস্তবতাও নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং সরকারি উদ্যোগের ফলে পুরুষদের সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে, যদিও মূলধারার শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ তখনও সীমিত ছিল।

[7] Economics Times Analysis Group, (2015)

১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার আরও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫৭.৭২% এবং ৭২% হয়। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু নীতির ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং সরকার-প্রদত্ত সুবিধা, যেমন স্কলারশিপ ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার, এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৮১% স্পর্শ করে, যেখানে নারীদের সাক্ষরতার হার ৬৩% হয়। এই সময়েই প্রথমবারের মতো মুসলিম নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত মুসলিম নারীর সংখ্যা বাড়তে থাকলেও তুলনামূলকভাবে এটি এখনও সাধারণ গড়ের চেয়ে কম ছিল

২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৬৯.২২% ছিল, যেখানে নারীদের সাক্ষরতার হার (৭৭.৫৮%) পুরুষদের (৬০.২২%) তুলনায় অনেক বেশি। এটি একটি ব্যতিক্রমী প্রবণতা, কারণ সাধারণত পুরুষদের সাক্ষরতার হার নারীদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সাক্ষরতার হার সামান্য কমে ৬৮.৭% হয়। তবে এই সময় নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৭২.৫% হলেও নারীদের ক্ষেত্রে এটি বেড়ে ৬৪.৮% হয়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং সংখ্যালঘু নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রকল্পের চালু হওয়া। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার কিছুটা বাড়তে থাকে। তবে একইসঙ্গে পুরুষদের শিক্ষায় প্রবণতা কমার লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়, কারণ মুসলিম যুবকদের মধ্যে জীবিকার তাগিদে উচ্চশিক্ষা পরিত্যাগের হার বেড়ে যায়।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সাক্ষরতার হার ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেলেও বিভিন্ন সময়ে এটি নিম্নগামী হয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ধারাবাহিক অগ্রগতি থাকলেও ২০০১ থেকে ২০১১ সালে সামান্য পতন লক্ষ্য করা যায়। নারীদের শিক্ষার হার ক্রমাগত উন্নতি লাভ করলেও পুরুষদের শিক্ষার হার কখনো কখনো স্থিতিশীল থেকেছে বা কমেছে। যদিও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার হার বেড়েছে, তবে পশ্চিমবঙ্গের গড় সাক্ষরতার হারের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায় এখনও পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে সাচার কমিটি তার রিপোর্টে কতকগুলো বিষয় তুলে ধরেছে, যেমন - নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও গভীর সামাজিক অবিশ্বাস ইত্যাদি। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে ছেলেদের দ্রুত কর্মসংস্থানে পাঠানোর প্রবণতা এবং মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক অনুশাসন, বাল্যবিবাহ বা পারিবারিক দায়িত্বে যুক্ত করার চর্চা শিক্ষার হার কমার একটি অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

ফলস্বরূপ, মুসলিম যুবসমাজ আত্মপরিচয় সংকট, অনিশ্চয়তা এবং প্রান্তিকতার শিকার হচ্ছে।[৪] শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আরও কার্যকর নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ এই পশ্চাদপদতার দিক থেকে মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। মুক্তি বলতে এখানে নিরক্ষরতা, চরম দারিদ্র্য, অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মের মৌল বিধিনিষেধের থেকে মুক্তি। পশ্চিমবঙ্গের ৩০ অধিক সংখ্যালঘু মুসলমান জনসংখ্যার পাঁচটি জেলায় মুর্শিদাবাদ (৬৬.৮৮ শতাংশ), মালদা (৫১.২৭ শতাংশ), উত্তর দিনাজপুর (৪৯.৯২ শতাংশ), বীরভূম (৩৭.০৬ শতাংশ), দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা (৩৫.৫৭ শতাংশ) মুসলমানদের আনুপাতিক সাক্ষরতার হার সারণি ৩.৪.-তে তুলে ধরা হল

সারণিঃ ৩.৪. পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশের অধিক মুসলমান জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলার সাক্ষরতার হার (শতাংশে)

জেলা	সাধারণ			মুসলমান		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
মুর্শিদাবাদ	৬৬.৬	৬৯.৯	৬৩.১	৬৩.২	৬৫.৬	৬০.৭
মালদা	৬১.৭	৬৬.২	৫৭	৫৮.৮	৬১.১	৫৬.৪
উত্তর দিনাজপুর	৫৯.১	৬৫.৫	৫২.২	৫১.২	৫৬.৮	৪৫.৪
বীরভূম	৭০.৭	৭৬.৯	৬৪.১	৭০.৩	৭৪.৯	৬৫.৫
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	৭৭.৫	৮৩.৩	৭১.৪	৭১.৪	৭০.৯	৬৬.১
পশ্চিমবঙ্গ	৭৬.৩	৮১.৭	৭০.৫	৬৮.৭	৭২.৫	৬৪.৮

(তথ্যসূত্রঃ ২০১১ সালে ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে সব তথ্য নেওয়া হয়েছে)

শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী, মুসলমানদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬৮.৭ শতাংশ, যেখানে রাজ্যের গড় সাক্ষরতার হার ৭৬.৩ শতাংশ। এছাড়াও গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গে নারী-পুরুষের সাক্ষরতার ফারাক উল্লেখ করার মতো কমেছে। যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সাক্ষরতার ফারাকের জাতীয় হার হল ১৬.২ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের হার ১১.১ শতাংশ। ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে মুসলমানদের ক্ষেত্রে ওই হারটা দাঁড়িয়েছে ৭.৭ শতাংশে।[৯] পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম-অধ্যুষিত জেলাগুলোর সাক্ষরতার হার বিশ্লেষণ করলে আরও স্পষ্ট হয় যে, সাধারণ

[৪] Sachar Committee Report (November, 2006), Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India, Govt. of India, P.P. 15-20

[৯] Govt. of India, (Ministry of Home Affairs), (2011), Census of India-2011, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.

জনগোষ্ঠীর তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম নারীদের সাক্ষরতার হার অনেকটাই কম, যা শিক্ষায় লিঙ্গবৈষম্যের ইঙ্গিত দেয়। উত্তর দিনাজপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলোতে মুসলিমদের সাক্ষরতার হার রাজ্যের গড় হারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যেখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও বীরভূম তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তবে, সব ক্ষেত্রেই নারীদের শিক্ষার হার পুরুষদের তুলনায় কম, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধার প্রতিফলন।

এছাড়া অ্যাসোসিয়েশন স্ন্যাপ এবং গাইডেন্স গিল্ড, প্রতীচী ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুসলমানদের মধ্যে স্নাতক ছিলেন মাত্র ২.৭ শতাংশ। যে কোনও সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চশিক্ষা সমীক্ষার ২০১৮-১৯ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ২০১৮-১৯ সালে রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মোট মুসলমান শিক্ষকের অনুপাত মাত্র ৬.৯ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১২-১৩ সালে এই অনুপাত ছিল আরও কম, ৩.৯ শতাংশ।

এছাড়া ২০১৮-১৯ সালে রাজ্যের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, যেমন যাদবপুর, কলকাতা এবং প্রেসিডেন্সিতে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা যথাক্রমে ৮, ১৯ এবং ১৭। রাজ্যের কলেজগুলিতে ২০১৮-১৯ সালে শিক্ষকদের ৭.৮ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, ২০১২-১৩ সালে যা ছিল ৩.১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের ১৪ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের, কলেজের ক্ষেত্রে যা ১২.৫ শতাংশ। আবারও কিছু বিখ্যাত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা নগণ্য। মনে রাখতে হবে, রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে ২৭ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। অথচ, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম। যতটুকু প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে, তা ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া অংশ কে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য হয়েছে বলে মনে হয়। উপরের তথ্য প্রমাণ করছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের মানুষেরা পিছিয়ে রয়েছেন।[10]

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, মুর্শিদাবাদ মূলত একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা যেখানে ৬৬.৮৮% মানুষ মুসলিম। মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার প্রায় ৬৩.২%। মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৬৫.৬% এবং ৬০.৭%। ২০০১ সালের পূর্ববর্তী আদমশুমারি অনুসারে, মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল ৫৪% এবং ৪২%। আরেকটি বিষয় যোগ করা উচিত যে ভারতে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় মুসলিম মহিলাদের সাক্ষরতার হার সর্বনিম্ন।

বর্তমানে আমার গবেষণায় মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যালঘু মুসলমানদের শিক্ষাগত মান তুলে ধরার জন্য সংশিলষ্ট জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া

[10] চৌধুরী, শুভনীল (২০ জানুয়ারি, ২০২১), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থাঃ রাজ্যে সবেতেই পিছিয়ে মুসলমানরা, আনন্দবাজার অনলাইন, https://www.anandabazar.com/editorial/minorities-of-bengal-is-lagging-behind-in-education-health-and-employment/cid/1262183 (accessed on 24.08.2023)

গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া গ্রামকে ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত করে ওই অঞ্চলে মোট ৩৮৮ জনের কাছ থেকে মাঠ পর্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাক্ষরতার হার নিম্নে প্রদত্ত সারণি: ৩.৫ - এতে তুলে ধরা হলো-

সারণিঃ ৩.৫. মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া গ্রাম এর সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত মান (শতাংশে)

শিক্ষাগত স্তর	সেক্স	৬ নং ওয়ার্ড	৮ নং ওয়ার্ড	বাবুপুর পশ্চিমপাড়া	বাবুপুর মধ্যপাড়া
নিরক্ষর	পুঃ	২১.৫৩	২৩.২১	২৮.৮৫	৩০.৪৩
	মঃ	২৮.৮৯	৩০.৪৩	৩২.৫	৩৪.২১
প্রাথমিক	পুঃ	১৮.৪৭	১৬.০৭	২১.১৫	১৯.৫৬
	মঃ	২২.২২	১৯.৫৬	২২.৫	২৬.৩২
মাধ্যমিক	পুঃ	২৪.৬১	১৪.৩	১৯.২৩	২৬.১
	মঃ	২৪.৪৪	১৯.৫৬	১৭.৫	১৮.৪২
উচ্চমাধ্যমিক	পুঃ	২০.০০	২৩.২১	১৭.৩০	১৫.২২
	মঃ	১৫.৫৬	১৭.৩৯	১৭.৫	১৫.৭৯
স্নাতক	পুঃ	৭.৭০	১০.৭১	৭.৭০	৬.৫২
	মঃ	৬.৬৭	৮.৬৯	৭.৫০	৫.২৬
স্নাতকোত্তর	পুঃ	৩.০৭	৩.৫৭	৩.৮৫	২.১৭
	মঃ	২.২২	২.১৭	২.৫	০০
অন্যান্য	পুঃ	৪.৬১	৮.৯২	১.৯২	০০
	মঃ	০০	২.১৭	০০	০০
মোট সাক্ষর	পুঃ	৭৮.৪৭	৭৬.৭৯	৭১.১৫	৬৯.৫৭
	মঃ	৭১.১১	৬৯.৫৭	৬৭.৫	৬৫.৭৯
সার্বিক সাক্ষরতার হার	সাক্ষর	৭৪.৭৯	৭৩.১৮	৬৯.৩২	৬৭.৬৮
	নিরক্ষর	২৫.২১	২৬.৮২	৩০.৬৭	৩২.৩২

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ থেকে নেওয়া) **এখানে পুঃ ও মঃ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাকে নির্দেশ করা হয়েছে

চিত্র: ৩.১.

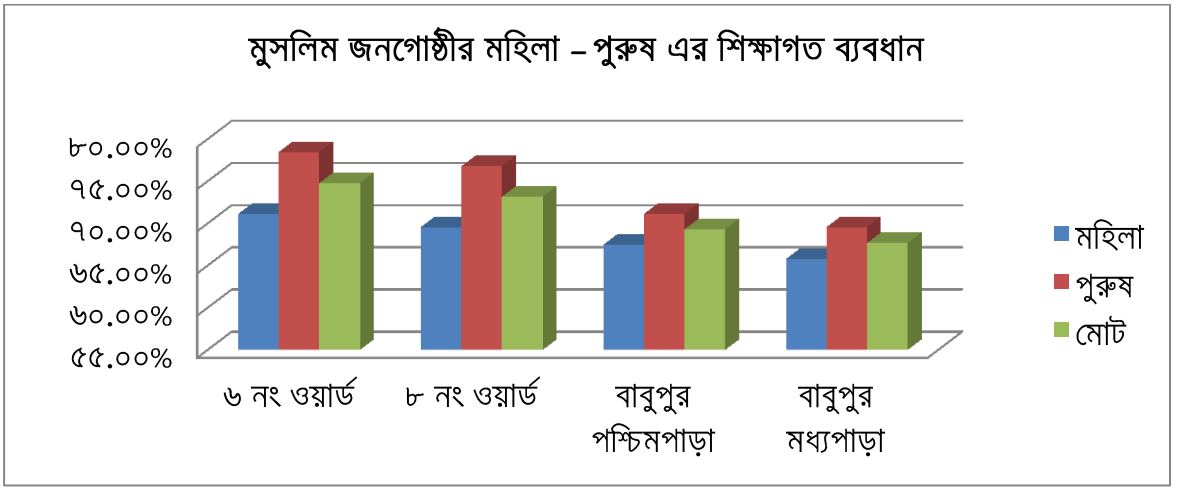

উৎসঃ সারণি ৩.৫–এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

চিত্রঃ ৩.২.

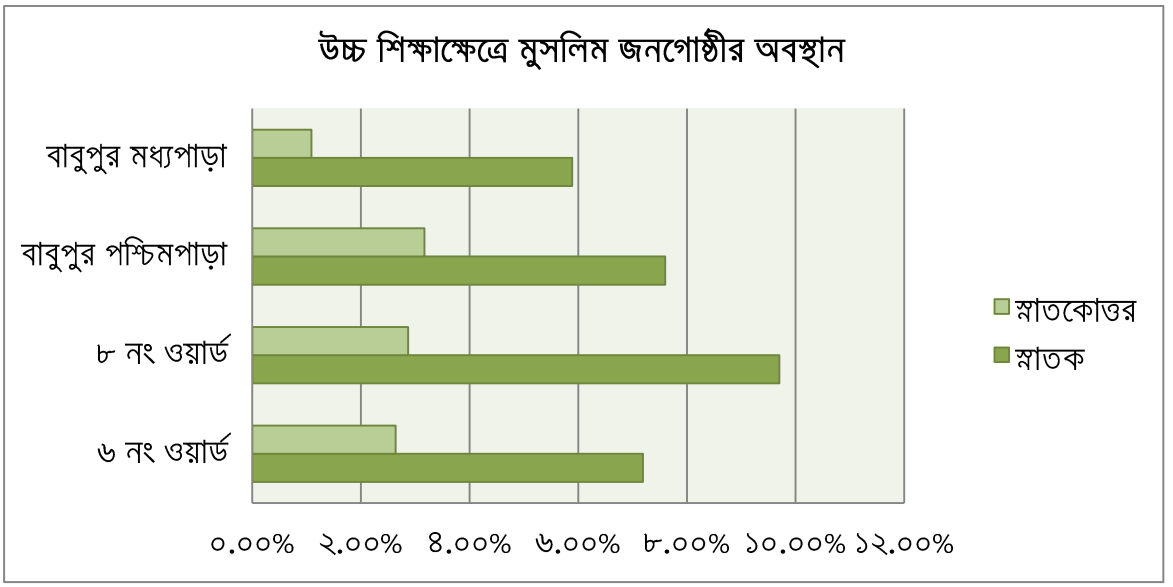

উৎসঃ সারণি ৩.৫–এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

উপরে প্রদত্ত সারণি: ৩.৫ - এতে প্রদত্ত মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নিরক্ষরতার হার শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে তুলেছে। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলে নিরক্ষরতার হার অনেক বেশি। ৬ নং ও ৮ নং ওয়ার্ডে নিরক্ষরতার হার যথাক্রমে ২৫.২১% ও ২৬.৮২%, যেখানে বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় এটি

৩০.৬৭% এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় ৩২.৩২%। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে শহরাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও গ্রামীণ এলাকায় এখনো নিরক্ষরতার হার বেশি।

লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রতিটি অঞ্চলেই মহিলাদের নিরক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় বেশি। ৬ নং ওয়ার্ডে পুরুষদের নিরক্ষরতার হার ২১.৫৩% যেখানে মহিলাদের ২৮.৮৯%। একই প্রবণতা অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও দেখা যায়। বাবুপুর মধ্যপাড়ায় এটি সর্বোচ্চ, যেখানে পুরুষদের নিরক্ষরতার হার ৩০.৪৩% এবং মহিলাদের ৩৪.২১%। এটি বোঝায় যে মহিলারা শিক্ষার সুযোগ থেকে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত এবং সমাজে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এখনো প্রকটভাবে বিরাজমান।

সাক্ষরতার দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামে সাক্ষরতার হার কম। ৬ নং ওয়ার্ডে সাক্ষরতার হার ৭৪.৭৯% যেখানে বাবুপুর মধ্যপাড়ায় এটি কমে ৬৭.৬৮%-এ নেমে এসেছে। উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। স্নাতক পর্যায়ে পৌঁছে পুরুষদের শিক্ষা হার শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছে। ৬ নং ওয়ার্ডে স্নাতক ডিগ্রিধারী পুরুষের হার ৭.৭০% যেখানে ৮ নং ওয়ার্ডে এটি ১০.৭১%। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় এটি ৭.৭০% এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় ৬.৫২%। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার আরও কম, বাবুপুর মধ্যপাড়ায় এটি মাত্র ৫.২৬%, যা বোঝায় যে উচ্চশিক্ষায় নারী অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও নারী শিক্ষার অবস্থা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৬ নং ওয়ার্ডে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষিত পুরুষদের হার ২০% এবং মহিলাদের হার ১৫.৫৬%। গ্রামীণ এলাকায় এটি আরও কমে এসেছে, বাবুপুর মধ্যপাড়ায় পুরুষদের হার ১৫.২২% এবং মহিলাদের ১৫.৭৯%। এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত করে যে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পার হওয়ার পরেই শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ কমতে থাকে। এটি মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের ফলাফল, যেখানে পরিবারগুলি মেয়েদের শিক্ষার পরিবর্তে গার্হস্থ্য কাজ, বিয়ে বা অর্থনৈতিক সুরক্ষার কথা বেশি ভাবছে।

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার হার আরও কম, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে। ৬ নং ওয়ার্ডে এটি মাত্র ৩.০৭% এবং ৮ নং ওয়ার্ডে ৩.৫৭%। গ্রামীণ অঞ্চলে এটি আরও কম, বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় পুরুষদের হার ৩.৮৫% হলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ২.৫%। বাবুপুর মধ্যপাড়ায় মহিলাদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর হার ০%, যা বোঝায় যে মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় প্রায় অনুপস্থিত।

এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কোর্স যেমন আইটি ডিপ্লোমা, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, নার্সিং, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। পুরুষ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৮ নং ওয়ার্ডে এই শিক্ষাগত স্তরে অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি, যেখানে ৮.৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কোর্স গ্রহণ করছে। অন্যদিকে, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪.৬১ শতাংশ পুরুষ শিক্ষার্থী এই স্তরে রয়েছে, যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায়

এই সংখ্যা আরও কম, মাত্র ১.৯২ শতাংশ, এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় একেবারে শূন্য। মহিলা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে চিত্র আরও উদ্বেগজনক। শুধুমাত্র ৮ নং ওয়ার্ডে ২.১৭ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী অন্যান্য শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অত্যন্ত কম। ৬ নং ওয়ার্ড, বাবুপুর পশ্চিমপাড়া এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় কোনও নারী শিক্ষার্থীই এই স্তরে নেই।

এই পরিসংখ্যানগুলো স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে শহরের তুলনায় গ্রামে শিক্ষার অবস্থা অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষত, মহিলাদের শিক্ষার হার সর্বস্তরে কম, যা সামগ্রিক শিক্ষাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা।

আর্থ-সামাজিক অবস্থান

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা কেমন আছে, বহু পুরনো এ প্রশ্নের সহজ ও একমাত্র উত্তর 'ভালো নেই'। স্বাধীনতার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা শিক্ষা, দীক্ষা, চাকরি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল নেতারা মুসলমানদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় এলেও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানরা সর্বদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়তে পড়তে দলিতদেরও পিছনে পড়ে গেছে। সম্প্রতি নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও সে কথা স্বীকার করেছেন। সাম্প্রতিক ২০১৬ সালে প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েশন স্ন্যাপ, গাইডেন্স গিল্ড ও প্রতীচী ইনস্টিটিউটের তৈরি "Living Reality of Muslims in West Bengal: A Report" অর্থাৎ "পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের জীবনের বাস্তবতা: একটি প্রতিবেদন" শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশ করে অমর্ত্য সেন বলেছেন, বাঙালি মুসলমানদের যে কতটা বঞ্চনা সহ্য করতে হয়, তা কেবল বহুমাত্রিক পাঠের মাধ্যমেই বোঝা যায়। এই স্ন্যাপ ও প্রতীচী রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায় রাজ্যের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সিংহভাগই মুসলমান। এবং জীবনযাপনে নিরিখে তারা অসামঞ্জস্যভাবে দরিদ্র ও বঞ্চিতও।[11]

২০০৬ সালে প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্ট পরোক্ষ সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে তৈরি হলেও এই রিপোর্টের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত করুন অবস্থা চিত্র উঠে আসে। সাচার কমিটির রিপোর্টের সবচেয়ে বিস্ফোরক যে তথ্য উঠে আসে তা হল- ভারতে মুসলিম জনগণের আত্মপরিচয় (Identity), নিরাপত্তা(Security) এবং সমতা (Equality)-র প্রশ্ন।

আত্মপরিচয় (Identity) সম্পর্কিত বিষয়: যা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্বস্তির কারণ তা হল- ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে একাধারে জাতীয়তাবাদ বিরোধী এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ- এই দুই রকম অপবাদ বহন করতে হচ্ছে। মুসলমান মানেই যে জঙ্গি নয় তা প্রমাণ করার দায়, মুসলমানদের বোরখা, পর্দা

[11] Association SNAP, Guidance Guild, Pratichi Institue, (2016), Living Reality of Muslims in West Bengal: A Report, Pratichi Institue.

প্রথা, দাড়ি রাখা এবং টুপি পরিধান করার মত প্রথা সম্পর্কে তাদের বিরুপ করা হচ্ছে। মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া নিতে বা ক্রয় করতে চরম অসুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের শিশুদের ভর্তি করাতে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে এবং মেয়েদের চরম দুরবস্থার কারণ হিসেবে ধর্মকে দায়ী করার কারণে দেশ জুড়ে মুসলমান নারীরা চরম নির্যাতনে সম্মুখীন হচ্ছে, যা সার্বিকভাবে সংখ্যালঘু মুসলমাদের আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি করে তোলে।

নিরাপত্তা (Security) সম্পর্কিত বিষয়: যে বিষয়গুলি ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে তা হল- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভয়ের প্রবেশ, দাঙ্গার সময় তাদের প্রতি সরকারের কপোট বিষন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, অপরাধী ব্যাক্তিদের আইনের বিষয়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, দাঙ্গা কবলিত মুসলমানদের মধ্যে ক্ষতিপূরণে অসম বন্টন, সংবাদ মাধ্যম এবং পুলিশ উভয়ের দ্বারা মুসলমানদের সহিংস জাতি হিসেবে চিহ্নিতকরণ, মুসলমান অঞ্চলগুলিতে পুলিশের অত্যাচার, মুসলমানদেরকে আইএসআই (ISI)-র চর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য তাদের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়। এছাড়া পুলিশ বাহিনীতে পর্যাপ্ত মুসলমানদের অনুপস্থিত, মুসলমানদের মধ্যে বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরিসর বাসস্থানের নাগরিক সুযোগ সুবিধার চরম অভাব, কিছু কিছু এলাকায় জোর করে মুসলমানদের বয়কট করা হয়, যার ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হতে হয় এবং মুসলমান নারীরা এলাকার বাইরে যেতে পারবে না এই কারণে তাদের জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

সমতা (Equality) সম্পর্কিত বিষয়: মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়ার অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল, বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধিত্বের অভাব, এবং পুলিশের অত্যাচারের শিকার হওয়ার ঘটনা—এই সমস্ত কিছু মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে বৈষম্যের অনুভূতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

এছাড়াও, একটি ধারণা রয়েছে যে ভারতের সমাজ-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। বৈষম্যের এই অনুভূতি, পরিচয়ের সংকট ও নিরাপত্তাহীনতার সমস্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একধরনের হীনমন্যতা সৃষ্টি করেছে, যা তাদের সমাজের মূলধারায় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে এবং সম্মিলিত বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[12]

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিন্যাস, স্বাস্থ্য, চাকরিতে নিযুক্ত, অর্থনৈতিক অবস্থান, জীবনধারণের মান এবং বৈষয়িক ও সামাজিক পরিকাঠামাগত ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলি। চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানরা প্রায় সকল রাজ্যেই জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত। বেসরকারি পর্যায় চাকরির ক্ষেত্রে

[12] Sachar Committee Report (2006), Social Economic and Educational Status of Muslim Community in India, P.P. 9-26

তো বটেই, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অবস্থান অত্যন্ত নগণ্য। সাচার কমিটির রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের যে চিত্র উঠে আছে তাকে মর্মান্তিক বললেও কম বলা হবে। সাচার রিপোর্ট থেকেই প্রথম জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি উচ্চপদে মুসলমানদের অংশগ্রহণ মাত্র ৪.৭ শতাংশ এবং মোট সরকারি চাকরিতে মুসলমান মাত্র ২.১ শতাংশ।[13]

বস্তুতপক্ষে, যে কোনও অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড হল সেখানকার মানুষের পেশাগত অবস্থানের সার্বিক বিশ্লেষণ। আমার গবেষণায় মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যালঘু মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক মান তুলে ধরার জন্য আমি সংশিলষ্ট জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া গ্রাম এই অঞ্চলগুলিতে ৩৮৮ জন (পুরুষ-২১৯ জন, এবং মহিলা- ১৬৯ জন) এর ওপর করা মাঠ পর্যায়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে তথ্য উঠে আসে তা নিম্নে প্রদত্ত সারণি: ৩.৬-তে তুলে ধরা হল।

সারণি: ৩.৬. মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত ৬নং ও ৮নং ওয়ার্ড এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া গ্রাম এর সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর পেশাগত অবস্থান (শতাংশে)

কাজের ধরন	সেক্স	৬ নং ওয়ার্ড	৮ নং ওয়ার্ড	বাবুপুর পশ্চিমপাড়া	বাবুপুর মধ্যপাড়া
কৃষিকাজ	পুঃ	১৩.৮৫	১২.৫	২৮.৮৫	২৬.০৯
	মঃ	১৩.৩৩	১০.৮৭	২২.৫	২১.০৫
শ্রমিক	পুঃ	২৯.২৩	২৫	৩২.৬৯	৩৪.৭৮
	মঃ	১৫.৫৫	১৩.০৪	১২.৫	১৩.১৬
সরকারি চাকরি	পুঃ	৬.১৫	৮.৯৩	৫.৭৭	২.১৭
	মঃ	২.২২	৪.৩৫	২.৫	০০
বেসরকারি চাকরি	পুঃ	৬.১৫	৭.১৪	১.৯২	২.১৭
	মঃ	০০	০০	০০	০০
ব্যবসা	পুঃ	২৬.১৫	২৮.৫৭	১৩.৪৬	১৫.২১
	মঃ	৪.৪৪	৪.৩৫	২.৫	০০
অন্যান্য	পুঃ	১৮.৪৬	১৭.৮৬	১৭.৩১	১৯.৫৬
	মঃ	৬৪.৪৪	৬৫.২১	৬০	৬৫.৭৯

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ থেকে নেওয়া)

[13] Sachar Committee Report (2006), প্রাগুক্ত।

চিত্রঃ ৩.৩.

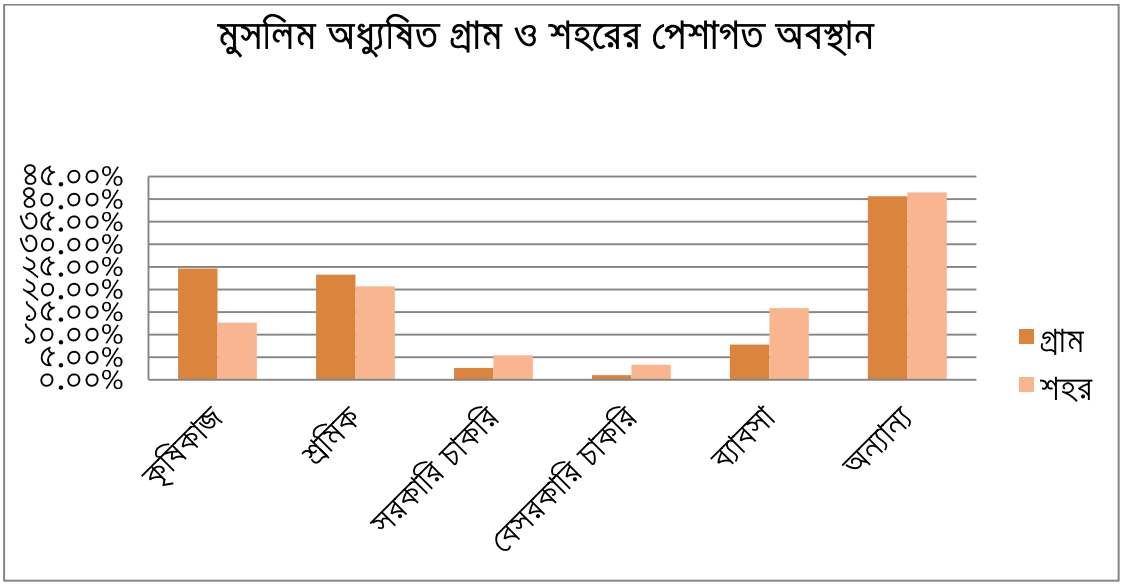

উৎসঃ সারণি ৩.৬ –এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

চিত্রঃ ৩.৪.

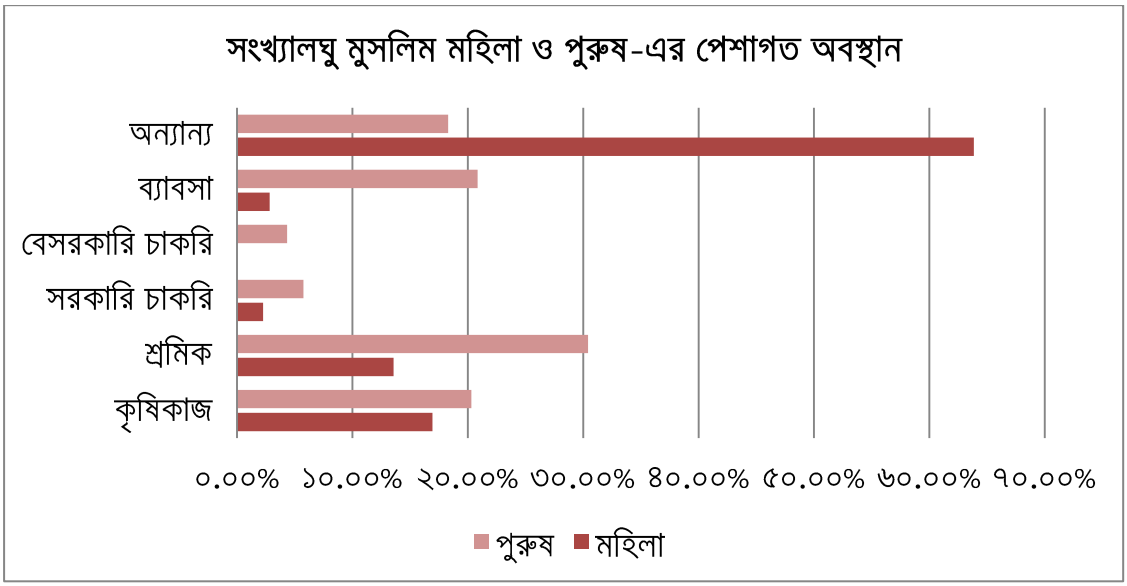

উৎসঃ সারণি ৩.৬ –এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

উপরে সারণি ৩.৬ - তে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এখানকার কর্মসংস্থানের ধরন মূলত শ্রমনির্ভর ও ক্ষুদ্র ব্যবসাকেন্দ্রিক। ৩৮৮ জনের ওপর করা এই সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট হয় যে পুরুষ ও মহিলাদের পেশাগত সম্পৃক্ততায় একটি স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে এবং কর্মসংস্থানের ধরন এলাকাভেদে ভিন্নতা বহন করে। কৃষিকাজ মূলত গ্রামীণ এলাকায় বেশি প্রচলিত, বিশেষ করে বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়ায় কৃষির ওপর নির্ভরশীল পুরুষের সংখ্যা শহুরে এলাকাগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ

তুলনামূলকভাবে কম, যা সামাজিক গঠন ও সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন হতে পারে। কৃষিকাজে পুরুষদের অংশগ্রহণ ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩.৮৫%, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ১২.৫%, বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ২৮.৮৫% এবং মধ্যপাড়ায় ২৬.০৯%। নারীদের ক্ষেত্রে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ কিছুটা কম, যা বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ২২.৫% এবং মধ্যপাড়ায় ২১.০৫%, অন্যদিকে ৬ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এটি আরও কম।

শ্রমিক শ্রেণিতে পুরুষদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়, বিশেষত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়ায়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে এই অঞ্চলে শ্রমনির্ভর জীবিকার প্রচলন বেশি, যেখানে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকরা কাজ করে। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পেশার ধরন বৈচিত্র্যময়। এখানে বেশিরভাগ শ্রমিক নির্মাণশিল্পের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষত রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করা সাধারণ চিত্র। এছাড়াও, কারখানার শ্রমিক এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের (কন্ট্রাক্ট লেবার) উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়। এটি থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলের শ্রমশক্তির বড় অংশ নির্মাণ, কারখানা ও অস্থায়ী শ্রমভিত্তিক কাজের ওপর নির্ভরশীল। শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে পুরুষদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এটি ২৯.২৩%, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ২৫%, বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ৩২.৬৯% এবং মধ্যপাড়ায় সর্বোচ্চ ৩৪.৭৮%। অন্যদিকে, নারীদের শ্রমিক হিসাবে কাজ করার হার তুলনামূলকভাবে কম। পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক কম সংখ্যায় এই ধরনের কাজে নিযুক্ত, যা পিতৃতান্ত্রিক শ্রম বিভাজনকেই ইঙ্গিত করে।

সরকারি চাকরিতে যুক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য চাকরির সুযোগ এবং প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে তাদের সংযোগের দুর্বলতা তুলে ধরে। সরকারি চাকরিতে পুরুষদের উপস্থিতি কম, তবে নারীদের ক্ষেত্রে এটি আরও নগণ্য। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে পুরুষদের মধ্যে সরকারি চাকরির হার ৬.১৫% এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৮.৯৩%, অন্যদিকে বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ৫.৭৭% এবং মধ্যপাড়ায় এটি মাত্র ২.১৭%। নারীদের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য, মধ্যপাড়ায় কোনো নারীর সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত থাকার তথ্য নেই। বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। পুরুষদের মধ্যে বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থাকার হার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৬.১৫%, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৭.১৪%, তবে গ্রামীণ অঞ্চলে, বিশেষ করে বাবুপুর পশ্চিমপাড়া এবং মধ্যপাড়ায়, এই হার যথেষ্ট কম, যা শহর ও গ্রামের কর্মসংস্থানের পার্থক্যকে নির্দেশ করে। নারীদের মধ্যে বেসরকারি চাকরিতে যুক্ত থাকার হার একেবারেই শূন্য, যা নারীদের পেশাগত বিকাশের সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে শহুরে এলাকায় যুক্ত পুরুষদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, তবে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে এটি কম। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষ বেশি কৃষিনির্ভর, ফলে ব্যবসার প্রসার এখানে কম দেখা যায়। ব্যবসা ক্ষেত্রে পুরুষদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি, বিশেষ করে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮.৫৭% পুরুষ ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিযুক্ত। বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় এটি ১৩.৪৬% এবং মধ্যপাড়ায় ১৫.২১%। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের হার অত্যন্ত কম, মধ্যপাড়ায় কোনো নারীই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নেই। ব্যবসা ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ তামাক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। স্থানীয় অর্থনীতিতে তামাক ব্যবসার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যা পুরুষদের কর্মসংস্থানের

একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও, ক্ষুদ্র দোকান পরিচালনা ও অন্যান্য ছোট ব্যবসায় পুরুষদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। তবে বড় মাপের ব্যবসার সংখ্যা খুবই কম, যা বোঝায় যে এই অঞ্চলে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের ব্যবসা পরিচালিত হয়।

অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে পুরুষদের অংশগ্রহণ মোটামুটি সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্যান্য পেশার মধ্যে প্রধানত রিকশা, ভ্যান ও অন্যান্য ছোটখাট পরিবহন যান চালনা, বিড়ি বাঁধার কাজ, এবং অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তিতে যুক্ত থাকার প্রবণতা দেখা যায়। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে পুরুষদের ১৮.৪৬%, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ১৭.৮৬%, বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ১৭.৩১% এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় ১৯.৫৬% অন্যান্য পেশায় যুক্ত। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৬৪.৪৪%, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৬৫.২১%, বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ৬০% এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় সর্বোচ্চ ৬৫.৭৯% নারী অন্যান্য পেশার অন্তর্ভুক্ত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে মহিলারা গৃহস্থালি কাজ, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প বা অনানুষ্ঠানিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ এই অঞ্চলে নারীরা মূলত গৃহকর্মের পাশাপাশি বিড়ি বাঁধার মতো কম বেতনের অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তিতে যুক্ত, যা তাদের আর্থ-সামাজিক দুর্বল অবস্থানকেই ইঙ্গিত করে। উল্লেখ্য যে, বিড়ি বাঁধার কাজে পুরুষরাও যুক্ত থাকলেও নারীদের মধ্যে বিড়ি বাঁধার কাজের আধিপত্য লক্ষ করা যায়, যা নারীদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলেও এটি নিম্ন মজুরির এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে পড়ে।

সার্বিকভাবে, এই অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ধরনে গ্রামীণ ও শহুরে পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পুরুষদের মধ্যে কৃষি ও শ্রমিকশ্রেণির আধিক্য থাকলেও, মহিলাদের কর্মসংস্থান মূলত অনানুষ্ঠানিক খাতে সীমাবদ্ধ। সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে প্রবেশাধিকারের অভাব এবং স্বনির্ভরতার সুযোগের সীমাবদ্ধতা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করে এই কর্মসংস্থান কাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে, যা ভবিষ্যতে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সারণিঃ ৩.৭. পারিবারিক গড় মোট মাসিক আয়ের শ্রেণীকরণ (শতাংশের নিরিখে)

গ্রাম/ওয়ার্ড	১০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০,০০১-২০,০০০ টাকা	২০,০০১-৩০,০০০ টাকা	৩০,০০১-৫০,০০০ টাকা	৫০,০০১ ও তার উর্ধ্বে
৬নং ওয়ার্ড	১৬.৭০	৪০	৩৩.৩০	৬.৬৭	৩.৩৩
৮নং ওয়ার্ড	১৮.৭৫	২৫	৩৭.৫	১২.৫	৬.২৫
বাবুপুর পশ্চিমপাড়া	৪৫.৪৫	৩৬.৩৬	১৩.৬৩	৪.৫৪	০০
বাবুপুর মধ্যপাড়া	৪৭.৬১	৩৮.০৯	৯.৫২	৪.৭৬	০০

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ থেকে নেওয়া)

চিত্রঃ ৩.৫. পারিবারিক গড় মাসিক আয়ের চিত্র

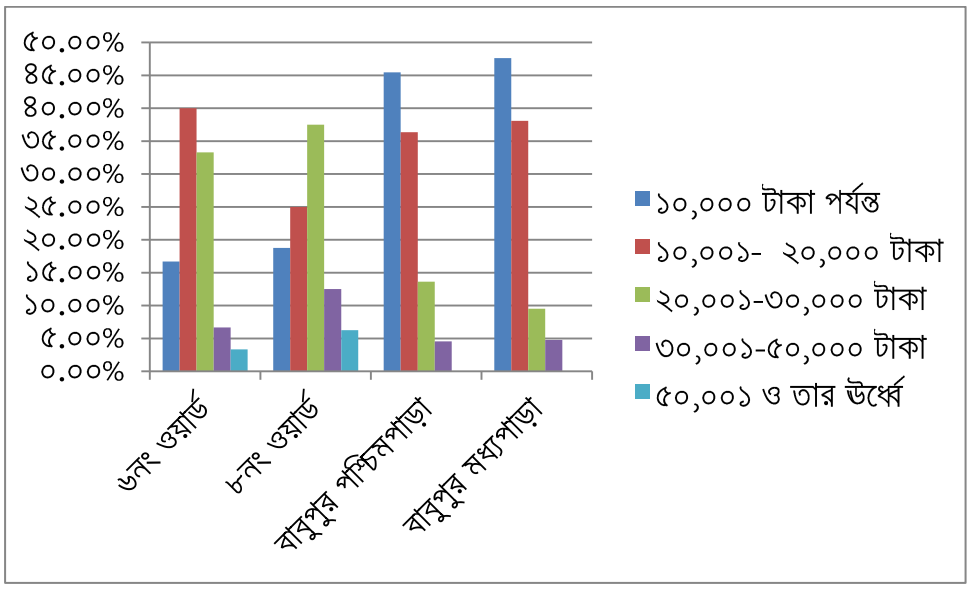

উৎসঃ সারণি ৩.৭ –এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

সারণি ৩.৭-এ পারিবারিক গড় মোট মাসিক আয়ের শ্রেণীবিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে, যা বিভিন্ন গ্রাম ও ওয়ার্ডভিত্তিক পার্থক্য তুলে ধরে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এখানে মোট পরিবারের ১৬.৭০ শতাংশের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা নিম্ন আয়ের শ্রেণীতে পড়ে। সবচেয়ে বড় অংশ, অর্থাৎ ৪০ শতাংশ পরিবার, ১০,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে উপার্জন করে। এর পরের স্তরে, ৩৩.৩০ শতাংশ পরিবার ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকা আয়ের মধ্যে পড়ে, যা মধ্যম আয়ের স্তর নির্দেশ করে। উচ্চ আয়ের স্তরে থাকা পরিবারগুলোর মধ্যে ৬.৬৭ শতাংশের আয় ৩০,০০১ থেকে ৫০,০০০ টাকার মধ্যে এবং মাত্র ৩.৩৩ শতাংশ পরিবার ৫০,০০১ টাকার বেশি আয় করে।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। এখানে নিম্ন আয়ের পরিবার ১৮.৭৫ শতাংশ, যা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তুলনায় সামান্য বেশি। ১০,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকা আয়ের স্তরে রয়েছে ২৫ শতাংশ পরিবার। ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকার মধ্যে আয় করে এমন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, যা ৩৭.৫ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে উচ্চ আয়ের স্তরে থাকা পরিবারের সংখ্যা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ে বেশি, যেখানে ১২.৫ শতাংশ পরিবার ৩০,০০১ থেকে ৫০,০০০ টাকা উপার্জন করে এবং ৬.২৫ শতাংশ পরিবার ৫০,০০১ টাকার বেশি উপার্জন করে।

বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও মধ্যপাড়ার ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ৪৫.৪৫ শতাংশ পরিবার ১০,০০০ টাকার মধ্যে আয় করে, যা স্পষ্টভাবে নিম্ন আয়ের শ্রেণীকে নির্দেশ করে। ১০,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে আয় করে ৩৬.৩৬ শতাংশ পরিবার, যা এই অঞ্চলে

মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোর সংখ্যা বোঝায়। ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকা আয়ের স্তরে মাত্র ১৩.৬৩ শতাংশ পরিবার রয়েছে এবং উচ্চ আয়ের স্তরে থাকা পরিবারগুলোর সংখ্যা খুবই কম, যেখানে ৪.৫৪ শতাংশ পরিবার ৩০,০০১ থেকে ৫০,০০০ টাকা উপার্জন করে এবং ৫০,০০১ টাকার ঊর্ধ্বে আয় করে এমন কোনো পরিবার নেই।

বাবুপুর মধ্যপাড়ার চিত্র পশ্চিমপাড়ার অনুরূপ, তবে নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা এখানে আরও বেশি। এখানে ৪৭.৬১ শতাংশ পরিবার ১০,০০০ টাকার মধ্যে আয় করে, যা অঞ্চলের নিম্ন আয়ের প্রাধান্যকে নির্দেশ করে। ১০,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে আয় করে ৩৮.০৯ শতাংশ পরিবার। মধ্যম আয়ের স্তরে, ২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ টাকা উপার্জনকারী পরিবারের সংখ্যা কমে ৯.৫২ শতাংশে নেমে এসেছে। উচ্চ আয়ের স্তরে থাকা পরিবারের সংখ্যা খুবই নগণ্য, যেখানে মাত্র ৪.৭৬ শতাংশ পরিবার ৩০,০০১ থেকে ৫০,০০০ টাকা উপার্জন করে এবং ৫০,০০১ টাকার বেশি আয় করে এমন কোনো পরিবার নেই।

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও মধ্যপাড়ায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারের আধিক্য রয়েছে, যেখানে উচ্চ আয়ের পরিবার প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, ৬ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে মধ্যম ও উচ্চ আয়ের পরিবারগুলোর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, বিশেষ করে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে উচ্চ আয়ের পরিবারের উপস্থিতি কিছুটা লক্ষ করা যায়।

সারণিঃ ৩.৮. পরিবারভিত্তিক উপার্জনকারী ও নির্ভরশীল সদস্যদের বণ্টন

গ্রাম/ ওয়ার্ড	নির্বাচিত মোট পরিবার	পরিবারের গড় মোট সদস্য সংখ্যা	মোট উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা	মোট নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা	উপার্জনকারী (%)	নির্ভরশীল (%)
৬ নং ওয়ার্ড	৩০	১৭০	৭২	৯৮	৪২.৩৫	৫৭.৬৫
৮ নং ওয়ার্ড	৩২	১৯৩	৮৭	১০৬	৪৫.০৮	৫৪.৯২
বাবুপুর পশ্চিমপাড়া	২২	১৫৩	৪৬	১০৭	৩০.০৭	৬৯.৯৩
বাবুপুর মধ্যপাড়া	২১	১৪৭	৪৩	১০৪	২৯.২৫	৭০.৭৫
মোট	১০৫	৬৬৩	২৪৮	৪১৫	৩৬.৬৯	৬৩.৩১

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ থেকে নেওয়া)

চিত্রঃ ৩.৬. পরিবারভিত্তিক উপার্জনকারী ও নির্ভরশীলতার গ্রাফিক চিত্রায়ন

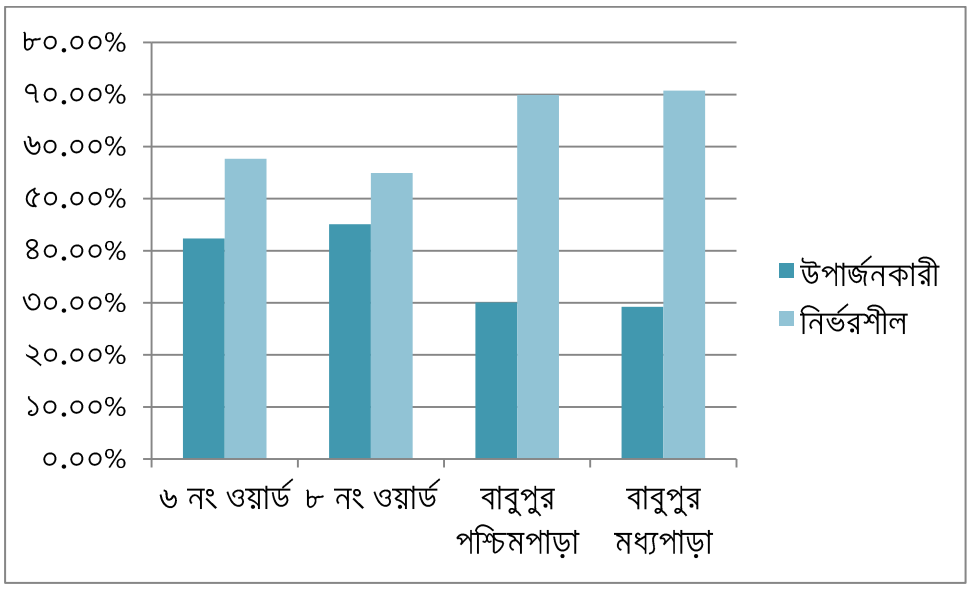

উৎসঃ সারণি ৩.৮ –এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

উপরের সারণি: ৩.৮- এ প্রদত্ত মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার ৬ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড এবং তিনপাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়ার পরিবারভিত্তিক উপার্জনকারী ও নির্ভরশীল সদস্যদের বণ্টন পর্যালোচনা করলে শহর ও গ্রামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পৌরসভা এলাকার তুলনায় গ্রামীণ এলাকাগুলিতে উপার্জনকারীর সংখ্যা কম এবং নির্ভরশীল সদস্যের সংখ্যা বেশি।

৬ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পরিবারগুলোর গড় সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ৫.৬৭ ও ৬.০৩, যেখানে বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও মধ্যপাড়ার পরিবারগুলোর গড় সদস্য সংখ্যা ৬.৯৫ ও ৭.০০। এটি বোঝায় যে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পরিবার অপেক্ষাকৃত বড় এবং সেখানে উপার্জনকারীদের সংখ্যা কম। ফলে প্রতি পরিবারের উপর নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। ধুলিয়ান পৌরসভার ৬ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে উপার্জনকারীদের হার যথাক্রমে ৪২.৩৫% ও ৪৫.০৮%, যেখানে বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও মধ্যপাড়ায় এই হার যথাক্রমে ৩০.০৭% ও ২৯.২৫%। অর্থাৎ, পৌরসভা এলাকায় উপার্জনকারীদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের সুযোগের প্রভাব নির্দেশ করে।

বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও মধ্যপাড়ায় নির্ভরশীল সদস্যের হার যথাক্রমে ৬৯.৯৩% ও ৭০.৭৫%, যা অত্যন্ত বেশি। এর ফলে পরিবারগুলোর উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ, শিক্ষার অভাব এবং মহিলাদের কম উপার্জনশীল হওয়া এর অন্যতম কারণ। ধুলিয়ান পৌরসভা এলাকায় তুলনামূলকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকায় এখানকার পরিবারগুলোর নির্ভরশীলতার হার কিছুটা কম। পৌর এলাকায়

ছোট ব্যবসা, সরকারি-বেসরকারি চাকরি ও অন্যান্য পেশার সুযোগ থাকায় পরিবারপ্রতি উপার্জনকারীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মান বিশ্লেষণ করে একটি পরিবারের বা অঞ্চলের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোঝা যায়। এটি দরিদ্রতা, সুবিধাবঞ্চিত অবস্থা, জীবনধারার মান ইত্যাদি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আমার গবেষণা পত্রে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ধুলিয়ান পৌরসভার ৬ নম্বর ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে যথাক্রমে ৩২ টি ও ৩০ টি পরিবার, এবং তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া থেকে যথাক্রমে ২১ টি ও ২২ টি পরিবার থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সেখানকার বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মান তুলে ধরা হল নিম্নে প্রদত্ত সারণিঃ ৩.৯ – এতে।

সারণিঃ ৩.৯. বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মান এর একটি পরিসংখ্যানগত উপস্থাপন (শতাংশের হিসেবে)

গ্রাম/ ওয়ার্ড	কাঁচাঘর	পাকাঘর	বিদ্যুৎ সংযোগ	বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ	শৌচাগার সুবিধা
৬ নং ওয়ার্ড	৬.৬৭	৯৩.৩৩	১০০	১০০	১০০
৮ নং ওয়ার্ড	৬.২৫	৯৩.৭৫	১০০	১০০	১০০
বাবুপুর পশ্চিমপাড়া	২৭.২৮	৭২.৭২	১০০	৯১	৯৭
বাবুপুর মধ্যপাড়া	২৮.৫৮	৭১.৪২	১০০	৮৯	৯৬

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ থেকে নেওয়া)

সারণি ৩.৯. - এ প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, পৌরসভা এলাকার দুটি ওয়ার্ডে বাসস্থান বেশ উন্নত, যেখানে পাকাঘরের হার ৯৩% এর ওপরে। অন্যদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাবুপুর পশ্চিমপাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়ায় পাকাঘরের হার অপেক্ষাকৃত কম, যা যথাক্রমে ৭২.৭২% ও ৭১.৪২%। এতে বোঝা যায় যে গ্রামাঞ্চলে এখনো কাঁচাঘরের সংখ্যা বেশি, যা অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকার ইঙ্গিত দেয়।

চারটি অঞ্চলেই বিদ্যুৎ সংযোগ ১০০% থাকায় বোঝা যায় যে বিদ্যুৎ পরিষেবা সর্বজনীনভাবে পৌঁছেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হয়েছে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে পৌরসভা এলাকায় সম্পূর্ণ কাভারেজ থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ৯১% এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় ৮৯% পরিবারের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছাচ্ছে, যা মোটামুটি

উচ্চ হার হলেও শতভাগ নয়। এটি বোঝায় যে এখনো কিছু পরিবার বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত, যা স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

শৌচাগার সুবিধার দিক থেকেও পৌরসভা এলাকায় ১০০% কাভারেজ নিশ্চিত হয়েছে, যা শহুরে পরিষেবার উন্নতির চিত্র তুলে ধরে। তবে গ্রামাঞ্চলে এই হার কিছুটা কম, বাবুপুর পশ্চিমপাড়ায় ৯৭% এবং বাবুপুর মধ্যপাড়ায় ৯৬%। যদিও এই হার মোটামুটি ভালো, তবুও এটি বোঝায় যে এখনো কিছু পরিবার শৌচাগারের বাইরে রয়েছে।

গবেষণায় আর্থ-সামাজিক অবস্থান মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে শিক্ষার হার, পেশাগত অবস্থান, আয়ের মাত্রা, বাসস্থান ও জীবনযাপনের মান নির্ধারণ করা ছাড়াও সমসাময়িক বাস্তবতায় প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতাকেও বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ডিজিটাল সক্ষমতা মূলত ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার (access to technology) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সক্ষমতা বাড়লে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত ও সরাসরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, একইসাথে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ, শিক্ষাগত অগ্রগতি এবং সামাজিক সচেতনতার উন্নতিও সাধিত হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণে ডিজিটাল সক্ষমতাকেও একটি নির্ণায়ক মানদণ্ড হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহার, ইন্টারনেট সংযোগের প্রবাহ, মোবাইল ব্যাঙ্কিং বা অনলাইন সেবার ব্যবহার এবং সরকারি ই-সেবায় অংশগ্রহণের হার কেমন। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিক পারদর্শী, যা তাদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। বিশেষত, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্য, এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির অভাব সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর নতুন 15 দফা কর্মসূচি (Prime Minister's New 15 Point Programme) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কর্মসূচির বিস্তৃত উদ্দেশ্যগুলি হল (i) শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি; (ii) বিদ্যমান ও নতুন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য বর্ধিত ঋণ সহায়তা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে নিয়োগ; (iii) পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য উপযুক্ত অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে তাদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি; এবং (iv) সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ। এই চারটি উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ১৫ দফা কর্মসূচি হল নিম্নরূপ -

(১) সমন্বিত শিশুবিকাশ পরিষেবা (ICDS) সুবিধার ন্যায্য প্রাপ্যতা

(২) স্কুল শিক্ষার প্রবেশাধিকারের উন্নতি

(৩) উর্দু শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত সংস্থান বৃদ্ধি

(৪) মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ

(৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি

(৬) মৌলানা আজাদ শিক্ষা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নতি

(৭) দরিদ্রদের জন্য স্বনির্ভর ও মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান করা

(৮) প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন

(৯) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ সহায়তা বৃদ্ধি

(১০) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগ

(১১) গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অংশগ্রহণ

(১২) সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বস্তির অবস্থার উন্নতি

(১৩) সাম্প্রদায়িক অশান্তি প্রতিরোধ

(১৪) সাম্প্রদায়িক অপরাধের জন্য কঠোর বিচার ও শাস্তি

(১৫) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসন।[14]

বস্তুতপক্ষে, বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন সমাজের সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি সমাজকল্যাণমূলক প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন শুধুমাত্র ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার বিষয় নয়, বরং এটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও অপরিহার্য।

[14] Govt. of India, (Ministry of Minority Affairs), PM 15 Points Programme, New Delhi: https://www.minorityaffairs.gov.in/ (accessed on 24.08.2023)

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারের শাসনামলে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সরাসরি লক্ষ্যভিত্তিক সরকারি স্কিম বা প্রকল্পের সংখ্যা সীমিত ছিল। তবে, কিছু সাধারণ নীতি ও উদ্যোগ ছিল যা পরোক্ষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপকারে আসে:

১। ভূমি সংস্কার: কংগ্রেস সরকার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের জন্য ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করে। যদিও এই নীতিগুলো বিশেষভাবে মুসলিমদের জন্য ছিল না, তবে গ্রামীণ এলাকায় ভূমিহীন মুসলিমদের উপকারে আসে। তবে, এই সংস্কারের কার্যকারিতা ও ব্যাপ্তি কংগ্রেস শাসনামলে সীমিত ছিল, এবং জমি পুনর্বণ্টনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ১৯৭৭ সালের পর বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ঘটে।[15]

২। শিক্ষা উদ্যোগ: অবহেলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে মুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর জন্য বৃত্তি প্রদান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে, এই উদ্যোগগুলি কতটা মুসলিম সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে বা উপকারে আসে তার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সীমিত।

৩। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন: বিভাজনের পর, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে প্রধানত হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটে। সরকারের মনোযোগ ছিল এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে, যা প্রায়ই বিদ্যমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যায়। উদ্বাস্তু কলোনিগুলো বিশেষ করে পরবর্তী দশকগুলোতে বামপন্থী আন্দোলনের উত্থানের সাথে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক স্থান হয়ে ওঠে।[16]

৪। রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব: যদিও কংগ্রেস দলে মুসলিম নেতারা ছিলেন, তবে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিশেষভাবে উপকৃত করার জন্য নীতিগুলিতে উল্লেখযোগ্য ফোকাস ছিল না। সেই সময়ের রাজনৈতিক গতিশীলতা ছিল বৃহত্তর বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রিত, সম্প্রদায়-নির্দিষ্ট উদ্বেগের পরিবর্তে।

উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য বিস্তৃত ও লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণমূলক স্কিমগুলি ১৯৭৭ সালের পর, বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে বেশি প্রচলিত হয়। বামফ্রন্ট মুসলিমদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও আরও কার্যকর ভূমি সংস্কার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

[15] Islam, Maidul, (March, 2025), Communists and the fulfillment of secular promises in West Bengal, Pakistan Monthly Review: An Independent Socialist Journal, vol.7, No.3. https://pakistanmonthlyreview.com/communists-and-the-fulfilment-of-secular-promises-in-west-bengal/?utm_source=chatgpt.com (accessed on 02.01.2025)

[16] Sengupta, Anwesha, The Refugee Colonies of Kolkata: History, Politics and Memory, https://www.sahapedia.org/refugee-colonies-kolkata-history-politics-and-memory?utm_source=chatgpt.com (accessed on 03.01.2025)

- **সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ (১৯৭৭-২০১১)**

ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে, তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য একাধিক নীতি ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেওয়া এই উদ্যোগগুলো পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সমাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু মুসলিমদের উন্নয়নের জন্য জমির সংস্কার, শিক্ষা প্রসার, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ, সংরক্ষণমূলক নীতি, আর্থিক সহায়তা এবং সরকারি চাকরিতে সুযোগ বৃদ্ধির মতো নীতিগুলি বাস্তবায়ন করে। এছাড়া সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা আর্থিক সংস্থা ও স্বতন্ত্র কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এই প্রসঙ্গে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশগুলোর উল্লেখ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন ২০০৭ সালে তার প্রতিবেদনে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি চাকরি, শিক্ষা ও আর্থিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছিল।[17] যদিও এই প্রতিবেদন বামফ্রন্ট শাসনের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত হয়, তবুও পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার পূর্ব থেকেই সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে মিশ্র কমিশনের সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

1. পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি: সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রভাব

বামফ্রন্ট সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করে, যা দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি এবং পরবর্তী সময়ে অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা হয় এবং বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এটি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়ায়, যা শিক্ষা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিদ্যালয়মুখিতা বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনকে উৎসাহিত করে এবং শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন –পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্কুলহীন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করা, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের শিক্ষার জন্য

[17] The Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, (10th May 2007), Govt. Of India, https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=327&lid=263 (accessed on 20.11.2024)

সাক্ষরতা অভিযান এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে স্কুলে ভর্তির হার বাড়াতে বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ অভিযান চালানো হয়। এছাড়াও ২০০৭ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল কমিশন ফর রিলিজিয়াস এন্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনোরিটিস (NCRLM) কমিশন, যা রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন নামেও পরিচিত- এর সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-

"Select institutions in the country like the Aligarh Muslim University and the Jamia Millia Islamia should be legally given a special responsibility to promote education at all levels to Muslim students by taking all possible steps for this purpose. At least one such institution should be selected for this purpose in each of those States and Union Territories which has a substantial Muslim population" [18] অর্থাৎ আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া উচিত মুসলিম শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষলাভের ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির মধ্যে যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি সেখানে এইরকম একটি উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণ এর উদ্দেশ্যে - ন্যাশনাল কমিশন ফর রিলিজিয়াস এন্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনোরিটিস (NCRLM) এর এই সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করে যেমন-

- ২০১০ সালে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে ৩০০ একর জমিতে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির একটি নতুন ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করে ব্যবস্থাপনা, আইন ও শিক্ষাবিদ্যার কোর্স (এম.বি.এ, বি. এড এবং বি.এল.এল. বি) চালু করা হয়। মুর্শিদাবাদ একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় এখানে AMU ক্যাম্পাস স্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। মুর্শিদাবাদ ক্যাম্পাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদান করছে। ঐতিহাসিকভাবে, এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অবকাঠামো ততটা শক্তিশালী ছিল না, ফলে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য এই ক্যাম্পাস বিশেষ ভূমিকা রাখছে। যদিও ক্যাম্পাসটির সম্পূর্ণ উন্নয়ন এখনো চলমান, তবে এটি ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু

[18] The Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, (10th May 2007), Govt. Of India, p.151. https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=327&lid=263 (accessed on 20.11.2024)

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে আরও নতুন বিভাগ ও কোর্স চালুর পরিকল্পনা রয়েছে, যা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে আরও সহায়ক হবে।

- ২০০৭ সালে, বামফ্রন্ট সরকার "The Aliah University Act, 2007" পাস করে, যার মাধ্যমে ক্যালকাটা মাদ্রাসা-কে আলিয়া ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করা হয়। ২০০৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আলিয়া ইউনিভার্সিটি কার্যক্রম শুরু করে যেখানে ইসলামিক থিওলজি সহ এম.এ এবং এম.এসসি কোর্সের বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে বহু নতুন বিভাগ, ক্যাম্পাস ও গবেষণার সুযোগ তৈরি করে। এটি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বামফ্রন্ট সরকারের সংখ্যালঘু শিক্ষানীতির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

- পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত (MCDs) এলাকা বারাসাত ও মালদায় প্রতিষ্ঠিত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় (West Bengal State University) এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Gour Banga University) —মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ২০% এর বেশি নামভুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান, যা সংখ্যালঘু শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে স্থানীয় শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, যা আগে অন্যত্র গিয়ে অর্জন করতে হতো। ফলে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ বাড়ছে।

“The Madarsa Modernisation Scheme of the government should be suitably revised, strengthened and provided with more funds so that it can provide finances and necessary paraphernalia either (a) for the provision of modern education up to Standard X within those madarsas themselves which are at present imparting only religious education or, alternatively, (b) to enable the students of such madarsas to receive such education simultaneously in the general schools in their neigbourhood”[19] অর্থাৎ সরকারের মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্পকে যথাযথভাবে সংশোধন শক্তিশালীকরন এবং আরো তহবিল সরবরাহ করা উচিত যাতে এটি (ক) যে সকল মাদ্রাসা বর্তমানে কেবল ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে সেই সকল মাদ্রাসার অভ্যন্তরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অথবা বিকল্প রূপে (খ) উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রগণ যাতে নিকটবর্তী সাধারণ বিদ্যালয়ে একই সময়ে এই রূপ শিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ্য হয় তা সুনিশ্চিত করা - ন্যাশনাল কমিশন ফর রিলিজিয়াস এন্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনোরিটিস এর এই সুপারিশ অনুযায়ী

[19] The Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, (10th May 2007), Govt. Of India, p. 51. https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=327&lid=263 (accessed on 20.11.2024)

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেমন -

- মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে রাজ্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১৯৭৬-৭৭ সালে ৫.৭ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২০১১ সালে ৫৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করে, যেখানে ২০১১ সালের কেন্দ্র সরকারের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ হল ১২৭ কোটি কেবলমাত্র।

- ১৯৭৭ সালে ২৫৮০ জন মাদ্রাসা শিক্ষক ছিল যা ২০১০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৯২ জন প্রায় আট গুণ বেশি।

- ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন (West Bengal Madrasah Service Commission) গড়ে তোলা হয় মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য। ২০০৯ সালে প্রায় চার হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগ করে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন যার মধ্যে ৯৩%ই মুসলিম।[20]

- ১৯৭৭ - ৭৮ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩৮ ছিল। সেখান থেকে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাদ্রাসা এডুকেশন কমিটির ২০০২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ৫০৭ টি মাদ্রাসা স্কুল গড়ে উঠেছে বলা হয় যা তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত—জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, উচ্চ মাদ্রাসা এবং সিনিয়র মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা উচ্চ মাদ্রাসার (২৩৮টি), যা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রদান করে এবং আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সংযোগ স্থাপন করে। এর পরেই রয়েছে জুনিয়র হাই মাদ্রাসা (১৬৬টি), যা মূলত প্রাথমিক থেকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দেয়। সিনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (১০৩টি), যা মূলত উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামিক স্টাডিজের ওপর গুরুত্ব দেয়। জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুর্শিদাবাদ (৭৩টি), মালদা (৬৮টি) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৫০টি) সর্বাধিক মাদ্রাসা সম্পন্ন জেলা, যা ওইসব অঞ্চলের মুসলিম জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ঐতিহ্যগতভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারের প্রতিফলন। তুলনামূলকভাবে কলকাতা, পুরুলিয়া, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় মাদ্রাসার সংখ্যা কম, যা শহরকেন্দ্রিক শিক্ষার আধিপত্য ও মুসলিম জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে কম ঘনত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত।[21] যাইহোক বামফ্রন্ট

[20] Left Front Government & The Development of Muslim Minorities in West Bengal, CPI (M) Campaign Material, (April-May 2011), West Bengal Assembly Election, https://cpim.org/wp-content/uploads/old/documents/2011-minority.development_wb.pdf (accessed on 13.09.2024)

[21] Govt. of West Bengal, (2002), 'Report of the Madrasah Education Committee, West Bengal', Kolkata: Page No. 47

জামানার শেষের দিকে ২০১১ সালে মাদ্রাসা স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০৫ টি এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৪৩৩৮ থেকে বেড়ে ৪.৭৮ লাখ হয়।

এছাড়াও, দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প চালু ছিল যেমন - পোস্ট মেট্রিক (Post-Matric) এবং মেরিট - কাম - মিনস স্কলারশিপ প্রকল্প (Merit-Cum-Means-Scholarship)। বিভিন্ন পেশাগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণের লক্ষেও যুবক - যুবতীদের জন্য বিনামূল্যে কোচিং এর ব্যবস্থা করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

২। সরকারি চাকরিতে সংরক্ষন:

"Since the minorities – especially the Muslims are very much under-represented, and sometimes wholly unrepresented, in government employment, we recommend that they should be regarded as backward in this respect within the meaning of that term as used in Article 16 (4) of the Constitution ...and that 15 percent of posts in all cadres and grades under the Central and State Governments should be earmarked for them as follows: (a) The break up within the recommended 15 percent shall be 10 percent for the Muslims (commensurate with their 73 percent share of the former in the total minority population at the national level)..." অর্থাৎ সংখ্যালঘুরা – বিশেষত মুসলমানরা – সরকারি চাকরিতে অত্যন্ত কম প্রতিনিধিত্বশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকায়, আমরা সুপারিশ করছি যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৬(৪)-এ ব্যবহৃত "পশ্চাৎপদ" শব্দের অর্থের আওতায় তাদের এই ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত...এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনে সমস্ত ক্যাডার ও গ্রেডের ১৫ শতাংশ পদ তাদের জন্য সংরক্ষিত করা উচিত, যা নিম্নরূপ বিভক্ত হবে: (ক) এই সুপারিশকৃত ১৫ শতাংশের মধ্যে ১০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (যা জাতীয় স্তরে মোট সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ৭৩ শতাংশ অংশীদারিত্বের সমতুল্য)... ন্যাশনাল কমিশন ফর রিলিজিয়াস এন্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনোরিটিস এর এই সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ৫৩ টি পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকরিতে ১০% আসন সংরক্ষণ বাস্তবায়িত করেছে।[22] এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ওবিসিদের জন্য মোট আসনের ১৭ শতাংশ বরাদ্দ থাকে যার মধ্যে দশ শতাংশ মুসলিম ওবিসিদের জন্য এবং ৭% অমুসলিম ওবিসি দের জন্য। শুধু তাই নয় OBC ক্যাটাগরির রাজ্য তালিকা সম্প্রসারণ করা হয়, ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ২.০২ কোটি মুসলমান জনসংখ্যার মধ্যে ১.৭২ কোটি অর্থাৎ প্রায় ৮৫ শতাংশ মুসলিমকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হয়। দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম এবং

[22] চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, (১৯ শে জুন, ২০২৪), জাতিগণনাই কি সমাধান, আনন্দবাজার পত্রিকা।

একমাত্র রাজ্য, যা রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়িত করে এবং সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে।[23]

৩। ভূমি সংস্কার ও সংখ্যালঘু উন্নয়নে প্রভাব:

ভারতের সংবিধান সামাজিক ন্যায়বিচার ও বৈষম্য দূরীকরণকে গুরুত্ব দেয় এবং সম্পদের সমবণ্টনের আহ্বান জানায়। বামফ্রন্ট সরকার এই ধারণার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তারা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া ভূমি সংস্কারের তিনটি প্রধান উপাদান ছিল: (i) জমির সর্বোচ্চ সীমা আরোপ এবং সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমির ন্যস্তকরণ (ii) ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে অর্পিত জমির পুনর্বণ্টন এবং (iii) প্রজা চাষীদের সার্বজনীন নিবন্ধন ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্গাদারদের (বর্গাদারদের) প্রজাস্বত্ব অধিকার নিশ্চিতকরণ (অপারেশন বর্গা)। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কারে বামফ্রন্ট সরকারের অবদান অতুলনীয়। সারা দেশের জমির মাত্র ৩% পশ্চিমবঙ্গে। অথচ গোটা দেশে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যত জমি বণ্টিত হয়েছে তার ২২% পশ্চিমবঙ্গেই হয়েছিল।[24] ভূমি সংস্কারের ফলেই রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা ৮৪শতাংশ কৃষি জমির মালিক। জাতীয় স্তরে তা ৩৪ শতাংশের সামান্য বেশি। পাট্টা পেয়ে জমির মালিক হয়েছেন কৃষক পরিবারের মহিলারাও। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫লক্ষ ১৩হাজার নথিভুক্ত বর্গাদারের আইনি অধিকার সুরক্ষিত করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। ভূমি সংস্কার কর্মসূচি থেকে মুসলমানরাও উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জমির অনুপাত সর্বোচ্চ, যেখানে মোট গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে মুসলিম পরিবারের উল্লেখযোগ্য অংশ (১০% এরও বেশি) রয়েছে।[25] ভূমি সংস্কার কর্মসূচিতে সারা রাজ্যে জমি প্রাপকদের ১৮ শতাংশ ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত।[26] বস্তুতপক্ষে, মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকদের অধিকাংশই বর্গাদার ছিলেন। 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের জমির উপর স্থায়ী অধিকার প্রদান করা হয়, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করে। ১৯৬৭-

[23] Left Front Government & The Development of Muslim Minorities in West Bengal, CPI (M) Campaign Material, (April-May 2011), West Bengal Assembly Election, https://cpim.org/wp-content/uploads/old/documents/2011-minority.development_wb.pdf (accessed on 13.09.2024)

[24] বেরা, অঞ্জন, (২১ শে জুন, ২০২৪), বামফ্রন্ট সরকার বিকল্প নীতির দিশা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি https://cpimwb.org.in/left-front-government-the-ardent-alternative/ (accessed on 23.01.2025)

[25] 'Thirty Years of West Bengal Left Front Govt.' (September 9, 2009). https://cpim.org/thirty-years-west-bengal-left-front-govt/ (accessed on 10.09.2024)

[26] হক, সেখ সাইদুল, (২৮ শে এপ্রিল, ২০২৩), 'রাজ্যে বাম জমানায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং গ্রাম বাংলার সংখ্যালঘু জনগণ', দেশহিতৈষী

১৯৭০ সালের মধ্যেই প্রায় ৬,০০,০০০ একর জমি পুনর্বণ্টন করা হয়।[27] এই পুনর্বণ্টনের মূল লক্ষ্য ছিল নিম্নবর্গের কৃষকদের জমির মালিকানা প্রদান করা এবং তাদের কৃষিকাজের অধিকার সুরক্ষিত করা।

তবে, বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদিও সরকার বর্গাদারদের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, অনেক ক্ষেত্রেই এই জমি আদতে জমিদারদের আত্মীয়-পরিজন, রাজনৈতিক পরিচিত ব্যক্তি এবং ভুয়ো পরিচয়ের মাধ্যমে অন্যদের কাছে চলে যায়। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা প্রায়শই এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করত, যা ভূমি সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছিল। ফলে, বর্গাদাররা যাদের 'সাহায্যপ্রাপ্ত' (deserving) গোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছিল, তারা বাস্তবে প্রায়ই 'বিচ্যুত' (deviants) গোষ্ঠীর মতোই আচরণ পেয়েছে। অর্থাৎ, নীতি পর্যায়ে তাদের স্বীকৃতি থাকলেও, বাস্তবে তারা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।[28]

৪। অর্থনৈতিক কল্যাণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও লোন প্রদান:

১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) গঠিত হয়, যা সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করত। বস্তুতপক্ষে এই নিগমের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু পরিবারের যুবক - যুবতী দের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ ও ভর্তুকি দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে টার্ম লোন, ক্লাস্টার লোন, শিক্ষা ঋণ, মাইক্রো ফিন্যান্স এবং সংখ্যালঘু নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (MWEP) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১,২০,২৮৯ জন সুবিধাভোগী এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ঋণ পেয়েছেন, যার আর্থিক পরিমাণ ছিল ৩২,৭৪৯.৮৭ লক্ষ টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে নতুনভাবে ৬২,৩৫৭ জন এই প্রকল্পগুলির আওতায় এসেছেন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৯,৫২২.৫৭ লক্ষ টাকা। ফলে, সামগ্রিকভাবে ২০১১ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ১,৮২,৬৪৬ জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণের সুবিধা পেয়েছেন এবং আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২,২৭২.৪৪ লক্ষ টাকা।

---

[27] Hanstad, Tim and Brown, Jennifer (December, 2001) 'Land Reform Law and Implementation in West Bengal: Lessons and Recommendations', RDI (Rural Development Institute) Reports on Foreign Aid Development, Page No. 14. https://www.researchgate.net/publication/228163446_Land_Reform_Law_and_Implementation_in_West_Bengal_Lessons_and_Recommendations (accessed on 23.02.2024)

[28] Sharda, Divyanshi, (29th May, 2024), 'Land Reforms in India's West Bengal: Through the Lense of Policy Theories', Centre for Development Policy and Practice

সারণিঃ ৩.১০ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (WBMDFC) এর অধীনে ঋণ বিতরণের প্রতিবেদন (মার্চ, ২০১১)

Scheme	Since Inception till 2009-10		2010-11 (Upto 31/03/11)		Total	
	N0. Of Beneficiaries	Financial(in Lakh)	N0. Of Beneficiaries	Financial(in Lakh)	N0. Of Beneficiaries	Financial(in Lakh)
Term Loan	৪২১৬১	২৩৩৮২.২৬	৪৫২৩	২৮৪২.১০	৪৬৬৮৪	২৬২২৪.৩৬
Cluster Loan	২৭২২৬	৪৪১০.৬৮	১০৬৬	১৮৪.৪৭	২৮২৯২	৪৫৯৫.১৪
Educational Loan	৪৪০৭	১৫৬৩.৫৪	২৩১০	৭১৬.২৫	৬৭১৭	২২৭৯.৭৯
Micro Finance	৩৮৭০০	২৫৪১.৪৩	৫৩২২২	৫৬৪৫.৬৫	৯১৯২২	৮১৮৭.০৮
MWEP	৭৭৯৫	৮৫১.৯৭	১২৩৬	১৩৪.১০	৯০৩১	৯৮৬.০৭
Grand Total	১২০২৮৯	৩২৭৪৯.৮৭	৬২৩৫৭	৯৫২২.৫৭	১৮২৬৪৬	৪২২৭২.৪৪

(Source: Left Front Government & The Development of Muslim Minorities in West Bengal, CPI (M) Campaign Material, West Bengal Assembly Election, April-May 2011)

সারণি ৩.১০–এ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক নিগম (WBMDFC)-এর বিভিন্ন ঋণ প্রকল্পের বিতরণের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করছে, যদি প্রকল্পগুলির পৃথক মূল্যায়ন করা হয়, তবে দেখা যায় যে টার্ম লোন প্রকল্পের অধীনে ৪৬,৬৮৪ জন ঋণ সুবিধা পেয়েছেন, যা সামগ্রিক ঋণের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। ক্লাস্টার লোন প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম, যেখানে মোট ২৮,২৯২ জন ঋণ পেয়েছেন এবং বরাদ্দকৃত অর্থ ছিল ৪,৫৯৫.১৪ লক্ষ টাকা। শিক্ষা ঋণের ক্ষেত্রে মোট ৬,৭১৭ জন সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেখানে ২০১০-১১ সালে নতুনভাবে ২,৩১০ জন শিক্ষার্থী ঋণ পেয়েছেন। যদিও এই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ তুলনামূলক কম (২,২৭৯.৭৯ লক্ষ টাকা), তবে এটি সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

এই প্রতিবেদনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল মাইক্রো ফিন্যান্স প্রকল্প, যা সুবিধাভোগীর সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড়। ২০১০-১১ সালে নতুনভাবে ৫৩,২২২ জন এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ পেয়েছেন, যা

সামগ্রিকভাবে ৯১,৯২২ জনকে নিয়ে গিয়েছে। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও এটি সবচেয়ে বেশি, যেখানে মোট ৮,১৮৭.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এটি দেখায় যে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও স্বনির্ভরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচির (MWEP) আওতায় মোট ৯,০৩১ জন ঋণ সুবিধা পেয়েছেন, যার আর্থিক বরাদ্দ ছিল ৯৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। যদিও এটি বিশেষত সংখ্যালঘু নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, তবে এর পরিধি তুলনামূলকভাবে ছোট, যা ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই ঋণ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বোঝা যায় যে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বাড়ছে। বিশেষ করে মাইক্রো ফিন্যান্স প্রকল্পের সাফল্য দেখায় যে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে নারীদের জন্য বিশেষ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ তুলনামূলকভাবে কম থাকায় এটি আরও বিস্তৃত করার প্রয়োজন রয়েছে। সার্বিকভাবে, WBMDFC-এর এই ঋণ কর্মসূচি সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতে আরও কার্যকরী পরিকল্পনার মাধ্যমে এটি সম্প্রদায়ের আরও বৃহত্তর অংশে পৌঁছাতে পারে।

৫। বহু-ক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি (MSDP)

সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম প্রধান প্রকল্প ছিল বহু-ক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি (MSDP)। এর মূল লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘু প্রধান জেলাগুলির (MCDs) সামগ্রিক উন্নয়ন। ভারতজুড়ে মোট ৯০টি সংখ্যালঘু প্রধান জেলা MSDP-র আওতায় আসে, যার মধ্যে ১২টি পশ্চিমবঙ্গে। ২০১০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২১৬৪.২৪ কোটি টাকা এই প্রকল্পের অধীনে খরচ হয়েছে, যা অন্য যে কোনো রাজ্যের তুলনায় সর্বোচ্চ। পশ্চিমবঙ্গে MSDP-র অধীন কয়েকটি গুরুত্বপুর্ন প্রকল্প হল:

- ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY) প্রকল্পের অধীনে ২১,৩১৭টি বাড়ি তৈরি প্রকল্পের অধীনে করা হয়।
- আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এর অধীনে ৪,১০৯টি স্থাপন করা হয়।
- অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ ২,০৪৩টি নির্মাণ করা হয়।

এই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করেছে। তবে এই সমস্ত প্রকল্পগুলি আরও সুচারুবাস্তবায়নের জন্য যথাযথ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্রমাগত বাজেট কমানোর ফলে সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়, যেমন- ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০০৭-১২) জন্য ৩৭৮০ কোটি বরাদ্দ করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু চূড়ান্তভাবে মাত্র ২৭৫০ কোটি বরাদ্দ করা হয়। ২০১০-১১ সালে MSDP-এর বাজেট ১১৬০ কোটি থাকলেও ২০১১-১২ সালে

তা কমিয়ে ₹১০৫০ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়।[29] পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখালেও কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট কাটছাঁট করার ফলে অনেক প্রকল্প বাধাগ্রস্ত হয়।

৬। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম সরোজগার যোজনা (SGSY)

পশ্চিমবঙ্গে স্ব-কর্মসংস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাম জমানায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হল স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর (SHG) অসাধারণ বৃদ্ধি। ২০০৫-০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট SHG-এর সংখ্যা ৩.৮ লক্ষে পৌঁছায়, যার মধ্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ ব্যক্তি জড়িত ছিল, যাদের মধ্যে ৯০% মহিলা।[30] এর মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলা ছিলেন ২০ শতাংশ। সংখ্যালঘু মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হত, এটা আর কোন রাজ্যে হতো না।[31,] ইকোনমিক টাইমস এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৮.৫ লক্ষেরও বেশি SHG গঠিত হয়েছে, যা NABARD-এর SHG-Bank Linkage Programme এবং Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY)-এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে।[32] SGSY ছিল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত একটি স্বনিযুক্তি কর্মসূচি, যা দরিদ্রদের জন্য অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছিল। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে SHG গঠনে উৎসাহ দিয়েছিল।

৭। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থান সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ২০০৯ সালে একটি নির্দেশিকা জারি করে, যা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রকল্পের বিষয়ে সরকারি দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরে।[33] সরকার মসজিদ, ঈদগাহ ও মাজারগুলোর সুরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ধর্মীয় স্থানগুলোর জবরদখল এবং অনধিকার প্রবেশ রোধে সরকার সক্রিয় ভূমিকা পালন করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উঠে। সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন সহ স্থানীয় প্রশাসন ও পঞ্চায়েত

---

[29] CPI (M) Campaign Material, Left Front Government & The Development of Muslim Minorities in West Bengal, West Bengal Assembly Election, April-May 2011, https://cpim.org/wp-content/uploads/old/documents/2011-minority.development_wb.pdf (accessed on 13.09.2024)

[30] Thirty Years of West Bengal Left Front Govt. September 9, 2009. https://cpim.org/thirty-years-west-bengal-left-front-govt/ (accessed on 10.09.2024)

[31] হক, সেখ সাইদুল, (২৮ এপ্রিল, ২০২৩), রাজ্যে বাম জমানায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং গ্রাম বাংলার সংখ্যালঘু জনগণ, দেশহিতৈষী।

[32] Ray, Atmadip (13 July, 2009), Multinational consultant for SHGs in West Bengal, The Economic Times. https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/multinational-consultant-for-shgs-in-west-bengal/articleshow/4772502.cms (accessed on 04.08.2024)

[33] স্মারকলিপি, (৭ ই ডিসেম্বর, ২০০৯), সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার.

এর উপর উন্নয়ন কাজের তদারকির দায়ভার অর্পণ করা হয়েছিল। রাজারহাটে কৈখালী ভিআইপি রোডের উপর ৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক হজ হাউস নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে।

এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয় ১৯৮১ সালে, পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ অ্যাক্ট অনুসারে। অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাচ্ছিল, তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে এই সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। পাশাপাশি মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, দরগাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জন্য বোর্ডকে ক্ষমতাও দেওয়া হয়।

- **পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য তৃণমূল সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ ও তার বাস্তবায়ন**

মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু উন্নয়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে। ক্ষমতায় এসে তিনি দাবি করেন যে, বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের উন্নয়নে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অর্থনৈতিক সংকট এবং ঋণের বোঝার অজুহাতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর কথায় "I have been told repeatedly about the government's ailing financial health. But it is the fault of the previous government who had put an embargo on payment of all kinds of allowances as well as release of funds for implementing development projects due to shortage of funds. I will not allow my minority brothers and sisters to suffer for the misdeeds of others,"[34]

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সংখ্যালঘুদের জন্য একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা দেন, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। যেমন- (i) শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলছুট কমানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ নিগম এর মাধ্যমে ১২২ কোটি টাকা শিক্ষাবৃত্তির জন্য বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, (ii) সরকারি চাকরিতে পূর্ববর্তী সরকারের ১০% সংরক্ষণের সিদ্ধান্তটি আইনগত জটিলতায় আটকে থাকায় নতুনভাবে এটি বিধানসভায় উত্থাপন করার প্রতিশ্রুতি, (iii) আবাসন খাতে ৫০,০০০ সংখ্যালঘু হাউজিং সোসাইটি গঠনের পরিকল্পনা, যার মধ্যে ৫,০০০টি কোলকাতা পৌরসভার আওতায় থাকবে, (iv) স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে ৩৯টি উর্দু মাধ্যম স্কুল, ৩টি পলিটেকনিক, ৭,০০২টি আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ৭১৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা, (v) সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ সংস্থার মাধ্যমে ২১.৩৭ কোটি টাকার ঋণ

[34] Mamata boost to projects for minorities, (July 31, 2011), The Hindu, Kolkata. https://www.thehindu.com/news/national/mamata-boost-to-projects-for-minorities/article2309056.ece (accessed on 12.07.2024)

ও শিক্ষাবৃত্তির বিতরণ, (vi) সংখ্যালঘু যুবকদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি জন্য স্কিল-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং "এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক" তৈরির মাধ্যমে সংখ্যালঘু যুবকদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি, (vii) প্রতিটি জেলায় WBMDFC অফিস স্থাপন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের তদারকি।[35]

এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলোকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচির লক্ষ্য হলো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো রক্ষা করা। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিগুলি হল।[36] –

১। প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কর্মসূচি (PMJVK) বা বহু ক্ষেত্রীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প (MsDP)

এই কর্মসূচির লক্ষ্য সংখ্যালঘু প্রধান এলাকাগুলোর সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ (ACR) নির্মাণ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (AWC) স্থাপন, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র (HSC) নির্মাণ, স্যানিটেশন, পাকা রাস্তা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, কর্মতীর্থ মার্কেটিং হাব, আইটিআই ও পলিটেকনিক স্থাপন, সংখ্যালঘু ছাত্রাবাস ও সদ্ভাব মন্ডপ নির্মাণ করে। এছাড়াও MsDP-র আওতাভুক্ত নয় এমন ব্লকগুলোর উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সংযুক্ত সংখ্যালঘু উন্নয়ন কর্মসূচি (IMDP) চালু করে যার অধীনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পানীয় জলের অবকাঠামো উন্নয়নকেই মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পরিকাঠামো উন্নয়ন

কবরস্থান, মসজিদ, ঈদগাহ ও মাজারের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ এবং ধর্মীয় স্থানের নিরাপত্তা ও দখলদারিত্ব প্রতিরোধের জন্য প্রাচীর নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ওয়াকফ সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বিশেষত মুসলিম ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর জন্য বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে ইমামদের জন্য ২৫০০ টাকা এবং মোয়াজ্জিনদের জন্য ১৫০০ টাকা মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়াও হজ যাত্রায় উৎসাহ প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগ হজযাত্রীদের সমস্ত রকমের লজিস্টিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি উপদেষ্টা ও পরামর্শ মূলক সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

---

[35] Mamata boost to projects for minorities, (July 31, 2011), The Hindu, Kolkata. https://www.thehindu.com/news/national/mamata-boost-to-projects-for-minorities/article2309056.ece (accessed on 12.07.2024)

[36] Minority Affairs, Darjeeling, Govt. of West Bengal. https://darjeeling.gov.in/minority-affairs/#:~:text=Schemes%20of%20Directorate%20of%20Madrasah,in%20Class%20V%20to%20VIII (accessed on 11.03.2023)

৩। ঐক্যশ্রী স্কলারশিপ কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে সম্পূর্ণ রাজ্য বাজেট দ্বারা অর্থায়িত "ঐক্যশ্রী" - পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে তিনটি ধরণের স্কলারশিপ প্রদান করা হয়:

- প্রাক-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ: (ক্লাস-I থেকে ক্লাস-X পর্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য) – অর্থসাহায্যের পরিমাণ ১১০০ টাকা থেকে ১১,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- উত্তর-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ: (ক্লাস-XI থেকে পিএইচডি স্তর পর্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য) – অর্থসাহায্যের পরিমাণ ৭৭০০ টাকা থেকে ১৬,৫০০ টাকা পর্যন্ত।
- মেধা ও প্রয়োজনভিত্তিক স্কলারশিপ: (প্রযুক্তিগত ও পেশাগত কোর্সের জন্য) – অর্থসাহায্যের পরিমাণ ২২,০০০ টাকা থেকে ৩৩,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- এছাড়াও রয়েছে ট্যালেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রামের অধীনে উত্তর-ম্যাট্রিক স্টাইপেন্ড: ২৫৫০ টাকা থেকে ৪৯০০ টাকা পর্যন্ত স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়।
- স্বামী বিবেকানন্দ মেধা ও প্রয়োজনভিত্তিক স্কলারশিপ: মেধাবী সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য যারা বর্তমান বছরে ৭৫% বা তার বেশি নম্বর অর্জন করে, তাদের জন্য প্রতি মাসে ১০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া হয়। বার্ষিক পারিবারিক আয় ২.৫ লাখ টাকার বেশি হওয়া চলবে না।

এই স্কলারশিপ প্রকল্প সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

৪। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ

অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ছাত্রীদের জন্য শৌচাগার ও পানীয় জল সরবরাহ, সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য স্কুল পোশাক ভাতা (৫ম-৮ম শ্রেণির জন্য ৬০০ টাকা), মাদ্রাসার ছাত্রীদের জন্য ৯ম-১২শ শ্রেণির জন্য বার্ষিক ১২০০ টাকা অনুদান, গবেষণাগার, পাঠ্যপুস্তক, গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার সুবিধার জন্য অনুদান। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীনে 2019 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬১৫ টি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪২৩টি হাই মাদ্রাসা, ৮৯টি জুনিয়র হাই মাদ্রাসা এবং বাকি ১০২টি সিনিয়র মাদ্রাসা। ৭৭টি সিনিয়র মাদ্রাসাকে ফাজিল (১০+২) মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়েছে। ২৬৫টি হাই মাদ্রাসাকে উচ্চ মাধ্যমিক (১০+২) মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়েছে। ১৮৩টি মাদ্রাসায় দক্ষতা

উন্নয়নের জন্য ভোকেশনাল কোর্স চালু রয়েছে। ৬১৪টি মাদ্রাসার মধ্যে ৪২৩টি হাই মাদ্রাসা, ৮৯টি জুনিয়র হাই মাদ্রাসা এবং বাকি ১০২টি সিনিয়র মাদ্রাসা। ৭৭টি সিনিয়র মাদ্রাসাকে ফাজিল (১০+২) মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়েছে। ২৬৫টি হাই মাদ্রাসাকে উচ্চ মাধ্যমিক (১০+২) মাদ্রাসায় উন্নীত করা হয়েছে। ১৮৩টি মাদ্রাসায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভোকেশনাল কোর্স চালু রয়েছে। মোট স্বীকৃত মাদ্রাসার মধ্যে ৬০টি কেবল মেয়েদের জন্য, ৫৫০টি সহশিক্ষা (কো-এডুকেশনাল), ৪টি শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য এবং ১৭টি উর্দু মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।[37]

৫। অসহায় পরিত্যক্ত সংখ্যালঘু নারীদের পুনর্বাসন কর্মসূচি (DMWRP- The Destitute Minority Women Rehabilitation Programme)

নিঃস্ব স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত ও দেখাশোনা করার জন্য কেউ নেই এমন সংখ্যালঘু মহিলাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য ১.২০ লাখ টাকা প্রদান করা হয় এই কর্মসূচীতে।

৬। সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থায়ন কর্পোরেশনের (WBMDFC) ঋণ কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থায়ন সংস্থা (WBMDFC) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, মুসলিম, পার্সি এবং শিখ) আত্ম সহায়ক গোষ্ঠীগুলির (SHGs) জন্য সাশ্রয়ী ঋণ প্রদান করে। ঋণের পরিমাণ সদস্য প্রতি ১৮,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে, যা প্রকল্প বা কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। এই ঋণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে, গোষ্ঠীগুলি তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে টেকসই উন্নতি আনতে এবং জীবিকার সুযোগ বাড়াতে পারে। এটি সমাজের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উন্নতি সাধনেও সহায়ক।[38] সরকারি প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের লোন গুলি হল-

- টার্ম লোন: সংখ্যালঘুদের জন্য সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ (৬-৮% সুদে)
- মাইক্রোফাইন্যান্স লোন: স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য সদস্য প্রতি ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ (৭% সুদে)
- নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচি: সংখ্যালঘু মহিলাদের যেকোন আয়বর্ধক কার্যকলাপ বা ব্যবসা যেমন ছোট ব্যবসা, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদির জন্য সদস্য প্রতি সর্বোচ্চ 40,000/- টাকা পর্যন্ত ৩% সুদে নরম ঋণ প্রদানের পাশাপাশি জন্য ঋণের পরিমাণের 50% ভর্তুকি, সর্বোচ্চ 15,000/- টাকা সাপেক্ষে, প্রতিটি সুবিধাভোগীকে দেওয়া হয়।
- শিক্ষা ঋণ: দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং বিদেশে পড়াশোনার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ (৩% সুদে)

---

[37] Scenario of Madrasah Education, West Bengal Board of Madrasha, Education https://wbbme.org/scenario-of-madrasah-education/ (accessed on 12.04.2023)

[38] Micro Finance (Directly to SHGs), West Bengal Minority and Development Corporation http://dls.wbmdfc.org:8086/loanapp2/ (accessed on 05.04.2023)

সারণিঃ ৩.১১ আর্থিক বছর অনুযায়ী ঋণ সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা (Financial Year-wise total number of loan beneficiaries)

Sl. No.	Financial Year	Number of Beneficiaries
01	2011-12	84,846
02	2012-13	90,023
03	2013-14	96285
04	2014-15	107576
05	2015-16	111,507
06	2016-17	115,118
07	2017-18	117,917
08	2018-19	119,872
09	2019-20	122,210
10	2020-21	123,177
11	2021-22	123,862
12	2022-23	124,439
13	2023-24	127,017

Source: West Bengal Minorities' Development and Finance Corporation.

https://www.wbmdfc.org/

চিত্রঃ ৩.৭.

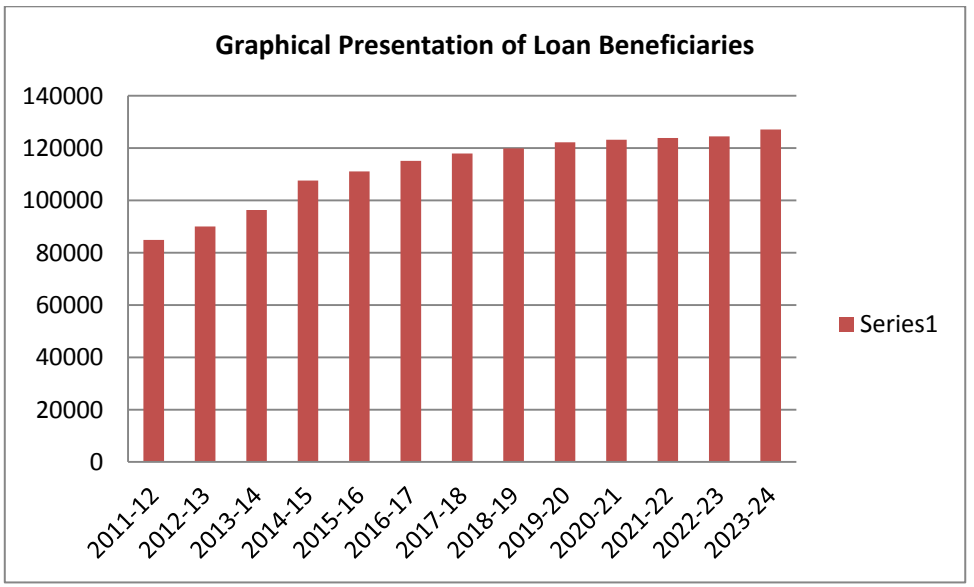

উৎসঃ সারণি ৩.১১ – এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

সারণিঃ ৩.১২ Financial Year Wise Total Number of Scholarship Beneficiaries

Sl. No.	Financial Year	Total No. of Beneficiaries
01	2011-12	1657323
02	2012-13	1768975
03	2013-14	2296197
04	2014-15	2549480
05	2015-16	2591642
06	2016-17	2799580
07	2017-18	3230964
08	2018-19	3350776
09	2019-20	3769173
10	2020-21	3923963
11	2021-22	4103801
12	2022-23	4310992
13	2023-24	4439141

Source: West Bengal Minorities' Development and Finance Corporation. https://www.wbmdfc.org/

চিত্রঃ ৩.৮. Graphical Presentation of Total Number of Scholarship Beneficiaries

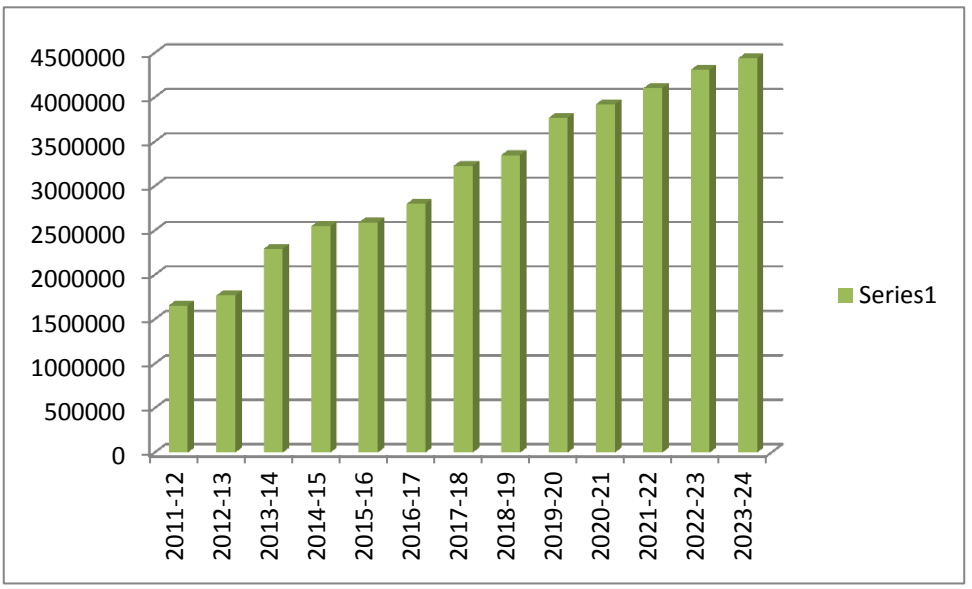

উৎসঃ সারণি ৩.১২ – এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত

উপরোক্ত প্রকল্প গুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের জমানায় আরও বেশ কিছু জনপ্রিয় ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রয়েছে যেগুলি মুসলিম ও অ-মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকেই সুবিধা পেয়ে থাকেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহিলাদের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আর্থিক প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। প্রকল্প গুলি হল- কন্যাশ্রী প্রকল্প, রুপশ্রী প্রকল্প, লক্ষ্মীর ভান্ডার, মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহায়তা (মাতৃমা প্রকল্প)। এছাড়াও খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, বাংলা আবাস যোজনা, সবুজ সাথী প্রকল্প, কৃষক বন্ধু প্রকল্প ও অন্যান্য আরও জনমোহিনী প্রকল্প রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকল্প নির্বাচন করে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভার অন্তর্গত ৬ নম্বর ওয়ার্ড ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড, এবং তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুপুর পশ্চিম পাড়া ও বাবুপুর মধ্যপাড়া গ্রাম থেকে মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর পরিসংখ্যান নিম্নোক্ত সারণি ৩.১২- এতে তুলে ধরা হল -

সারনিঃ ৩.১৩. সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুবিধাভোগী পরিসংখ্যান

সরকারি প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ধরণ	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট সুবিধা ভোগীর সংখ্যা	মোট সুবিধা ভোগীর সংখ্যা (%)
ঐক্যশ্রী প্রকল্প	শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা	২০৮	২০২	৯৭.১২
*কন্যাশ্রী	শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা	৯৮	৯৮	১০০
*লক্ষীর ভান্ডার	মাসিক আর্থিক সহায়তা	১৩০	১২২	৯৩.৮৫
*রূপশ্রী	বিবাহ অনুদান	৩৭	৩৭	১০০
*DMWRP	অসহায় পরিতক্তা সংখ্যালঘু মহিলা পুনর্বাসন কর্মসূচি	৪	৪	১০০
ঋণ সহায়তা প্রকল্প	ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিক্ষা খাতে স্বল্প সুদে অর্থ প্রদান	১৩	১৩	১০০
খাদ্য সাথী	খাদ্য সহায়তা	৩৮৮	৩৮৮	১০০
স্বাস্থ্য সাথী	বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা	৩৮৮	৩৩৮	৮৭.১১
বাংলা আবাস যোজনা	গৃহ নির্মাণে সহায়তা	১১০	৬২	৫৬.৩৬
কৃষক বন্ধু প্রকল্প	কৃষিকাজে সহায়তা	১৬৪	১৩৩	৮১.০৯
মানবিক পেনশন প্রকল্প	প্রতিবন্ধী সংখ্যালঘুদের আর্থিক সহায়তা	১০	১০	১০০

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপ থেকে নেওয়া)

[বিঃ দ্রঃ সারণি ৩.১৩- এ উল্লেখিত প্রকল্পগুলি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ বেশ কিছু যোগ্যতার মানদন্ড রয়েছে প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য। তাই এখানে যে সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে

তা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতাধীন এমন ব্যক্তির দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতে। যেমন স্টার (*) মার্ক করা প্রকল্প গুলির আওতাধীন কেবলমাত্র মহিলারাই]

সারনিঃ ৩.১৩ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বেশিরভাগ প্রকল্পেই উপকারভোগীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এবং সাফল্যের হারও বেশ ভালো। বিশেষ করে খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ঋণ সহায়তা প্রকল্প এবং মানবিক পেনশন প্রকল্পের মতো উদ্যোগগুলোতে ১০০% বা তার কাছাকাছি সুবিধাভোগীকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। যদিও স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে মোট ৩৮৮ জনের মধ্যে ৩৩৮ জনই সুবিধা পেয়েছে, যা ৮৭.১১% সাফল্য নির্দেশ করে, এটি অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় কিছুটা কম। অন্যদিকে, বাংলা আবাস যোজনার কার্যকারিতা তুলনামূলকভাবে কম, কারণ সেখানে মাত্র ৫৬.৩৬% সুবিধাভোগী প্রকৃত সহায়তা পেয়েছে। ঐক্যশ্রী ও লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে যথাক্রমে ৯৭.১২% ও ৯৩.৮৫% সুবিধাভোগী সহায়তা পেয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। কৃষক বন্ধু প্রকল্পেও ৮১.০৯% সাফল্য দেখা যায়, যা কৃষকদের সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সামগ্রিকভাবে, অধিকাংশ প্রকল্পই উপযুক্ত সংখ্যক সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে পেরেছে, তবে কিছু প্রকল্পে সীমিত কার্যকারিতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে গৃহ নির্মাণ সহায়তায় কম সুবিধাভোগী পাওয়া গেছে, যা সংশ্লিষ্ট নীতি ও বাস্তবায়ন কৌশলে উন্নতি আনার ইঙ্গিত দেয়।

সুতরাং, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে লোন প্রদান করা ছাড়াও প্রতিবছর সরকারি বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ ২০১১-২০২৪ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে যেখানে সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ₹ ৪৭২ কোটি, সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ₹ ৫,৫৩০.৬৫ কোটি, যা ২০১০-১১ সালের তুলনায় প্রায় ১১.৭ গুণ বেশি।[39] ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ রাজ্যের সংখ্যালঘু কল্যাণের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় ৩.৫ কোটি, যার অধিকাংশই মুসলিম। এই সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫,০০৪.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অপরদিকে, পুরো দেশের সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩,০৯৭.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অর্থাৎ, শুধু পশ্চিমবঙ্গ এককভাবে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংখ্যালঘুদের কল্যাণে ব্যয় করছে। সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম মনে করেন যে এই ধরনের বরাদ্দ কেবল দেখানোর জন্য। তিনি বলেন, "Funds of one department are used to meet the expenses of

[39] Budget allocation for minority affairs & madrasah education goes up, (February 09, 2024), The Statesman, https://www.thestatesman.com/bengal/budget-allocation-for-minority-affairs-madrasah-education-goes-up-1503268027.html (accessed on 24.03.2025)

another...there are examples of assets, like polytechnics and ITI colleges, created with the minority affairs department budget being handed over to NGOs and private players,"[40] অর্থাৎ এক বিভাগের তহবিল অন্য বিভাগের ব্যয় মেটাতে ব্যবহার করা হয়। এমনকি সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের বাজেট দিয়ে নির্মিত পলিটেকনিক ও আইটিআই কলেজের মতো সম্পদ এনজিও ও বেসরকারি খাতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন মহম্মদ সেলিম।

বস্তুতপক্ষে, সংখ্যালঘু উন্নয়ন যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের কাছে একটি গুরুত্বপুর্ন ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশের কাছেও তাই। ভারতেরই অন্যতম অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য - রাজনীতিতে বরাবরই সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের উপর বিশেষ নজর ছিল এবং আছে, তা সে পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার হোক কিম্বা বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। উভয় সরকারেরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ ও তার বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বামফ্রন্ট জমানায় যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা বর্তমানেও বজায় রয়েছে। নতুন কোনও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প লক্ষ করা যায় না কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যলঘুদের জন্য। তাই সাচার কমিটি রিপোর্ট (২০০৬) - এ মুসলিম সমাজের আর্থ সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার যে চিত্র উঠে আসে তার খুব একটা উন্নতি চোখে পড়ে না ২০১৬ সালে প্রকাশিত প্রতিচি ট্রাস্টের রিপোর্টেও। যদিও এই সমস্ত রিপোর্ট এর সত্যতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সময়কার ক্ষমতাসীন সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাছাড়া এই সমস্ত রিপোর্ট গুলো সমগ্র ভারতের মুসলিমদের অবস্থার কথা তুলে ধরেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভাবে প্রযোজ্য নয়। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার যে সময় ক্ষমতাসীন ছিল কিম্বা আছে তারা মনে করে তাদের সময়েই মুসলিমদের অবস্থার সবথেকে অগ্রগতি ঘটেছে। যেমন-সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমের অভিযোগ, "২০০১-এ সংখ্যালঘু উন্নয়নের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশে পয়লা নম্বরে। এখন তলানিতে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দফতরের মন্ত্রী। তিনি ঘুরছেন, সব দেখছেন। কিন্তু কাজের কাজ যে কিছু হচ্ছে না, সে দিকে ওঁর নজর নেই"! অর্থাৎ এখানে তিনি বর্তমান ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এর দিকে আঙুল তুলছেন। অপরদিকে মুখ্যমন্ত্রী একই সাথে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন তিনি ক্ষমতায় আসার পর পরই সংখ্যালঘু উন্নয়নের প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ করে ফেলেছেন।[41] যদিও সে দাবির বাস্তবতা নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা

[40] Datta, Romita, (May 01, 2023), Didi's gifts for minorities in West Bengal, India Today. https://www.indiatoday.in/magazine/up-front/story/20230501-didis-gifts-for-minorities-in-west-bengal-2362845-2023-04-21 (accessed on 21.03.2024)

[41] ভট্টাচার্য, সায়নী, (০১ জানুয়ারি ২০১৫), সংখ্যালঘু উন্নয়নের ফানুস ফুটো নবান্নেরই রিপোর্টে, আনন্দবাজার পত্রিকা। https://www.anandabazar.com/west-bengal/%E0%A6%B8-%E0%A6%96-%E0%A6%AF-%E0%A6%B2%E0%A6%98-%E0%A6%89%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B0-

বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন 'মুসলিমদের উন্নয়ন চাই স্বাস্থ্য-শিক্ষায়, সংখ্যায় নয়। বাংলার মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ'[42] অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের অবস্থা যে এখনও খারাপ সে দিকেই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। যদিও কিছু ইতিবাচক উদ্যোগও দেখা যায়। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী ইত্যাদি প্রকল্প মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে যা তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে। কিছু মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে, মূলধারার শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রদের অংশগ্রহণ ও চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা এখনো সীমিত। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে মুসলিম দের জন্য যে স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাকে বৈষম্যসাধনকারী শিক্ষা ব্যবস্থা নামে অভিহিত করে বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও লেখিকা মীরাতুন নাহার বলেন "শিশু বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের বীজ বপন করার অনিবার্য ফল হল ঐক্যবোধের ফাটল। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ধ্বংস ডেকে আনার এই প্রক্রিয়া শাসকদের শোষণ নীতির সহায়ক। কিন্তু দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনের পক্ষে বিপদজনক শাসক শ্রেণী চিরকালই বিভাজনের নীতিতে বিশ্বাসী। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কি সেই নীতি চালু রাখার মাধ্যম মাত্র? মানব - উন্নয়নের নামে মানব - বঞ্চনা সাধন"।[43]

সংখ্যালঘু সমস্যা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ বা নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের নয়, এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংখ্যালঘু সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যা বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। কিছু অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের প্রতি সরাসরি সহিংসতা চালানো হয়, আবার কোথাও বৈষম্যমূলক আইন ও নীতির মাধ্যমে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষায় কাজ করলেও, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তাছাড়া সংখ্যালঘু সমস্যা কেবলমাত্র কোনও একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, যা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশের উপরও লক্ষণীয়। যেমন বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু সমস্যা ভারতের কাছে একটি গুরুত্বপুর্ন ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের কাছে। এর পিছনে কতকগুলো মূল কারণ রয়েছে–এক, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান- যেখানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদশের সাথে একটা দীর্ঘ সীমানা জুড়ে রয়েছে দুই, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ (১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর যা বাংলাদেশ নামে

%E0%A6%AB-%E0%A6%A8-%E0%A6%B8-%E0%A6%AB-%E0%A6%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%AC-%E0%A6%A8-%E0%A6%A8-%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%B0-%E0%A6%AA-%E0%A6%B0-%E0%A6%9F-1.101724
(accessed on 12.04.2023)

[42] আনন্দবাজার পত্রিকা, (১৬ ই ডিসেম্বর, ২০২৪), 'মুসলিমদের স্বাস্থ্য-শিক্ষায় উন্নয়ন চাই, ৫ জন বাচ্চার কথা ভাবব কেন?' ফিরহাদের উল্টো সুর হুমায়ুনের। (https://bengali.abplive.com/district/tmc-mla-humayun-kabir-expresses-separate-opinion-on-minority-controversy-raised-by-firhad-hakim-1110798

[43] নাহার, মীরাতুন, (মার্চ, ২০১২), 'সংখ্যালঘু মানবী আমি', কলকাতা, গাংচিল, পৃ. পৃ. ২৬৮-২৬৯।

অভিহিত) একটা সময় অবিভক্ত বাংলারই অংশ ছিল। ফলস্বরূপ দুই বাংলার মধ্যে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত মেলবন্ধন রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলো

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানঃ

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সবাই একযোগে যুদ্ধ করে এই দেশ স্বাধীন করেছে। বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনো বৈষম্যমূলক সমাজের জন্য হয়নি। বাঙালী জাতি দ্বিজাতি তত্ত্বের বিস্তারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেনি। একদিকে ধর্মীয় বৈষম্য, অন্যদিকে জাতিগত বৈষম্য। এই বৈষম্য থেকে মুক্তি এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই তো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো।

এমন একটি রাষ্ট্রের জন্য এদেশের মানুষ লড়াই করেছে, যুদ্ধ করেছে, যে রাষ্ট্রটির জন্ম হলে সব নাগরিকের জন্য সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থাৎ সমতা এবং সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিত হবে এবং এটি হবে বাঙালির বাংলাদেশ-সে যে ধর্মের বা বর্ণেরই হোক না কেন। সব ধর্ম বর্ণের মানুষ মিলেই তো এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। সব বাঙালির ত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অর্জন করেছিল। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সংবিধানটি গৃহীত হলো সেই সংবিধানটি গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়েই কিন্তু চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করা হয়েছিল।[44]

কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর রাষ্ট্র ক্ষমতার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে এবং এই নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম আঘাতটি আসে ১৯৭৭ সালে, যখন পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। এর ১১ বছর পর ১৯৮৮ সালের জুনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হলে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের অপমৃত্যু ঘটে। এই দুটি ঘটনা সামরিক সরকারের আমলে হলেও পরবর্তীকালে কোনো গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রীয় আদর্শকে অসম্প্রদায়িক অবস্থানে ফিরিয়ে নেয়নি।[45]

---

[44] Govt. of Bangladesh, (1972), The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

[45] মোড়ল, শিশির, (১৪ই নভেম্বর, ২০২১), ৫০ বছরে দেশে ৭৫ লাখ হিন্দু কমেছে, ঢাকা, প্রথম আলো, https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AB-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-

ফলে বাংলাদেশের সংবিধান সকল ধর্মমত পালনের সমান অধিকার প্রদান করলেও ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের ৩৯ ও ৪১ নং অনুচ্ছেদে সব ধর্ম বিশ্বাস, পালন ও প্রচারের অধিকার সংরক্ষণ করে চিন্তা, চেতনা ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে; তবে সেটা, 'আইন, জনকল্যাণ ও নৈতিকতার সাপেক্ষে'। সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদ আরও নিশ্চিত করে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার অধিকার। যদিও সংবিধানে ব্যক্তির ধর্ম বিশ্বাস চিহ্নিতকরণের সরকারিভাবে কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরস্পরছেদী বৈশিষ্ট্য তাদেরকে কাঠামোগত বৈষম্যের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের সরকারিভাবে দেওয়া জাতীয় পরিচয়পত্রে ব্যক্তির ধর্ম পরিচয় উল্লেখ থাকে না। তবে ব্যক্তির নির্দিষ্ট ধারার নাম কিংবা পোশাক তার ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে জানিয়ে দিতে পারে। সংবিধানের যতই নিশ্চয়তা আর বিধান থাকুক, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থেই চলমান বৈষম্য, সহিংসতা এবং রাষ্ট্র ও ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা আধিপত্যের সম্মুখীন হন।

এছাড়া বাংলাদেশের শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষ ও মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকল্পিত সংঘাত, সহিংসতা ও দাঙ্গার ফলে এবং জোরপূর্বক উচ্ছেদের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশান্তরিত হওয়ার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার একটা বড় অস্ত্র হল তাদের সম্পত্তি রক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করা। সংখ্যালঘুদের জমি কেড়ে নেওয়া বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে কিছু বৈষম্যমূলক আইনের মাধ্যমে যার মধ্যে অর্পিত সম্পত্তি আইন (Vested Property Act) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই Vested Property Act হচ্ছে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকারের প্রণীত শত্রু সম্পত্তি আইনেরই আরেক রূপ যে আইন রাষ্ট্র কর্তৃক মূলত হিন্দুদের জমি ও বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দিত যদি তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের দেশান্তরিত হতো কিংবা যদি ধরে নেওয়া যেত যে তারা ভারতকে সমর্থন করেছিল।[46] বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেও ঐতিহাসিকভাবে Vested Property Act এর অস্তিত্ব 'বাংলাদেশি হিন্দুদের এমন নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে যাদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখা হয়'। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বাংলাদেশে Vested Property Act এর মাধ্যমে

%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81-%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87 (accessed on 03.02.2025)

[46] Akins, Harrison, (2020), Challenges to Religious Freedom in Bangladesh, USCIRF, Washington DC, p.p.1-5. https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Bangladesh%20Country%20Update.pdf (accessed on 03.01.2025)

জমি কেড়ে নেওয়ার কারণে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন পরিবার প্রায় তিন মিলিয়ন একর জমি হারিয়েছেন। এই সমস্ত জমির ৮৭ শতাংশ হচ্ছে হিন্দু মালিকানাধীন সম্পত্তি অথবা মন্দিরের জায়গা।[47]

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের দেশত্যাগের বিষয় নিয়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে গবেষণা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাত। কেনো হিন্দুরা ক্রমাগত বাংলাদেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন যে, "কোনো মানুষ নিজের মাতৃভূমি, নিজের বাড়িঘর, ভিটামাটি ছেড়ে অন্য দেশে যেতে চান না। অত্যাচারের কারণে বাংলাদেশের হিন্দুরা দেশ ছাড়ছেন, তাঁদের সংখ্যা দ্রুত কমছে। শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের কারণে অনেকে নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এটা বেশি ঘটেছে গ্রামের দুর্বল হিন্দুদের ক্ষেত্রে"।[48]

যার ফলে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমেই চলেছে। ১৯৭৪ সালে আদমশুমারি অনুসারে, স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা হল ৯৬,৭৩,০৪৮ যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩.৫ শতাংশ। এরপর বাংলাদেশে আরও পাঁচটি আদমশুমারি হয়েছে। ভারত বিভাগের পর ১৯৫১ সালে যে আদমশুমারি হয়েছিল তাতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে এটা নেমে এলো ১৩.৫ শতাংশে। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা নেমে আসে ৮.৫ শতাংশে। আর সর্বশেষ ২০২২ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দাঁড়িয়াছে ৭.৯৫ শতাংশে।[49] বাংলাদেশের এই সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর ক্রমহ্রাসমানতার চিত্র নিম্নে সারণিতে ৩.১৩-তে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণিঃ ৩.১৪ স্বাধীন বাংলাদেশের আদমশুমারিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শতকরা হার

সাল	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
১৯৭৪	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.২
১৯৮১	৮৬.৭	১২.১	০.৬	০.৩	০.৩
১৯৯১	৮৮.৩	১০.৫	০.৬	০.৩	০.৩
২০০১	৮৯.৭	৯.২	০.৭	০.৩	০.২
২০১১	৯০.৪	৮.৫	০.৬	০.৩	০.১
২০২২	৯১.০৪	৭.৯৫	০.৬১	০.৩	০.১২

(তথ্যসূত্রঃ ১৯৭৪-২০২২ সালে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো, আদমশুমারি ও গৃহগণনা থেকে সব তথ্য নেওয়া হয়েছে)

[47] Yasmin, Taslima, (2015), 'The enemy property laws in Bangladesh: Grabbing lands under the guise of legislation', Oxford University Commonwealth Law Journal.

[48] মোড়ল, শিশির, (১৪ই নভেম্বর, ২০২১), ৫০ বছরে দেশে ৭৫ লাখ হিন্দু কমেছে, প্রথম আলো, ঢাকা।

[49] বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো, (২০২২), 'আদমশুমারি ও গৃহগণনা', ঢাকা।

বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সার্বিক হার তুলে ধরার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন বাংলাদেশের হিন্দু অধ্যুষিত খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর শতকরা হার এখানে তুলে ধরা হল নিম্নের সারণি ৩.১৫ – তে, যেখানে দেখা যায় যে ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে খুলনা বিভাগের প্রায় সব জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার হ্রাস পেয়েছে। পুরো বিভাগের গড় হিন্দু জনসংখ্যার হার ১২.৯৫% থেকে ১১.৫২%-এ নেমে এসেছে, যা স্পষ্টভাবে একটি নিম্নগতির ইঙ্গিত দেয়। বিভাগের বিভিন্ন জেলায় হ্রাসের হার ভিন্ন হলেও একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় সবচেয়ে বেশি হ্রাস দেখা গেছে। নড়াইলে ২.৮৭%, খুলনায় ১.৯১%, বাগেরহাটে ১.৯৭% এবং সাতক্ষীরায় ২.৩৫% হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহের মতো জেলাগুলোতেও হ্রাস লক্ষ্য করা যায়, যদিও তুলনামূলকভাবে কম। মেহেরপুর একমাত্র জেলা যেখানে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে (১.০৫% থেকে ১.২০%)।

সারণিঃ ৩.১৫ খুলনা বিভাগের জেলা ভিত্তিক সংখ্যালঘু হিন্দু জনসখ্যার শতকরা হার (২০১১-২০২২)

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	২০১১ সালে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার	২০২২ সালে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার
১	খুলনা	২২.৬৭	২০.৭৬
২	বাগেরহাট	১৮.৩৫	১৬.৩৮
৩	নড়াইল	১৮.৬৫	১৫.৭৮
৪	মাগুরা	১৭.৯২	১৫.৬৯
৫	সাতক্ষীরা	১৭.৭	১৫.৩৫
৬	যশোর	১১.২২	১০.১৯
৭	ঝিনাইদহ	৯.৪৮	৮.৪০
৮	কুষ্টিয়া	২.৯২	২.৭৩
৯	চুয়াডাঙ্গা	২.৩৫	২.২৫
১০	মেহেরপুর	১.০৫	১.২০
	খুলনা বিভাগ	১২.৯৫	১১.৫২

(তথ্যসূত্রঃ ২০১১-২০২২ সালে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো, আদমশুমারি ও গৃহগণনা থেকে সব তথ্য নেওয়া হয়েছে)

উপরের দুটো সারণি (৩.১৪ এবং ৩.১৫) থেকে এটা স্পষ্টত যে, স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত হারে কমে চলেছে। যে কারণে হিন্দুরা বাংলাদেশে সবসময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আওয়ামী লীগ, জাসদ, বিএনপি ও জামায়াতের রাজনীতির করুণ শিকার হতে হয়েছে এই ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের। বিশেষ

করে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি ও জামায়াতের ভয়ানক নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে হিন্দুদের। আওয়ামী লীগের সময়ে হিন্দুরা ভালো থাকবেন, সাধারণভাবে এটা মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ১৯৯৬ ও ২০০৯-২০২১ পর্যন্ত সময়কাল পর্যালোচনা করলে প্রমাণ মেলে না যে হিন্দুরা নিরাপদে আছেন। গত ১০ বছরে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার অনেক ঘটনা ঘটেছে। কোনো ঘটনারই প্রকৃত তদন্ত-বিচার হয়নি। বিবিএসের ২০১১ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদনে দেশে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করেছে। প্রথমত; হিন্দুদের আউট মাইগ্রেশন হচ্ছে, অর্থাৎ হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে। দ্বিতীয়ত; হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট প্রজনন হার বা টোটাল ফার্টিলিটি রেট তুলনামূলকভাবে কম। অর্থাৎ হিন্দু দম্পতিরা তুলনামূলকভাবে কম সন্তান জন্ম দেন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী রানা দাশগুপ্ত বলেন, হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বহু হিন্দুর বাড়িঘর, মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া ও জমি দখলের ঘটনা ঘটেছে। রামু থেকে শুরু করে নড়াইলের সাম্প্রদায়িক ঘটনায় সরকারের নীরবতায় হিন্দুদের আস্থাহীনতা বাড়াচ্ছে।[50]

তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রশাসন ও সরকারকে সকল নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আরও কাজ করতে হবে এবং নাগরিক সমাজকেও আরও এগিয়ে আসতে হবে। অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে ধর্মীয় বহুত্ববাদের বিকাশ ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হন।

যেকোনো ধরনের সহিংসতা, বিভেদ মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ সরকার সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়তে শ্লোগান দিয়েছেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। এ শ্লোগানের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দেশের সাধারণ মানুষকে সব ধর্মের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। তাই বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন উদ্যোগের প্রতি আস্থাশীল। তাঁর এই দৃপ্ত পদক্ষেপেই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে আরো এগিয়ে যাবে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য চেতনার পাশাপাশি একটি দেশকে এগিয়ে যেতে হলে সেই দেশের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলোকে সকলের জন্য সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ

[50] আহমেদ, সাব্বির, (৩০ শে জুলাই, ২০২২), হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমা নিয়ে বিতর্ক, ই-পেপার সময়ের আলো। https://www.shomoyeralo.com/news/189070 (Accessed 13 May, 2024)।

করতে হবে যাতে তারা নিজেদেরকে সংখ্যাগুরুর থেকে বিচ্ছিন্ন না মনে করে। বস্তুতপক্ষে, এক্ষেত্রে শিক্ষা হল সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আমরা যদি বাংলাদেশের চির অবহেলিত দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি তাহলে শিক্ষাই হচ্ছে তার পূর্বশর্ত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনব্যাপী সংগ্রামের সাধনা ছিল, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা। তিনি বলেছেন- "আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন খাদ্য পায়, বস্ত্র পায়, বাসস্থান পায়, শিক্ষার সুযোগ পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়"। জাতির জীবনে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশের জনগণকে পথ প্রদর্শন করে গেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই জাতির জনক দেশের সার্বিক শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করা শিক্ষা কমিশনের সেই মূল্যবান রিপোর্ট-এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করার সুযোগ তিনি পাননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালো রাত্রিতে স্বাধীনতা বিরোধীচক্র ও তাদের দেশীয় এজেন্টরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শহিদ হবার পর পর্যায়ক্রমিকভাবে যারা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসে তারা এ বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগই গ্রহন করেননি। মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহনের পর শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মুজিব নির্দেশিত পথ অনুসরন করে।[51] যার ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে সাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ২৫.৯ শতাংশ। এবং ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার যখন ৩৫.৩ শতাংশ ছিল তখন 'সমন্বিত উপানুষ্ঠান শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)' নামে একটি বড়ো প্রকল্প সরকার হাতে নেয়। এরপর ২০০১ সালে সাক্ষরতা হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৭.৯ শতাংশ। এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার গিয়ে দাঁড়ায় ৫১.৭৭ শতাংশে।

বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে মোট সাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬ শতাংশ। বাংলাদেশের বিভাগগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হার সর্বোচ্চ ঢাকা বিভাগে ৭৭.৯ শতাংশ। এবং অন্যদিকে সর্বনিম্ন সাক্ষরতার হার ময়মনসিংহ বিভাগে ৬৭.৯ শতাংশ। আমরা যদি খুলনা বিভাগের দিকে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, এই বিভাগের মোট সাক্ষরতার হার ৭৫.২ শতাংশ। যার মধ্যে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ৭৭.১৬ শতাংশ এবং নারীর সাক্ষরতার হার ৭২.৯৫ শতাংশ।[52] এই খুলনা বিভাগের অন্তর্গত খুলনা জেলার সার্বিক সাক্ষরতার হার ৫৯.১ শতাংশ যা

---

[51] হাসিনা, শেখ, (২০১১), 'দারিদ্র্য দূরীকরণঃ কিছু চিন্তাভাবনা', ঢাকা, আগানী প্রকাশনী, পৃ.পৃ. ৩৪-৩৫।

[52] রহমান, এইচ এম মুশফিকুর, সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং বাংলাদেশ, ছাত্র সংবাদ, https://www.chhatrasangbadbd.com/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE,-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-

বাংলাদেশের জাতীয় সাক্ষরতার থেকে অনেকটাই কম। তবে বাংলাদেশের সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সার্বিক তথ্য পাওয়া গেলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সাক্ষরতার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। খুলনা জেলার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান। শিক্ষা ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের অবস্থান সম্পর্কে কোনও সরকারি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কোনও উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ না থাকার কারণে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তবে বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়া এটা প্রমাণ করে যে সেখানে তারা ভালো নেই। তাই তারা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতে এসে তারা কেমন আছেন সে ব্যাপারে আমার গবেষণা সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণঃ

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক অবস্থান নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই গবেষণাটি এক অনন্য তুলনামূলক পরিসর তৈরি করেছে, যেখানে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিতরে সংখ্যালঘুত্বের বহুমাত্রিক রূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের জীবন, অভিজ্ঞতা, সুযোগ ও বঞ্চনার পরিসর নানা দিক থেকে একে অপরের প্রতিচ্ছবি, আবার কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন পথের ধারক। কেননা দুটি দেশের রাষ্ট্র কাঠামোর পার্থক্য এই দুই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে দুটি ভিন্ন পথেই পরিচালিত করেছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বসবাস করে, যেখানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত। ফলে তাদের সংখ্যালঘু সত্তা শুধুমাত্র সামাজিক পর্যায়ে নয়, বরং সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও একধরনের কাঠামোগত প্রান্তিকতা তৈরি করে। বিশেষ করে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জমি, মন্দির ইত্যাদি বহুবার দখল, ধ্বংস ও রাষ্ট্রীয় অবহেলার শিকার হয়েছে। বিশেষত 'শত্রু সম্পত্তি' আইনের মাধ্যমে বহু হিন্দু পরিবার তাদের জমি ও ঘরবাড়ি হারায়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অবস্থান করায় ভারতের সংবিধানিক কাঠামো ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা হলেও সংখ্যালঘু সুরক্ষার উপাদান রয়ে গেছে। এখানে জমি ও সম্পত্তির দখলের প্রশ্ন ততটা প্রকট নয়। বাংলাদেশে হিন্দুরা প্রায়শই উৎসব-পার্বণে সীমিত আকারে অংশগ্রহণ করে এবং কখনও কখনও ধর্মীয় প্রকাশে আত্মসংযম পালন করে। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে হামলা বা প্রতিবন্ধকতা এর দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় উৎসব পালন ও সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশে অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। ভয়, সহিংসতা বা নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাংলাদেশে বহু হিন্দু পরিবার ভারত অভিমুখে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তাদেরকে সমাজে নিরাপত্তাহীন ও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হওয়ার অনুভূতি তৈরি করে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

(Accessed 13 May, 2024)

হননি। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটছে।

সুতরাং, গবেষণার পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উভয় ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী একটি 'নিয়ন্ত্রণকারী নৈতিকতা' নির্মাণ করে, যা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিয়ত শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে প্রান্তিক করে তোলে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যায় দৃশ্যমান হলেও রাজনৈতিক ভাষ্য, গণমাধ্যমের উপস্থাপনা ও প্রশাসনিক আচরণে তারা প্রায়ই 'অন্য' হিসেবে চিহ্নিত হন। অপরদিকে, বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় ঐতিহাসিকভাবেই ক্ষমতা কাঠামো থেকে দূরে অবস্থান করে এসেছে, এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংস পরিস্থিতিতে তারা বারবার নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। রাষ্ট্রীয় নীতির কার্যকারিতার দিক থেকেও উভয় দেশের সংখ্যালঘুরা একধরনের 'নৈতিক প্রতিশ্রুতির ফাঁদে' আবদ্ধ। ভারতীয় সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করলেও, বাস্তবে মুসলিম সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সাচার কমিটি-উত্তর যে চিত্র উঠে এসেছে, তা গভীর বৈষম্যকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশেও সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করা হলেও, হিন্দুদের বিরুদ্ধে জমি দখল, মন্দির ধ্বংস বা সহিংসতা প্রমাণ করে রাষ্ট্রের পক্ষপাতহীনতা অনেকাংশেই কাগজে সীমাবদ্ধ। সবচেয়ে গভীর ও উদ্বেগজনক দিক হলো সংখ্যালঘুদের মধ্যে 'অস্তিত্ব সংকট' এবং রাষ্ট্রীয় পরিসর থেকে প্রস্থান করার প্রবণতা। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ গত কয়েক দশকে দেশ ছেড়েছে, যা ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহ প্রতিফলন। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের দেশত্যাগের প্রবণতা না থাকলেও, তারা যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক নিঃসঙ্গতা ও আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে, তা তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতার পর বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ক্ষমতার কাঠামো এবং নাগরিক অধিকার চর্চার সূচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমেই একটি জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এই প্রতিনিধিত্ব কেবল প্রতীকি নয়, বরং তা বাস্তব ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক বাস্তবতা ও বঞ্চনার কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। সেই আলোচনার ধারাবাহিকতায় এই অধ্যায়ে দুই অঞ্চলের এই ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ধরণ, সীমাবদ্ধতা ও রূপান্তর পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস, প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিসংখ্যানগত পর্যালোচনা, সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো, এবং রাজনৈতিক দলের অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগতভাবে একটি বৃহৎ সংখ্যালঘু হলেও, তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সবসময় তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিফলিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর কৌশলগত হিসাব-নিকাশ, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা, এবং প্রার্থীতালিকায় প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া—সব কিছু মিলে মুসলিমদের রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির বাস্তব চিত্রকে জটিল করে তুলেছে। অপরদিকে, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুরা একধরনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সীমাবদ্ধতার মুখে পড়ে রাজনৈতিক পরিসরে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশ ও সমাজগুলিতে আধুনিক এবং স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠিত হয় প্রধানত ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রজ্যবাদী শক্তির বিরোধিতা ও জাতীয়তাবোধের আদর্শ বা ভাবধারার মধ্য দিয়ে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ১৪-১৫ আগস্ট বিভাজনের মাধ্যমে গঠিত হয় স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। অখন্ড ভারত বিভাজনের ফলে বিভাজিত হয় বাংলা এবং গঠিত হয় স্বাধীন ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) যা পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের অসরতাকে প্রমাণ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বমানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। নবগঠিত ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশকে জন্মলগ্ন থেকেই নানা জটিল সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এই সময় ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা[1], উদ্বাস্তু সমস্যা, ব্যাপক খাদ্য সঙ্কট ও বেকার সমস্যা[2], যা ভারত এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। এই রাজনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রান লাভের জন্য স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ১৯৫২ সাল থেকে ভারতে এবং ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গঃ জনবিন্যাস, সংখ্যালঘু মুসলিম নির্বাচনী রাজনীতির ইতিবৃত্ত

আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ১৪ তম (৮৮,৭৫২ বর্গ কিমি) রাজ্য হিসেবে এবং ৯,১২,৭৬,১১৫ জনসংখ্যা নিয়ে চতুর্থ বৃহত্তম জনবহুল রাজ্য হিসেবে অবস্থিত। ভারতে মোট সংখ্যালঘু মুসলিম জনসংখ্যার (১৭,২২,৪৫,১৫৮) মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ১৪.৩১ শতাংশ (২,৪৬,৫৪,৪২৫) অধিকার করে আছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার বিচারে এই সংখ্যা ২৭.০১ শতাংশ।[3] তবে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিমরা সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে সব জেলায় সমপর্যায়ভুক্ত নয়। জনবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে ২৫ শতাংশ বা তার অধিক মুসলিম জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলা হিসেবে মুর্শিদাবাদ (৪৭,০৭,৫৭৩) ৬৬.৮৮ শতাংশ, মালদা (২০,৪৫,১৫১) ৫১.২৭ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুর (১৫,০১,১৭০) ৪৯.৯২ শতাংশ, বীরভূম (১২,৯৮,০৫৪) ৩৭.০৬ শতাংশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২৯,০৩,০৭৫) ৩৫.৫৭ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনা (২৫,৮৪,৬৮৪) ২৫.৮২ শতাংশ, নদীয়া (১৩,৮২,৬৮২) শতাংশ, হাওড়া (১২,৭০,৬৪১) ২৬.২০ শতাংশ এবং কোচবিহারে (৭,২০,০৩৩) ২৬.৫৫ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার অবস্থান দেখা যায়। এছাড়া সব থেকে কম মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে দার্জিলিং জেলাতে ৫.৬৯ শতাংশ (১,০৫০৮৬)।[4] এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচিতির ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, পৃথক নির্বাচনী এলাকা, ওয়েটেজ প্রণালী এবং অবশেষে দ্বি-জাতীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশভাগ/পাকিস্তানের দাবিসহ এই জনগোষ্ঠীর অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি স্বাধীনতা পরবর্তী কালে একটি বলিষ্ঠ ও বিতর্কিত ঐতিহাসিক পটভূমিকা নির্মাণ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পরে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নিষিদ্ধ করে ভারত

[1] Chatterji, Joya, (1995), 'Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-1947', Cambridge, Cambridge University Press.

[2] Chatterji, Joya, (2007), 'The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967, Cambridge', Cambridge University Press.

[3] Govt. of India, (Ministry of Home Affairs), Census of India- 2011, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.

[4] Govt. of India, (Ministry of Home Affairs), (2011), Population by religious community, West Bengal-2011, Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.

সরকার। স্বাধীন ভারতে তারা 'ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ' নামে তাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করে। কেরালায় এই পার্টি মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও পশ্চিমবঙ্গে কোন রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।[5] পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা বরাবরই আস্থা রেখেছে মূল ধারার কোন না কোন রাজনৈতিক দলকে। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা প্রথমে কংগ্রেস (১৯৫২-১৯৭৭), তারপর বামফ্রন্ট (১৯৭৭-২০১১) এবং পরবর্তী সময়ে তারা তৃণমূল কংগ্রেসকে (২০১১---) সমর্থন করে, যা পর্যালোচনা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুসলিম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেস স্টাডি করার মধ্য দিয়ে। মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন কেস স্টাডি হিসেবে নিয়েছি তার যুক্তি সঙ্গতব্যাখ্যা গবেষণা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব

বাংলা বিভাজনের পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে ৩১শে মার্চ। এই বিধানসভা নির্বাচনে ২৪০ টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসন তপশিলি জাতি ও ১৪ টি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত এবং বাকি ১৮৬ টি আসন ছিল সাধারণের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত কোন ব্যবস্থা ভারতের সংবিধানে উল্লেখ নেই। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে সাধারণ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে ১২টি রাজনৈতিক দলের ৭৬০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং স্বতন্ত্র ৬১৪ জন প্রার্থীসহ মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৭৪ জন। এই নির্বাচনে ১২ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৬টি রাজনৈতিক দল ৩০ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছিল এবং স্বতন্ত্র ৬১৪ জনের মধ্যে ৫৪ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। সর্বমোট ১৩৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৪ জন যা মোট প্রার্থীর ৬.১১ শতাংশ।[6]

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মনোনয়ন দিয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ২৩৬ একজন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল ১৯ জন প্রার্থীর ৮.০৫ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি (KMPP) ০৫ জনকে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) ০৩ জনকে এবং হিন্দু মহাসভা (HM), সমাজতান্ত্রিক দল (SOC), ফরওয়ার্ড ব্লক মার্কসবাদী (FBM) একজন করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছিল।[7]

১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দলের

[5] দত্ত, মিলন, (২০২০), কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান, কলকাতা, আমারবই ডটকম, পৃ.পৃ. ২৮-২৯।

[6] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p. 972.

[7] তদেব, পৃ.পৃ. ৩০৭-৩৩৪।

প্রতিনিধিত্ব না করে, এখানে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সার্বিকভাবে ১৯৫২ সালের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে ১৮ জন কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ০৩ জন জয়লাভ করেছেন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে মোট ০৭ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করে যার মধ্যে ০৫ জন কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে এবং ০২ জন স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন।[৪]

১৯৫২ সালের এই নির্বাচন ক্ষেত্রে দিকে নজর রাখলে দেখা যাবে ফারাক্কা কেন্দ্রে গিয়াসুদ্দিন (সংখ্যালঘু মুসলিম) কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে ৪৮.৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন এবং সৈয়দ আবুল হোসেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ১৯.৮৬ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছে। লালগোলা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে কাজীমালি মির্জা (সংখ্যালঘু মুসলিম) ৬৭.১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। এই কেন্দ্রে কৃষক মজদুর প্রজা পাটির প্রার্থী আব্দুর রাউফ(৪.৯৬ শতাংশ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সাজ্জাত আলী (২৫.৭৮ শতাংশ) সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হয়েছেন।

রানীনগর কেন্দ্র থেকে কাজী জয়নাল আবেদীন, জলঙ্গি থেকে এ.এম.এ জামান এবং হরিহরপাড়া কেন্দ্র এ. হামিদ হাজী প্রত্যেকে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে ৬১.৮৮ শতাংশ ৫৫.০৫ শতাংশ ও ৫৪.৮৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। এছাড়া সুতি এবং নওদা কেন্দ্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের লুৎফল হক ও মোহাম্মদ ইসরাইল কোন রাজনৈতিক দলের প্রতীকে না লড়ে স্বাধীনভাবে নির্বাচন অংশগ্রহণ করে ৩১.৫৬ শতাংশ ও ২৬.০৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। নওদা কেন্দ্রে আব্দুল লতিফ কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০.৬৭ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।

সাগরদিঘী ও ভরতপুর কেন্দ্রে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অনেকেই স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যেমন, আলিমুজ্জামান (১২.৫২ শতাংশ), এম হায়াতুল্লাহ (৪.২৫ শতাংশ), বদরুল আলম আবুল ফজল (১২.১৪ শতাংশ), খন্দকার নুর-ই-আশান (৪.৪৫ শতাংশ), মাসকুন্ডাল হোসেন (১৭.৩৯ শতাংশ) ও নাজরুল হক মিয়া (৩.৬১ শতাংশ) প্রত্যেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন। এখানে তাদের মুসলিম সম্প্রদায় ভিত্তিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের একত্রীকরণের দরকার ছিল তা ব্যর্থ হয় যার ফলে এই দুটি কেন্দ্র থেকে শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (১৫.৯৬ শতাংশ) এবং বিজয়েন্দ্র নারায়ণ রয় (৩৩.৭১ শতাংশ) কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন।

[৪] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 312-313.

সারণিঃ ৪.১ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	গিয়াসুদ্দিন	ফারাক্কা	কংগ্রেস	১১৪৬৩	৪৮.৩৮
২	লুৎফল হক	সুতি	স্বতন্ত্র	৯১৮৬	৩১.৫৬
৩	কাজীম আলী মির্জা	লালগোলা	কংগ্রেস	১৯৫১৪	৬৭.১৮
৪	কাজী জয়নাল আবেদীন	রানিনগর	কংগ্রেস	১৪৫২৪	৬১.৮৮
৫	এ.এম.এ জামান	জলঙ্গি	কংগ্রেস	১৪২৭৪	৫৫.০৫
৬	এ. হামিদ হাজী	হরিহরপাড়া	কংগ্রেস	১৬৬৩৫	৫৪.৮৯
৭	মোহাম্মদ ইসরাইল	নওদা	স্বতন্ত্র	৯৩৬৩	২৬.০৫

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৩১২-৩১৩। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভায় নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৩৮.৯৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৫০টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সদস্য হিসেবে ডঃ রফিউদ্দিন আহমেদ কৃষি ও সহযোগী দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী এবং জনাব আব্দুস শোকুর কৃষি, পশুপালন ও বন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[9] প্রথম মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সদস্যদের মধ্যে মাত্র দুইজন মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন।

১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৫৭'র নির্বাচনী ও কংগ্রেস সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হন। এই নির্বাচনে বিধানসভা আসন সংখ্যা ২৪০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫৬ টি যার মধ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য যথাক্রমে ৪৩ ও ১৫ টি আসন সংরক্ষিত এবং সাধারণের জন্য থাকে ১৯৮ টি আসন। ১৯৫৭ এর বিধানসভা নির্বাচনে ১০ টি রাজনৈতিক দলের ৫১৭ জন এবং স্বতন্ত্র ৪১৮ জন প্রার্থীসহ মোট ৯৩৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই নির্বাচনে ১০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ০৪ টি রাজনৈতিক দল ৩৯ জন(৭.৫৪%) ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ৫৬ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। দ্বিতীয় নির্বাচনে ৯৩৫ জন

[9] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 915-916.

প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ৯৫ জন যা মোট প্রার্থীর ১০.১৬ শতাংশ। ১৯৫৭ এর নির্বাচনেও কংগ্রেসের সর্বাধিক ২৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ২৮ জন(১১.১৫%)। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সি.পি.আই এর ০৬ জন (৫.৮২%), পি.এস.পি ০৪ (৫.৯৭%) এবং ডব্লিউ.পি.আই ০১ (১০০%) সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছিল।[10]

প্রথম নির্বাচনের থেকে দ্বিতীয় নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সংখ্যালঘু মুসলিমরা এই নির্বাচনেও যে কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রেখেছিল নির্বাচনী ফলাফল অনুধাবনে তা বলা যায়। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন এদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেছিলেন ১৯ জন, সি.পি.আই পার্টি হিসেবে ০২ জন, ডব্লিউ.পি.আই প্রার্থী হিসেবে ০১ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ০৩ জন জয়লাভ করেছিলেন, সেখানে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ৮ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন যার মধ্যে ০৭ জন কংগ্রেস এবং ০১ জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী।[11]

১৯৫৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ফারাক্কা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু প্রার্থী মোঃ গিয়াসুদ্দিন কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ৪৬.৬৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তাঁর জয়ের ধারা বজায় রেখেছেন। আবার সাবিরুদ্দিন বিশ্বাস (৩৪.২৭%), নিজামুদ্দিন আহমেদ (১৩.৪০%) এবং মোঃ আজিজুর রহমান (৫.৬৭%) প্রত্যেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হয়েছিলেন। লালগোলা কেন্দ্রে সৈয়দ কাজিম আলী মির্জা কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে ৫০.০৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তাঁর জয়ের ধারা বজায় রেখেছিলেন, এই কেন্দ্রে আব্দুস সাত্তার স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে ৪৬.২৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এছাড়া জয়ের ধারা বজায় রাখেন হরিহরপাড়া কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী এ. হামিদ হাজী (৬৪.৪০%)। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের জাতিগত পরিচয় মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও জয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে পালন করেছে বলা যায়।

১৯৫২ এর নির্বাচনে সুতি ও নওদা কেন্দ্রের লুৎফল হক এবং মোঃ ইসরাইল স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করলেও এই নির্বাচনে তারা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে ৫১.৪৫ শতাংশ ও ৫৪.৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। জলঙ্গি কেন্দ্রে গোলাম সোলেমান কংগ্রেসের হয়ে ৩৫.৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। আবার সৈয়দ আব্দুল হোসেন স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৯.৯২ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এছাড়া ভগবানগোলা কেন্দ্রে হাফিজুর রহমান কাজী ৪২.৪৭ শতাংশ ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে একমাত্র রানীনগর কেন্দ্র থেকে বদরুদ্দীন সৈয়দ ৬৪.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন।

---

[10] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 341-343.

[11] তদেব, পৃ. ৯৭৩।

সারণিঃ ৪.২ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন	ফারাক্কা	কংগ্রেস	১০৮৩৫	৪৬.৬৪
২	লুৎফল হক	সুতি	কংগ্রেস	২৭০৬৩	৫১.৪৫
৩	কাজীম আলী মির্জা	লালগোলা	কংগ্রেস	১৫৩৩৯	৫০.০৯
৪	হাফিজুর রহমান কাজী	ভগবানগোলা	কংগ্রেস	১২৯৩২	৪২.৪৭
৫	বদরুদ্দীন সৈয়দ	রানীনগর	স্বতন্ত্র	২১৬৫৯	৬৪.৪৩
৬	গোলাম সোলেমান	জলঙ্গি	কংগ্রেস	১১৫৩৩	৩৫.৩১
৭	এ. হামিদ হাজী	হরিহরপাড়া	কংগ্রেস	২৪৫৬০	৬৪.৪০
৮	মোঃ ইসরাইল	নওদা	কংগ্রেস	২৩৬৯৬	৫৪.৬৬

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৩৪১-৩৪৩। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৫৭ এর নির্বাচনে কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৪৬.২০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৫২ টি আসন জয়লাভ করেছিলেন। এছাড়া সি.পি.আই ৪৬ টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ৩৪.২৫%), পি.এস.পি ২১ টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ২৮.৭৩%), এফ.বি.এম ৮ টি (প্রাপ্ত ভোটের ২৯.৮১%) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৫ টি (প্রদত্ত ভোটের ২২.১৪%) আসনের জয়লাভ করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসেবে কংগ্রেস ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। যে মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে ডঃ রফিউদ্দিন আহমেদ কৃষি পশুপালন ও বন বিষয়ক দপ্তর এবং জনাব আব্দুস সাত্তার শ্রম দপ্তরে পূর্ণমন্ত্রী হয়েছিলেন। এছাড়া সৈয়দ কাজীম আলী মির্জা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং জনাব মোঃ জিয়াউল হক স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন।[12] দ্বিতীয় মন্ত্রিসভাতে দুজন সংখ্যালঘু সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে মোট চারজন সদস্য মন্ত্রী হয়েছিলেন।

১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৬২ এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। এই নির্বাচনে ১৪ টি রাজনৈতিক দলের ৬৬৬ জন এবং স্বাধীনভাবে ২৯১ জন প্রার্থীসহ মোট ৯৬১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই নির্বাচনে ১৪ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ০৭টি রাজনৈতিক দল ৫৭ জন (৮.৫৫%) ধর্মীয়

[12] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 916-917.

সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল এবং স্বাধীনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৪৯ জন (১৬.৬১%) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। সার্বিকভাবেই নির্বাচনে ৯৬১ জন প্রার্থীর মধ্যে মুসলিম প্রার্থী ছিল ১০৬ জন যা মোট প্রার্থীর ১১.০৩ শতাংশ। এই নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সর্বাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ৩২ জনকে (১২.৬৯%) মনোনয়ন দিয়েছিল কংগ্রেস। এছাড়া সি.পি.আই ১০ জন, পি.এস.পি ৬ জন, আর.এস.পি ও এস.ডব্লিউ.পি ০৩ জন, এস.বি.পি ০২ জন এবং ডব্লিউ.পি.আই ০১ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছিল। ১৯৬২ সালে নির্বাচিত সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮ জন, যার মধ্যে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ২০ জন জয়লাভ করেছিলেন। সিপিআই প্রার্থী হিসেবে ০৩ জন, আর.এস.পি, পি.এস.পি'র ০১ জন করে এবং স্বাধীন প্রার্থী হিসেবে ০৩ জন সংখ্যালঘু মুসলিম জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে ১৪ টি সাধারণ আসনের মধ্যে ০৭ জন সংখ্যালঘু মুসলিম জয়লাভ করেছিলেন। যার মধ্যে কংগ্রেসের ০৫ জন এবং ০২ জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী।[13] ১৯৫৭'র নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের একজন মুসলিম প্রার্থী বৃদ্ধি ঘটলেও মুর্শিদাবাদ জেলাতে একজন হ্রাস পেয়েছিল।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে দেখা যায় ফারাক্কা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে গিয়াসুদ্দিন ৪২.৩৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতি কেন্দ্রে লুৎফল হক কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে ৫২.৭১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন, আবার শিশ মোহাম্মদ আর.এস.পির প্রার্থী হওয়ায় ৪১.২৮ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে দুজনেরই একই জাতিগত পরিচয় (মুসলিম) হওয়া সত্ত্বেও জয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলা যায়। লালগোলা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে একই অবস্থান দেখা যায়, এখানে সৈয়দ কাজিম আলী মির্জা কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ৫৩.৫৭ শতাংশ ভোট পেয়ে তাঁর জয়ের ধারা বজায় রাখেন এবং মোঃ সাজ্জাদ আলী স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে ৪০.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

রানীনগর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী আজিজুর রহমানকে (১৮.০২%) পরাজিত করে সৈয়দ বদরুদ্দীন (৬৫.৩৬%) স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ের ধারা বজায় রাখেন। নওদা কেন্দ্র থেকে মোঃ ইসরাইল (৩৪.০২%) এবং হরিহরপাড়া কেন্দ্র থেকে আব্দুল লতিফ (৪৪.৭৩%) কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। জলঙ্গি কেন্দ্রে লক্ষণীয় যে ১৯৫৭'র নির্বাচনের জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী গোলাম সোলেমানকে (৩১.১৮%) পরাজিত করে আব্দুল বারী মোক্তার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ৪৯.১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন।

[13] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 366-368.

সারণিঃ ৪.৩ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন	ফারাক্কা	কংগ্রেস	১০২০৩	৪২.৩৪
২	লুৎফল হক	সুতি	কংগ্রেস	২৮৮৭৮	৫৪.৭১
৩	কাজীম আলী মির্জা	লালগোলা	কংগ্রেস	১৬৫০৬	৫৩.৫৭
৪	সৈয়দ বদরুদ্দীন	রানিনগর	স্বতন্ত্র	২৩৩৬০	৬৫.৩৬
৫	মোঃ ইসরাইল	নওদা	কংগ্রেস	১৭৬৭১	৩৪.০২
৬	আব্দুল লতিফ	হরিহরপাড়া	কংগ্রেস	২০৬৭৩	৪৪.৭৩
৭	আব্দুল বারী মোক্তার	জলঙ্গি	স্বতন্ত্র	১৫৮৪৭	৪৯.১৮

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৩৬৬-৩৬৮। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৬২'র নির্বাচনে কংগ্রেস তার প্রত্যাশিত জয়ধারা বজায় রাখে এবং ৪৭.৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৫৭ টি আসনের জয়লাভ করে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচিত হয়েছিল। এই নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলি সি.পি.আই ৫০ টি (২৪.৯৬%), ফরওয়ার্ড ব্লক ১৩ টি (৪.৬১%), আর.এস.পি ০৯ টি (২.৫৬%) আসলে জয়লাভ করে নিজেদের শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়া পি.এস.পি ০৫ টি (৪.৯৯%), জি.এল ০২ টি (০.৪০%), এল.এস.এস ০৪ টি (০.৭২%), এস.বি.পি ০১ টি আসলে জয়লাভ করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১১ টি (১০.৯৮%) আসলে জয়লাভ করেছিল।[14]

১৯৬২ সালে ১১ই মার্চ ড. বিধানচন্দ্র রায় টানা তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৩৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যে মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে জনাব এস.এম ফজলুর রহমান পশুপালন ও পুনর্বাসন দপ্তরের একমাত্র পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া সৈয়দ কাজিম আলী মির্জা (পাবলিক ওয়ার্কার্স), মোহাম্মদ জিয়াউল হক (স্থানীয় স্ব-শাসন ও পঞ্চায়েত), জনাব জয়নাল আবেদীন (স্বাস্থ্য) এবং শাকিলা খাতুন (উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন) দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যু হলে ৯ই জুলাই প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং তাঁর মন্ত্রিসভায় মুসলিম সদস্য অপরিবর্তিত থাকে।

[14] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p. 974.

১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিতে ১৯৬০'র দশক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানা সংকট তথা-ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬২), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫), হজরতবাল (১৯৬৪) ঘটনার পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের ভিড়, ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যু (১৯৬২) এবং সি.পি.আই ভেঙে সি.পি.আই.(এম) Communist Party of India (Maxist) গঠন; প্রভৃতি নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিধানসভা মোট আসন ২৫৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৮০ টিতে। যার মধ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত থাকে যথাক্রমে ৫৫ ও ১৬ টি আসন এবং সাধারনের আসন সংখ্যা ১৯৪ থেকে বেড়ে হয় ২০৯ টি।[15]

১৯৬৭'র নির্বাচনে ১৬ টি রাজনৈতিক দলের ৭৪৬ জন প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র ৩১২ জন প্রার্থীসহ মোট ১০৫৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যার মধ্যে ১০টি রাজনৈতিক দল ৫৯ জন (৭.৯০%) ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ৫২ জন (১৬.৬৬%) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। অর্থাৎ এই নির্বাচনে মোট ১০৫৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ১০৯ জন যা মোট প্রার্থীর ১০.৩০ শতাংশ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কংগ্রেস সর্বাধিক ৩০ জন (১০.৭১%) মুসলিম প্রার্থীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সি.পি.আই(এম) ও বাংলা কংগ্রেস প্রথম এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তাদের প্রার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ০৯ জন ও ০৬ জন। এছাড়া পি.এস.পি'র ০৩ জন, এস.ডব্লিউ.পি ০৩ জন, সি.পি.আই ০২ জন, এবং এস.ইউ.সি, আর.এস.পি, ডব্লিউ.পি.আই, এস.এস.পি একজন করে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

এই নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা হ্রাস পায়, এবং বামপন্থী দলগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৬৭'র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত মুসলিম প্রার্থী ছিল ৩৬ জন, যার মধ্যে কংগ্রেসের হয়ে ১৭ জন, সি.পি.আই(এম) ও বাংলা কংগ্রেসের ০৪ জন করে জয়লাভ করেছিল। এছাড়া পি.এস.পি ০২ জন, এস.ইউ.সি, আর.এস.পি, সি.পি.আই, ডব্লিউ.পি.আই ০১ জন করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ০৫ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্বাচনী ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায় ১০ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন যার মধ্যে কংগ্রেসের ৬ জন এবং আর.এস পি, সি.পি.আই(এম), বাংলা কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র ০১ জন করে সংখ্যালঘু প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন।[16]

---

[15] বর্মণ, রূপ কুমার, (২০১৯), 'জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক', কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস, পৃ.পৃ. ৮৭-৯০।

[16] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 388-416.

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ফারাক্কা কেন্দ্রে টি.এ.নুরন্নবী প্রথম বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে ৫৪.২৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালের নির্বাচনের স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থী হয়ে পরাজিত হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে। সুতি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দুজনেই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। আর.এস.পি প্রার্থী শিশ মোহাম্মদ ৫০.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থীকে (৪২.৮৬%) পরাজিত করে। জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে একমাত্র স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আব্দুল হক ৫৭.৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় ৩৪.৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। লালগোলা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুস সাত্তার ৬৪.৯৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন এবং সাজ্জাত আলী (২৪.১৯%) স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হয়েছিলেন।

সৈয়দ কাজীম আলী মির্জা কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ৪৯.২১ শতাংশ ভোট পেয়ে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই প্রথম কোন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে জয়ের ধারা বজায় রেখেছিলেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ নবাব জানি মির্জা (৩২.৯৩%) কে পরাজিত করে। জলঙ্গি এবং হরিহরপাড়া কেন্দ্র থেকে মোঃ আজিজুর রহমান এবং শামসুদ্দিন আহমেদ কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে ৩৬.৯৯ শতাংশ এবং ৪০.৫৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। এছাড়া নওদা কেন্দ্রে মোঃ ইসরাইল ও বেলডাঙা কেন্দ্রে আব্দুল লতিফ তাদের জয়ের ধারা বজায় রেখেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ৪৫.০৩ শতাংশ ও ৫৫.৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ডোমকল কেন্দ্র থেকে এই নির্বাচনে প্রথম সি.পি.আই(এম) প্রার্থী মোঃ আব্দুল বারী ৫৬.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল বারী বিশ্বাস ৩৬.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন।

সারণিঃ ৪.৪ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	টি.এ.নুরন্নবী	ফারাক্কা	বাংলা কংগ্রেস	১৮৮১৭	৫৪.২৮
২	শিশ মোহাম্মদ	সুতি	আর.এস.পি	২৮৯২৫	৫০.৭০
৩	আব্দুল হক	জঙ্গিপুর	স্বতন্ত্র	২৬৯৭৮	৫৭.৭৫
৪	আব্দুস সাত্তার	লালগোলা	কংগ্রেস	২৮৩০০	৬৪.৯৪
৫	সৈয়দ কাজীম আলী মির্জা	মুর্শিদাবাদ	কংগ্রেস	২১৮৪৩	৪৯.২১
৬	মোঃ আজিজুর রহমান	জলঙ্গি	কংগ্রেস	১৫৩৯২	৩৬.৯৯
৭	মোঃ আব্দুল বারী	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	২৬২৭৭	৫৬.৪৬
৮	মোঃ ইসরাইল	নওদা	কংগ্রেস	২৩৩৭৬	৪৫.০৩
৯	শামসুদ্দিন আহমেদ	হরিহরপাড়া	কংগ্রেস	১৭৫৯১	৪০.৫৯
১০	আব্দুল লতিফ	বেলডাঙা	কংগ্রেস	৩০১১৯	৫৫.৫২

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৩৯৩-৩৯৫। এই গ্রন্থ সূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত কারেছেন।

১৯৬৭ সালে নির্বাচনের পরে কংগ্রেস বিরোধী জোট হিসেবে CPI(M), RSP, SSP ও MFB নিয়ে গঠিত United Leftist Front(ULF) এবং B. Congress, CPI ও FB নিয়ে গঠিত People United Left Front(PULF) এই দুটি ফ্রন্ট মিলিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট(United Front) গঠন করেন। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি নেতৃত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার পথ চলা শুরু করে। এই সরকার ১৯ সদস্যবিশিষ্ট যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন তাতে একমাত্র সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসাবে শ্রী জাহাঙ্গীর কবির উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বন (Development Planning and Forest) বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার 'নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন' ও 'দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন' তৈরি করার সংকল্প নিয়ে সরকার গঠন করলেও এই সরকার সমস্যামুক্ত ছিলনা। সমস্যা আরও ঘনীভূত হয় ১৯৬৭ সালে ৬ই নভেম্বর ১৭ জন বিধায়ককে নিয়ে ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ যুক্ত সরকার থেকে তার সমর্থন তুলে নিয়ে নতুন দল Progressive Democratic Front (PDF) তৈরি করলে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে অজয় মুখার্জি নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে (২০ শে নভেম্বর ১৯৬৭ সালে) এবং ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ২১ শে নভেম্বর ১৯৬৭ সালে সরকার গঠন করেন। এই সরকার তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সালে পতন ঘটে এবং পশ্চিমবঙ্গের জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।[17] যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

১৯৬৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিধানসভা আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। এই মধ্যকালীন নির্বাচনের রায় যুক্তফ্রন্টের অনুকূলেই থেকে যায়। এই নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন (৩৩ টি আসনে জয়লাভ করেন) আর সি.পি.আই (এম) ৮০ টি আসন পেয়ে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। সি.পি.আই ত্রিশটি আসন পেয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল এবং কংগ্রেস মাত্র ৫৫ টি আসন পেয়েছিল যার ফলে কংগ্রেসের শক্তি দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। এই নির্বাচনে ২৩ টি রাজনৈতিক দলের ৯০৫ জন এবং স্বতন্ত্র ৮৫ জন প্রার্থী সহ মোট ৯৯১ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যার মধ্যে ১৭ টি রাজনৈতিক দল ১২৩ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র ৮ জন প্রার্থীসহ মোট ১৩১ জন(১৩.২১%) প্রার্থী ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে Progressive Muslim League (PML) সর্বাধিক ৩০ জন (৭৫%) মুসলিম প্রার্থীকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কংগ্রেস ২৭ জনকে, সি.পি.আই(এম) ১০ জন, বাংলা কংগ্রেস ০৫ জন এবং আই.এন.ডি.এফ ১৭ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল।

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ৩৫ জন সংখ্যালঘু মুসলিম নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরমধ্যে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে ১১ জন, সি.পি.আই(এম) ৬ জন, আই.এন.ডি.(ইউ.এফ) ০৪ জন এবং পি.এম.এল ও

[17] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 921-922.

সি.পি.আই'এর ০৩ জন করে জয়লাভ করেছিল। এছাড়া ০৬ টি রাজনৈতিক দলের একজন করে মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১০ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন, যার মধ্যে কংগ্রেসের ০৫ জন, পি.এম.এল ০২ জন এবং বাংলা কংগ্রেস, আর.এস.পি, স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী ০১ জন করে জয়লাভ করেছিলেন।[18]

১৯৬৯ সালে নির্বাচনী কেন্দ্র গুলির দিকে তাকালে দেখা যায় ফারাক্কা কেন্দ্রটি বাংলা কংগ্রেস তাদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়। বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ শাহজাদ হোসেন ৩০.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। ১৯৬৭ নির্বাচনে টি.এ. নুরন্নবী বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করলেও এই নির্বাচনে তিনি জনতা দলের প্রার্থী হয়ে মাত্র ২.৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। সুতি কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী মোঃ সোহরাব আলী ৪৮.২২ শতাংশ ভোট পেয়ে আর.এস.পি প্রার্থী শিশ মোহাম্মদকে (৪৭.৭৩%) পরাজিত করেছিলেন। ১৯৬৭'র নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে আব্দুল হক স্বাধীন নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন এবং এই নির্বাচনে তিনি আর.এস.পির প্রার্থী হিসেবে ৪৯.৭৬ শতাংশ ভোট পেয়ে তার জয় ধারা বজায় রেখেছিলেন। লালগোলা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুস সাত্তার ৫৭.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের ধারা ধরে রেখেছিলেন এবং ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের সৈয়দ কাজিম আলী মির্জা ও প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের এ.কে হাজিকুল আলম যথাক্রমে ৩০.২২ ও ৬.৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মোঃ ইদ্রিস আলী ৩৮.৭৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন এবং সৈয়দ কাজী মারি মির্জা দল পরিবর্তন করে ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের প্রার্থী (৩৩.৬৮%) হিসেবে পরাজিত হয়েছিলেন। জলঙ্গি কেন্দ্রে আজিজুর রহমান কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ৩৯.৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। ডোমকল কেন্দ্রে কংগ্রেসের একরামুল হক বিশ্বাস ৪১.৮৬ শতাংশ ভোট পেয়ে সি.পি.এম প্রার্থী মোঃ আব্দুল বারীকে (৪১.৪০%) পরাজিত করেছিলেন। নওদা ও হরিহরপাড়া কেন্দ্রে প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগের প্রার্থী নাসিরুদ্দিন খান ও আফতাবউদ্দিন আহমেদ যথাক্রমে ৩৯.৯০ ও ৫৩.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী মোঃ ইসরাইল (১৮.৭০%), সামসুদ্দিন আহমেদ (১৭.৪৯%) পরাজিত হয়েছিলেন। বেলডাঙা কেন্দ্রে একমাত্র স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ খুদা বক্স ৪৪.১১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল লতিফ ও আর.এস.পি প্রার্থী তিমির বরণ ভাদুড়ি যথাক্রমে ১১.৪৫ ও ৪২.৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এখানে জয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

[18] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 421-423.

সারণিঃ ৪.৫ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	শেখ শাহজাদ হোসেন	ফারাক্কা	বাংলা কংগ্রেস	১২৯৫১	৩০.৭০
২	মোঃ সোহরাব আলী	সুতি	কংগ্রেস	২৮২৫২	৪৮.২২
৩	আব্দুল হক	জঙ্গিপুর	আর.এস.পি	২২৩৬৮	৪৯.৭৬
৪	আব্দুস সাত্তার	লালগোলা	কংগ্রেস	২৫৪৪২	৫৭.৭০
৫	মোঃ ইদ্রিস আলী	মুর্শিদাবাদ	কংগ্রেস	১৬৯৭০	৩৮.৭৪
৬	আজিজুর রহমান	জলঙ্গি	কংগ্রেস	১৭৩৭৩	৩৯.৯৮
৭	একরামুল হক বিশ্বাস	ডোমকল	কংগ্রেস	২১২২৩	৪১.৮৬
৮	নাসিরুদ্দিন খান	নওদা	প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ	২২৫৩৮	৩৯.৯০
৯	আফতাবউদ্দিন আহমেদ	হরিহরপাড়া	প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ	২৭২৬৫	৫৩.৭০
১০	মোঃ খুদা বক্স	বেলডাঙা	স্বতন্ত্র	২৫৮৭৮	৪৪.১১

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৪২১-৪২৩। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৬৯ সালের নির্বাচনের পর ULF ও PULF জোট মিলিত হয়ে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে আব্দুল্লাহ রসুল (পরিবহন), গোলাম ইয়াজদানি (পাসপোর্ট, নাগরিক প্রতিরক্ষা), আব্দুল রেজ্জাক খান (ত্রাণ, সামাজিক কল্যাণ) মন্ত্রী ছিলেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের থেকে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হয়। এই শাসন ১৯৭১ সালে ১৫ ই মার্চ পর্যন্ত জারি ছিল এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে ২রা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৭১'র সাধারণ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই কঠিন যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে Congress (Ruling) ও Congress (Organisation) নামে দুটি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সংখ্যালঘু মুসলিম রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু

বামপন্থীদের পূর্বতন কর্মসূচি তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল এই নির্বাচনে। এই নির্বাচনে ২৩ টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ ১১৭৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮০ জন (১৫.২৮%) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম। যাদের মধ্যে সর্বাধিক মুসলিম লীগ ৫০ জন (১০০%), Congress (Ruling) ৩৯ জন (১৬.৩১%), সি.পি.আই(এম) ২৮ জন (১১.৬১), Congress (Organisation) ১৪ জন, সি.পি.আই ৮ জন, বাংলা কংগ্রেস, আর.এস.পি ০৬ জন করে মুসলিম প্রার্থীকে নির্বাচনের মনোনয়ন দিয়েছিলেন। এছাড়া স্বাধীন স্বতন্ত্র ১৮ জনকে এবং অন্যান্য পাঁচটি রাজনৈতিক দল যাদের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ১ থেকে ৪ জন করে। ১৯৭১ সালে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪১ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার ১৮ টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন সংখ্যালঘু মুসলিম, যাদের মধ্যে Congress (Ruling) ০৩ টি, মুসলিম লীগ ০৪ টি, সি পি.এম ০৩ টি এবং আর.এস.পি ০১ টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন।[19]

১৯৭১ সালের বহু আলোচিত মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনী ক্ষেত্রের দিকে নজর রাখলে দেখা যাবে ফারাক্কা কেন্দ্রে সি.পি.আই(এম) ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। এখানে সি.পি.আই(এম) প্রার্থী জেরাত আলী ৩৬.৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে মুসলিম লীগ প্রার্থী জোহাদ আহমেদকে (৩৪.৫৪%) পরাজিত করেছিলেন। সুতি কেন্দ্রে Congress (Ruling) প্রার্থী মোহাম্মদ সোহরাব আলী ৩৫.১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের ধারা অপরিবর্তিত রাখেন। জঙ্গিপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন রেখা মারাত্মক হওয়ায় Congress (Ruling) প্রার্থী আশরাফ হোসেনকে (২৩.২২) পরাজিত করে মুসলিম লীগ প্রার্থী বদরুদ্দিন আহমেদ ২৪.৭৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। লালগোলা এবং মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে Congress (Ruling) প্রার্থী হিসেবে আব্দুস সাত্তার ও মোঃ ইদ্রিস আলী যথাক্রমে ৩৯.৪৪ ও ২৬.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় লাভ করেছিলেন। ডোমকল ও ভরতপুর নির্বাচন ক্ষেত্রে থেকে সিপিএম প্রার্থী মোঃ আব্দুল বারফ (৩৭.৩৯%) ও খান মোহাম্মদ নুর আহসান (৩২.৯৩%) জয়লাভ করেছিল। এছাড়া ভগবানগোলা কেন্দ্রে মোঃ সামউন বিশ্বাস, নওদা থেকে খান নাসিরুদ্দিন এবং হরিহরপাড়া কেন্দ্রে আফতাবউদ্দিন আহমেদ মুসলিম লীগ পার্টি হিসেবে যথাক্রমে ৩০.৩৪, ৪৪.৯৯ এবং ৫৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন। বেলডাঙা কেন্দ্রে আর.এস.পি প্রার্থী তিমির বরণ ভাদুড়ী ৪০.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন।

[19] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 450-452.

সারণিঃ ৪.৬ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	জেরাত আলী	ফারাক্কা	সি.পি.আই(এম)	১৬৬৬২	৩৬.৩১
২	মোঃ আব্দুল বারফ	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	১৭৩৩৮	৩৭.৩৯
৩	খান মোহাম্মদ নুর আহসান	ভরতপুর	সি.পি.আই(এম)	১৩৭১৪	৩২.৯৩
৪	তিমির বরণ ভাদুড়ী	বেলডাঙা	আর.এস.পি	২১৮০৫	৪০.৭০
৫	বদরুদ্দিন আহমেদ	জঙ্গিপুর	মুসলিম লীগ	৯৭৭৯	২৪.৭৬
৬	মোঃ সামউন বিশ্বাস	ভগবানগোলা	মুসলিম লীগ	১১৬৪৮	৩০.৩৪
৭	খান নাসিরুদ্দিন	নওদা	মুসলিম লীগ	২২৭৮৩	৪৪.৯৯
৮	আফতাবউদ্দিন আহমেদ	হরিহরপাড়া	মুসলিম লীগ	২৬৩০১	৫৪
৯	মোহাম্মদ সোহরাব আলী	সুতি	কংগ্রেস(রুলিং)	১৯৫০৪	৩৫.১৮
১০	আব্দুস সাত্তার	লালগোলা	কংগ্রেস(রুলিং)	১৩৩৭৭	৩৯.৪৪
১১	মোঃ ইদ্রিস আলী	মুর্শিদাবাদ	কংগ্রেস(রুলিং)	১০৫৫৩	২৬.৪৪

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৪৫০-৪৫২। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৭১ সালে নির্বাচনে সি.পি.এম বৃহত্তম দল হিসেবে প্রদত্ত ভোটের ৩২.৮৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ১১৩ টি আসন জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে Congress (Ruling) প্রদত্ত ভোটের ২৯.১৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ১০৫ টি আসন জয়লাভ করেছিল। এছাড়া সি.পি.আই ১৩ টি, বাংলা কংগ্রেস ০৫ টি, এস.ইউ.সি ও মুসলিম লীগ ০৭ টি করে এবং অন্যান্য ১০ টি রাজনৈতিক দল ১ থেকে ০৩ টি করে আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ০৫ টি আসনের জয়লাভ করেছিল। এই নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি, ফলে অজয় মুখার্জি নেতৃত্বে B. Congress, Muslim League, Gorkha League, P. S. P, S.S.P, Congress Ruling একত্রিত হয়ে 'Democratic Coalition' সরকার গঠন করে, যেখানে C.P.I, F.B. এবং Congress Organisation বাইরে থেকে এই সরকারকে সমর্থন জানায়। অজয় মুখার্জি এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ২৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসাবে আব্দুস সাত্তার (ভূমি, ভূমি রাজস্ব এবং আফগারি), জয়নাল আবেদীন (স্বাস্থ্য এবং কৃষি উন্নয়ন), এ.বি.এ গনি খান চৌধুরী (সেচ এবং জলপথ), আব্দুর রউফ আনসারী (স্থানীয় স্বশাসন), এ.কে.এম হাসানুজ্জামান (বাণিজ্য ও শিল্প), আলহাজ নাসিরুদ্দিন খান (কৃষি) পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন এবং একমাত্র

রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মোঃ সামউন বিশ্বাস (কৃষি ও উন্নয়ন) মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন।[20] এই Coalition সরকার তিন মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। নানাবিধ অভ্যন্তরীণ জটিলতা ও স্বার্থের দ্বারা জর্জরিত সরকার থেকে ১৯৭১ সালে ২৯ শে জুন অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করায় পশ্চিমবঙ্গ আবার নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যায়।[21]

১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৭২ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলা কংগ্রেস মিশে যায় জাতীয় কংগ্রেস দলের সঙ্গে। এস.এস.পি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতাও কংগ্রেস দলে যোগদান করেন, এমনকি সি.পি আই কংগ্রেসের সাথে সরাসরি জোট গঠন করে। ফলে কংগ্রেস দল তার হারিয়ে যাওয়ার শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় সি.পি.আই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন বামজোট (C.P.I(M), R.S.P, M.F.B, S.U.C, B.B.C, W.P.I ও S.P ইত্যাদি) এই নির্বাচনে কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিল।[22] এই নির্বাচনে ২০ টি রাজনৈতিক দলের ৭১৭ জন এবং স্বতন্ত্র ৮৩ জন প্রার্থীসহ ৮০০ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যার মধ্যে ১২টি রাজনৈতিক দল ১০৬ জন মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং স্বতন্ত্র ৭ জন সহ মোট ১১৩ জন (১৪.১২%) প্রার্থী ছিলেন মুসলিম। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস সর্বাধিক ৩৯ জন (১৬.৩৮%) মুসলিমকে মনোনয়ন দিয়েছিল। সি. পি.আই(এম)-এর মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা ২৪ জন (১১.৫৩%), সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ২২ জনকে (৭৫.৮৬%) প্রার্থী করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য ৬ টি রাজনৈতিক দল ১ থেকে ৫ জন করে সংখ্যালঘু মুসলিমকে মনোনয়ন দিয়েছিল এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র হিসেবে ০৭ জন প্রার্থী ছিলেন মুসলিম।

১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে সর্বমোট ৩৯ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরমধ্যে কংগ্রেস ২৯ টি, সি.পি.এম ও আর.এস.পি ০২ টি, সি.পি.আই ০৩ টি এবং মুসলিম লীগ, এস.ইউ.সি ও স্বাধীন স্বতন্ত্র একজন করে মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে সাধারণ ১৬ টি আসনের মধ্যে ১১ টি আসলে মুসলিম প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। সি.পি.আই(এম), এস.ইউ.সি, মুসলিম লীগ প্রত্যেকে একটি করে আসন দখল করে। আর.এস.পি দখল করে দুটি আসন এবং ০৬ টি আসনে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করেন। নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর কংগ্রেস পুনরায় তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

---

[20] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 926-927.

[21] বর্মণ, রূপ কুমার, (২০১৯), 'জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক', কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস, পৃ. ৯৩।

[22] তদেব, পৃ.পৃ. ৯৩-৯৪।

সারণিঃ ৪.৭ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	হাবিবুর রহমান	জাঙ্গিপুর	কংগ্রেস	১৭০৩৫	৪০.৪৮
২	আব্দুস সাত্তার	লালগোলা	কংগ্রেস	২৪৪০৯	৫৫.২৭
৩	মোহম্মদ দেদার বাক্ষ	ভগবানগোলা	কংগ্রেস	২২০১৬	৫৯.০৪
৪	মোঃ ইদ্রিস আলী	মুর্শিদাবাদ	কংগ্রেস	২১৮৭১	৪৮.০১
৫	আব্দুল বারি বিশ্বাস	জলঙ্গি	কংগ্রেস	১৪৪৬৩	৩৯.২৬
৬	একরামুল হক বিশ্বাস	ডোমকল	কংগ্রেস	২২২৯৯	৪৬.০৩
৭	শিশ মহম্মদ	সুতি	আর.এস.পি	২৭০৮৫	৪৭.৬৫
৮	তিমির বরণ ভাদুড়ী	বেলডাঙা	আর.এস.পি	১৮০৮৪	৩৯.২৮
৯	জেরাত আলী	ফারাক্কা	সি.পি.আই(এম)	২০৭৮৭	৪২.৭৯
১০	নাসিরুদ্দিন খান	নওদা	মুসলিম লীগ	১৫৭৯২	৩৩.৪১
১১	আবু রাইহান বিশ্বাস	হরিহরপাড়া	এস.ইউ.সি	২১৩১৫	৪২.৪৫

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৪৮২-৪৮৪। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৪৯.০৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ২১৬ টি আসন দখল করে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট তার ক্ষমতার অবস্থান হারিয়ে ফেলেছিল এবং সি.পি.আই(এম) প্রদত্ত ভোটের ২৭.৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ১৪ টি আসন নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হন। এই নির্বাচনে সিপিআই ৩৫ টি (৮.৩৩%) আসন দখল করে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। এছাড়া আর.এস.পি ০৩ টি, কংগ্রেস অর্গানাইজেশন, জি.এল ০২ টি, ডব্লিউ.পি.আই এস.ইউ.সি, মুসলিম লীগ একটি করে আসনের জয় লাভ করে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ০৫ টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ শংকর রায় ১৯৭২ সালে ২০ শে মার্চ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রিসভায় মুসলিম সদস্য হিসেবে আব্দুস সাত্তার (কৃষি, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন), জয়নাল আবেদীন (সরকারি উদ্যোগ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, কর্পোরেশন এবং মৎস্য সম্পদ), এ.বি.এ গনি খান চৌধুরী (বিদ্যুৎ, সেচ জলপথ এবং পার্বত্য বিষয়ক) দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন। ড:

ফাজেল হক (পি.ডব্লিউ.ডি, স্বাস্থ্য, হোম উন্নয়ন ও পরিকল্পনা তথ্য এবং জনসংযোগ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এবং মোতাহের হোসেন (হোম, জুডিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং) -এর প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে জাতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রভাব বৃদ্ধি ঘটেছিল।[23]

১৯৭৭ সালের বিধানসভা সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের উত্থান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা স্থায়িত্ব প্রদান করেছিল। বাম দলগুলি (C.P.I(M), R.SP, R.C.P.I ও F.B ইত্যাদি) সংখ্যালঘু মুসলিমদের সফলভাবে নিজেদের অধীনে রাখতে সক্ষম হন। এই নির্বাচনে বিধানসভা আসন ২৮০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৯৪ টি, এর মধ্যে সংরক্ষিত তপশিলিজাতি ও উপজাতিদের জন্য যথাক্রমে ৫৯ ও ১৬ টি আসন এবং সাধারণের আসন সংখ্যা ২০৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৮ তে পৌঁছায়। এই নির্বাচনে ১৫ টি রাজনৈতিক দলের ১০০৩ জন প্রার্থী এবং সাথে নির্দল ৫৬৯ জন প্রার্থী সহ মোট ১৫৭২ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এর মধ্যে ১০ টি রাজনৈতিক দল ১৪৪ জন (১৪.৩৫%) এবং স্বাধীন নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে ৭০ জন (১২.৩০%) ছিলেন মুসলিম। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কংগ্রেস সর্বাধিক ৪৩ জন (১৪.৮২%) মুসলিমকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। সি.পি.আই(এম) ৩৪ জন (১৫.১৭%), মুসলিম লীগ ২৪ জন (৭৫%), জনতা দল ২৮ জন (৯.৬৮%) মুসলিমকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।[24]

১৯৭৭ সালে নির্বাচনের সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ৪১ জন। এর মধ্যে সি.পি.আই(এম) সর্বাধিক ২৩ টি, কংগ্রেস ১০ টি, সি.পি.আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগ, আর.এস.পি ০১ টি করে এবং স্বাধীন নির্দল ০৪ টি আসনে মুসলিম প্রার্থী জয় লাভ করেছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যাবে সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে ১৭ টি আসনের মধ্যে ১০ টিতে মুসলিম প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে সি.পি.আই(এম) ০৩ টি, আর.এস.পি ০১;টি, কংগ্রেস ০৫ টি এবং স্বাধীন নির্দল ০১ টি আসনে জয়লাভ করে।[25]

---

[23] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 925-930.

[24] তদেব, পৃ.পৃ. ৫০৩-৫৩৮।

[25] তদেব, পৃ.পৃ. ৫০৯-৫১১।

সারণিঃ ৪.৮ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	আবুল হাসনাত খান	ফারাক্কা	সি.পি.আই(এম)	১৪৮৩৬	৩৫.৯২
২	আতাহার রহমান	জলঙ্গি	সি.পি.আই(এম)	২৫১৫৯	৪১.৮৯
৩	মোঃ আব্দুল বারি	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৩৩০৮৪	৫৬.০৩
৪	তিমির বরণ ভাদুড়ী	বেলডাঙা	আর.এস.পি	৩১৩২০	৪৫.৬৩
৫	শেখ ইমাজউদ্দিন	হরিহরপাড়া	কংগ্রেস	১৪৯৬৪	২৬.৬০
৬	লুৎফল হক	ঔরঙ্গাবাদ	কংগ্রেস	২২৬৭৫	৪৪.৭৮
৭	মোহাম্মদ সোহরাব আলী	সুতি	কংগ্রেস	১৮৪৪২	৩৩.০০
৮	হাবিবুর রহমান	জাঙ্গিপুর	কংগ্রেস	২১৩৯৫	৪১.০৬
৯	আব্দুস সাত্তার	লালগোলা	কংগ্রেস	৩১১৪৪	৫৭.৭০
১০	কাজী হাফিজুর রহমান	ভগবানগোলা	স্বতন্ত্র	১৪২৬৬	৩১.৫৪

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৫০৯-৫১১। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটায়। এই নির্বাচনে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি C.P.I(M) ১৭৮ টি, R.S.P ২০ টি, Forward block ২৫ টি, R.C.P.I ০২ টি আসন দখল করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। কংগ্রেস মাত্র ২০ টি আসন পেয়ে এই নির্বাচনের প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় কংগ্রেস শাসনের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। বামফ্রন্টের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতি বসু নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালে ২১শে জুন ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম হিসেবে মোঃ আমিন 'পরিবহন দপ্তর', হাসিম আব্দুল হালিম 'আইন ও বিচার বিভাগের' পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন এবং মোঃ আব্দুল বারী 'প্রাথমিক শিক্ষা মধ্যশিক্ষা এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার' রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[26] বামফ্রন্টের প্রথম মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য ছিল মাত্র তিনজন, ফলে জাতীয় রাজনীতিতে তারা গুরুত্ব হারাতে থাকে।

[26] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 927-928.

১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৮২ সালে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। এই নির্বাচনে ১২ টি রাজনৈতিক দল ও স্বাধীন নির্দল সহ মোট ১২০৪ জন প্রার্থীর মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ১৫১ জন, যা মোট প্রার্থীর ১২.৫৪ শতাংশ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সিপিএম ৩৩ জন (১২.৫৪%), কংগ্রেস (ইন্দিরা) ৩১ জন (১২.১৯%) সর্বাধিক মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। ১৯৮২ সালে নির্বাচনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ জন নির্বাচিত হয়েছিল। এরমধ্যে সি.পি.আই(এম) পায় ২০ টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ০৩ টি, আর.এস.পি ০১টি অর্থাৎ বামফ্রন্টের হয়ে সম্মিলিতভাবে ২৪ জন মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিল। এছাড়া কংগ্রেস (ইন্দিরা) ১৭ টি, কংগ্রেস (সোসালিস্ট) ০২ টি, সি.পি.আই ০১ টি আসন দখলে রাখে।[27] এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে ১৭ টি আসনের মধ্যে মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করে ১০ টি আসনে। এর মধ্যে সি.পি!আই(এম) ০৩ টি, আর.এস.পি ০১ টি এবং কংগ্রেস (ইন্দিরা) ০৬ টি আসল দখল করে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিমরা পুরোপুরি বামমনস্ক হয়ে নির্বাচনে নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় জ্ঞাপন করলেও এই জেলাতে সংখ্যালঘু মুসলিম কংগ্রেসের উপর তাদের আস্থা রেখেছিল।

সারণিঃ ৪.৯ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	আবুল হাসনাত খান	ফারাক্কা	সি.পি.আই(এম)	২৯৭০২	৪৩.৩১
২	আতাহার রহমান	জলঙ্গি	সি.পি.আই(এম)	৫২১৭৫	৫২.১৯
৩	মোঃ আব্দুল বারি	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৫১৯৮৭	৫৩.৭৭
৪	শিশ মহম্মদ	সুতি	আর.এস.পি	৪০১৭৫	৫১.৭৬
৫	লুৎফল হক	ঔরঙ্গাবাদ	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৩৫৩৩৬	৪৬.৫৮
৬	হাবিবুর রহমান	জাঙ্গিপুর	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৩৪৩৫৮	৪৪.৩০
৭	আব্দুস সাত্তার	লালগোলা	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৪৬৫০০	৫৫.৪২
৮	কাজী হাফিজুর রহমান	ভগবানগোলা	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৩৬০৮৭	৪৫.৬৩
৯	শেখ ইমাজউদ্দিন	হরিহরপাড়া	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৩৪৭৪৫	৩৯.৪৮
১০	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	বেলডাঙা	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৫৫৪৫০	৫৬.৫০

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ. ৫৪৪-৫৪৬। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

[27] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 539-569.

১৯৮২ সালে নির্বাচনে বামফ্রন্ট আরো বেশি সাফল্য পায়। বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে সি.পি.আই(এম) ১৭৪ টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ২৮ টি, আর.এস পি ১৯ টি, সি.পি.আই ০৭ টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া কংগ্রেস (ইন্দিরা) ৪৯ টি, এস.ইউ সি দুটি, স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১১টি আসনে জয়লাভ করেছিল। ১৯৮২ সালের ২৬ শে মে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা নিয়ে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন। লক্ষণীয় এই মন্ত্রিসভাতে সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে সৈয়দ আবুল মনসুর হাবিবুল্লাহ 'আইন এবং বিচার বিষয়ক' দপ্তরে একমাত্র পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন। এছাড়া মোহাম্মদ আব্দুল বারী 'প্রাথমিক এবং মধ্যশিক্ষা', আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা 'সুন্দরবন উন্নয়ন' দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় মন্ত্রিসভাতেও নির্বাচিত সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্যদের মাত্র ৬.৬৬ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৮৭ সালের নির্বাচনে বামপন্থী দলগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটে এবং সংখ্যালঘু মুসলিমদের আরও বামমনস্ক করে তুলতে সক্ষম হন। এই নির্বাচনে ১১ টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ১৪৮৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এর মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯২ জন, যা মোট প্রার্থীর ১২.৮২ শতাংশ মাত্র। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কংগ্রেস ৩৯ জন (১৩.২৬%), সি.পি.আই(এম) ৩১ জন (১৪.৫৫%), মুসলিম লীগ ৩৩ জন (৯১.৬৬%), আর.এস.পি ৩ জন (১৩.০৪%), এস.ইউ.সি ৫ জন (১০.৮৬%) সংখ্যালঘু মুসলিমকে নির্বাচনী মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য ৬ টি রাজনৈতিক দলের মনোনীত মুসলিম প্রার্থী ছিল এক থেকে দুইজন করে।

১৯৮৭ সালের নির্বাচনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ৩৮ জন। যার মধ্যে সি.পি.আই(এম) সর্বাধিক ২৪ টি, কংগ্রেস ০৯ টি এবং সি.পি.আই, আর.এস.পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগ, স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রত্যেকে একটি করে আসনে মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিল। এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচন ক্ষেত্র করি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে সাধারণের ১৭ টি আশ্রয়ের মধ্যে ১২ টি আসনে মুসলিম প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। যার মধ্যে সি.পি.আই(এম) ০৫ টি, কংগ্রেস ০৪ টি, আর.এস.পি, সি.পি.আই এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী একটি করে সংখ্যালঘু মুসলিম আসন দখল করে।[28]

[28] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 570-603.

সারণিঃ ৪.১০ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	আবুল হাসনাত খান	ফারাক্কা	সি.পি.আই(এম)	৩৫২১৬	৪৩.১০
২	তোয়াব আলী	ঔরঙ্গাবাদ	সি.পি.আই(এম)	৪০৬৫৩	৪৭.৯৩
৩	আতাহার রহমান	জলঙ্গি	সি.পি.আই(এম)	৫৮৩৩৪	৫২.৮৩
৪	মোঃ আব্দুল বারি	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৫৮৪৭২	৫২.৬৭
৫	মোজাম্মেল হক	হরিহরপাড়া	সি.পি.আই(এম)	৩৮৫৯২	৩৮.৮৮
৬	শিশ মহম্মদ	সুতি	আর.এস.পি	৩৮৩২৯	৪৫.৪২
৭	সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা	কান্দি	সি.পি.আই	৪১৭৫৩	৪২.০১
৮	হাবিবুর রহমান	জাঙ্গিপুর	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৩৮৪৬৩	৪৫.৪৭
৯	আব্দুস সাত্তার	লালগোলা	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৪৫৩৪০	৪৯.০৫
১০	মান্নান হোসেন	মুর্শিদাবাদ	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৪১৮৭৮	৩৭.৯২
১১	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	বেলডাঙা	কংগ্রেস(ইন্দ্রিরা)	৪২২১৭	৪০.৩৮
১২	সৈয়দ নবাব জানি মীরজা	ভগবানগোলা	স্বতন্ত্র	৪৩৭৬৪	৪৯.৭৭

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ ৫৭৫-৫৭৭। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৮৭ সালের নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) প্রদত্ত ভোটের ৩৯.৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৮৭ টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়। বামপন্থী অন্যান্য দলগুলির মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক ২৬ টি, আর.এস.পি ১৮ টি, সি.পি আই ১১ টি আসন দখল করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৪১.৮৩ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৪০টি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ৩১ শে মার্চ জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম আব্দুল করিম মোল্লা 'আইন ও বিচার বিষয়ক', মোঃ আব্দুল বারী 'অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, প্রতিবন্ধী সামাজিক কল্যাণ এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক' দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী এবং সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা 'অসামরিক প্রতিরক্ষা', আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা 'সুন্দরবন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা' দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বামফ্রন্টের তৃতীয় মন্ত্রিসভায় চারজন মুসলিম মন্ত্রিত্ব পেলেও তারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৯১ সালের পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্বের অবস্থানঃ

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই নির্বাচনের ২৩ টি রাজনৈতিক দল এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ১২১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ২৩৬ জন যা মোট প্রার্থীর ১৯.৪৫ শতাংশ। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্বাধিক ৩৮ জন (১৩.৩৮%) মুসলিমকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল কংগ্রেস। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে সি.পি.আই(এম) ২৯ জন (১৩.৬%), আর.এস.পি ০৪ জন (১৭.৩৯%), ফরওয়ার্ড ব্লক ০৪ জন (১১.৭৬%), সি.পি.আই ও জনতা দল একজন করে মুসলিম প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল। সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ এই নির্বাচনের ২৭ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। জনতা পার্টি ১৭ জনকে এবং বি.এস.পি ১০ জন মুসলিমকে প্রার্থী করেছিল এছাড়া অন্যান্য ০৭ টি রাজনৈতিক দল ১ থেকে ৩ জন করে সংখ্যালঘু মুসলিমকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন ৪৩ জন। বামফ্রন্ট ৩১ টি (C.P.I(M) 22, F.B 04, R.S.P 03, C.P.I & J.D 01 টি) কংগ্রেস ১২ টি আসনে মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে ১৭ টি আসনের মধ্যে ১১ টিতে জয়লাভ করে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীরা। এরমধ্যে সি.পি.আই(এম) ০৬ টি, আর.এস.পি ০৩ টি এবং কংগ্রেস ০৩ টি আসনে জয়লাভ করে। সমগ্র রাজ্যের ন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সংখ্যালঘু মুসলিম নির্বাচনী রাজনীতিতে বামফ্রন্টের উপর আস্থা রাখে।

১৯৯১ সালে নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ফারাক্কা কেন্দ্রে সি.পি.আই(এম) প্রার্থী আবুল হাসনাত খান ৩৮.৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে টানা চতুর্থবার নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী মইনুল হককে (৩২.৪২%) পরাজিত করে। ঔরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে সি.পি.এম প্রার্থী তোয়াব আলী ৪১.৯৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের ধারা বজায় রেখেছিলেন। আর.এস.পি প্রার্থী শিশ মোহাম্মদ ৩৮.০৫ শতাংশ ভোট পেয়ে সুতি কেন্দ্র থেকে তৃতীয়বার জয়লাভ করেছিলেন। জঙ্গিপুর ও ভরতপুর কেন্দ্র থেকে আর.এস.পি প্রার্থী আব্দুল হক ও মোঃ ইদ্রিস যথাক্রমে ৪২.৮৮ ও ৫৪.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন, এবং কংগ্রেস প্রার্থী হাবিবুর রহমান (৩২.৮৯%), আব্দুল মালেক (২২.৯২%) পরাজিত হয়েছিলেন। ভগবানগোলা কেন্দ্রে সৈয়দ নবাব জানি মির্জা (৪৯.৮৯%), ডোমকল থেকে আনিসুর রহমান (৫৫.৯৭%), হরিহর পাড়া কেন্দ্রে মোজাম্মেল হক (৩৯.০৯%) প্রত্যেকের সি.পি.আই(এম) প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী

হিসেবে লালগোলা, বেলডাঙা ও নওদা কেন্দ্র থেকে আবু হেনা, নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং নাসিরুদ্দিন খান যথাক্রমে ৪৮.৪৭, ৪১.২০ এবং ৪৩.৭১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন।[29]

সারণিঃ ৪.১১ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	আবুল হাসনাত খান	ফারাক্কা	সি.পি.আই(এম)	৩৬৯৩৪	৩৮.৫৫
২	তোয়াব আলী	ঔরঙ্গাবাদ	সি.পি.আই(এম)	৪২৬৪২	৪১.৯৫
৩	সৈয়দ নবাব জানি মীরজা	ভগবানগোলা	সি.পি.আই(এম)	৪৮৫৬৮	৪৯.৮৯
৪	আনিসুর রহমান	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৬৭৫৩৫	৫৫.৯৭
৫	মোজাম্মেল হক	হরিহরপাড়া	সি.পি.আই(এম)	৪৪১৮৮	৩৯.০৯
৬	শিশ মহম্মদ	সুতি	আর.এস.পি	৩৬৪১৮	৩৮.০৫
৭	আব্দুল হক	জঙ্গিপুর	আর.এস.পি	৪০৪৮২	৪২.৮৮
৮	ইদ্রিস মহম্মদ	ভরতপুর	আর.এস.পি	৫৪৮৮০	৫৪.৭০
৯	আবু হেনা	লালগোলা	কংগ্রেস	৪৯৫৮৯	৪৮.৪৭
১০	নাসিরুদ্দিন খান	নওদা	কংগ্রেস	৫২২৮১	৪৩.৭১
১১	নুরুল ইসলাম চৌধুরী	বেলডাঙা	কংগ্রেস	৪৭৮০৪	৪১.২০

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ ৬০৯-৬১২। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) প্রদত্ত ভোটের ৩৬.৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৮৯ টি আসন জয়লাভ করে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচিত হয়েছিলেন। বামপন্থী অন্য দলগুলির মধ্যে আর.এস.পি ১৮ টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ২৯ টি, জে.ডি ০১ টি, সি.পি.আই ০৫ টি আসনে জয়লাভ করেছিল। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৩৫.১২ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৪৩ টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৪৬ জন সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা নিয়ে চতুর্থ বাম সরকার গঠন করেছিলেন। জ্যোতি

[29] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 604-639.

বসু তাঁর এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে পাঁচ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং একজনকে রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে ওমর আলী (ক্ষুদ্র সেচ), আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা (আইন), আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা (সুন্দরবন উন্নয়ন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ), মেহবুব জাহেদী (সংখ্যালঘু বিষয়ক, প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন), কলিমুদ্দিন শামস (কৃষি বিপণন) পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন এবং আনিসুর রহমান (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা, মাদ্রাসা এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক) রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

১৯৯৬ সালের নির্বাচন ছিল বামফ্রন্টের কাছে ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই। এই নির্বাচনে ১৪ টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ১৭১৫ জন প্রার্থী নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এরমধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ২৭১ জন যা মোট প্রার্থীর ১৫.৮০ শতাংশ। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বামফ্রন্ট ৪৭ জন, কংগ্রেস ৪২ জন, মুসলিম লীগ ১৭ জন মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থী ছিল ১২৯ জন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছিল ৪৩ জন, যার মধ্যে বামফ্রন্ট ২৪ টি, কংগ্রেস ১৮ টি এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র ০১ টি নির্বাচন ক্ষেত্রে জয়লাভ করেছিলেন। সংখ্যালঘু অধিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে ১৭ টি আসনের মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয় লাভ করে ১২ টি আসনে। এরমধ্যে সি.পি.আই(এম) ০৩ টি, আর.এস.পি ০১ টি, কংগ্রেস ০৬ টি এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র একজন মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন।[30]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় ফারাক্কা, ঔরঙ্গাবাদ, সুতি, জঙ্গিপুর, লালগোলা, ভগবানগোলা কেন্দ্রে মইনুল হক (৪৬.৪৪%), হুমায়ূন রেজা (৪৬.৫৫%), মোঃ সোহরাব (৪০.২৪%), হাবিবুর রহমান (৪৬.৩৬%), আবু হেনা (৫০.৪২%), আবু সুফিয়া সরকার (৪৮.০২%) প্রত্যেকে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেছিলেন। জঙ্গিপুর, ডোমকল, হরিহরপাড়া কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই(এম) প্রার্থী হিসেবে ইউনুস সরকার (৫৩.৩২%), আনিসুর রহমান (৫২.৩০%), মোজাম্মেল হক (৪৩.২১%) জয়লাভ করেছিলেন। বেলডাঙা নির্বাচনক্ষেত্র থেকে আর.এস.পি প্রার্থী তিমির বরুন ভাদুড়ি ৪৯.৫৮ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং একমাত্র স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোজাম্মেল হক (৩৫.১৪%) মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন।

[30] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 640-701.

সারণিঃ ৪.১২ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	মইনুল হক	ফারাক্কা	কংগ্রেস	৫৩৪৮০	৪৬.৪৪
২	হুমায়ূন রেজা	ঔরঙ্গাবাদ	কংগ্রেস	৫৭৪৮৫	৪৬.৫৫
৩	মোঃ সোহরাব	সুতি	কংগ্রেস	৪৬৮০০	৪০.২৪
৪	হাবিবুর রহমান	জঙ্গিপুর	কংগ্রেস	৫৮১৮১	৪৬.৩৬
৫	আবু হেনা	লালগোলা	কংগ্রেস	৬৪৩৩৭	৫০.৪২
৬	আবু সুফিয়া সরকার	ভগবানগোলা	কংগ্রেস	৫৮৮৬৫	৪৮.০২
৭	ইউনুস সরকার	জলঙ্গি	সি.পি.আই(এম)	৭৯৩৪৮	৫৩.৩২
৮	আনিসুর রহমান	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৭৭৭৩৬	৫২.৩০
৯	মোজাম্মেল হক	হরিহরপাড়া	সি.পি.আই(এম)	৫৯৮০৪	৪৩.২১
১০	তিমির বরুন ভাদুড়ি	বেলডাঙা	আর.এস.পি	৬৭৯৬৫	৪৯.৫৮
১১	ইদ্রিস মহম্মদ	ভরতপুর	আর.এস.পি	৫৮২৬৬	৫৩.৩৮
১২	মোজাম্মেল হক	মুর্শিদাবাদ	স্বাধীন স্বতন্ত্র	৫৪০৪৯	৩৫.১৪

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ ৬৫০-৬৫৪। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ১৯৬ টি আসলে পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক দলহিসেবে ক্ষমতাসীন হন। ১৯৯৬ সালের ২৬শে মে জ্যোতি বসু ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকালীন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৪৮ সদস্য বিশিষ্ট যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন সেখানে মাত্র চার জন সংখ্যালঘু মুসলিম মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে মোহাম্মদ আমিন 'সংখ্যালঘু বিষয়ক, ওয়াকফ ও উর্দু একাডেমী এবং হজ', আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা 'খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উদ্যান পালন এবং সুন্দরবন বিষয়ক', আনিসুর রহমান 'প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন' এবং কলিম উদ্দিন শামস 'খাদ্য সরবরাহকারী' অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। জ্যোতি বসুর এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু প্রতিনিধির হার ছিল মাত্র ৮.৩৩ শতাংশ যা সংখ্যালঘু মুসলিমদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ব্রাত্য করে রাখে।

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

২০০১ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নবনির্মিত মমতা ব্যানার্জির সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা বামফ্রন্ট প্রথম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এই নির্বাচনে ২৬ টি রাজনৈতিক দলের ৯৯৪ জন এবং ৬৬১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ১৬৫৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। যার মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ২৩৫ জন যা মোট প্রার্থীর ১৪.১৯ শতাংশ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সি.পি.আই(এম) ৩২ জন (১৫.৬৬%), কংগ্রেস এবং জাতীয় কংগ্রেস ১৭ জন করে, পি.ডি.এস ৩০ জন, বিজেপি ১১ জন মুসলিমকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল। এই নির্বাচনে প্রথম অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস ২৫ জন (১১.০৬%) মুসলিমকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য ১৪ টি রাজনৈতিক দলের মুসলিম প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সংখ্যা ছিল ১ থেকে ৬ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ৬২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল।

২০০১ সালের নির্বাচনের সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছিল ৩৯ জন যা ১৯৯৬ এর নির্বাচনের জয়ী প্রার্থীর থেকে চারজন হ্রাস পেয়েছিল। এই নির্বাচন অনুযায়ী মুসলিম প্রার্থীর মধ্যে বামফ্রন্ট ২৫ টি (C.P.I(M) 17, R.S.P & F.B 03, C.P.I & W.B.S.P 01), কংগ্রেস ১০ টি, তৃণমূল কংগ্রেস ০১ টি এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ০৩ টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন। এই নির্বাচনের সংখ্যালঘু মুসলিম অধিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে ১৭ টি আসনের মধ্যে সর্বাধিক ১২ টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন সংখ্যালঘু মুসলিম। যার মধ্যে বামফ্রন্ট ০৬ টি (C.P.I(M) 02, R.S.P 03, W.B.S.P 01), কংগ্রেস ০৪ টি এবং স্বতন্ত্র ০২ টি আসন দখল করে।

২০০১ সালের নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে ফারাক্কা, ঔরঙ্গাবাদ, লালগোলা, বেলডাঙা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী মইনুল হক, হুমায়ুন রেজা, আবু হেনা, গোলাম কিবরিয়া মিয়া যথাক্রমে ৫০.৫৪, ৪৫.১৫, ৫১.৯৫, ৫৫.৮২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের ধরা বজায় রেখেছিলেন, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সি.পি.আই(এম) প্রার্থী তারেকুল ইসলাম (৪০.৬৫%), নূর মোহাম্মদ (৪০.০৭%), জোহাফ আলী (৪৪.৩০%) কে পরাজিত করে। সুতি ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে আর.এস.পি প্রার্থী জানে আলম মিয়া (৩৮.৮৩%), আবুল হাসনাত (৪২.৭৮%) জয়ী হয়েছিলেন। এই দুই কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ সোহরাব (৩৪.৯৪%), হাবিবুর রহমান (২৫.১৮%) পরাজিত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ 'র নির্বাচনে দুজনেই কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেছিলেন, ফলে বলা যায় এই জয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নয় দলই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা ভরতপুর কেন্দ্রে আর.এস.পি প্রার্থী ইদ্রিস মোহাম্মদের (৪৭.৫০%) পুনর্জয় প্রমাণ করে। সি.পি.আই(এম) প্রার্থী ইউনুস আলী সরকার (৪৭.৮১%), আনিসুর রহমান সরকার (৫২.৮২%) যথাক্রমে জলঙ্গি ও ডোমকল কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন। ভগবানগোলা কেন্দ্র থেকে একমাত্র ডব্লিউ.বি.এস.পি প্রার্থী মুজিবুর রহমান ৪৩.৮৪ শতাংশ ভোট

পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু তাহের খান (৪৪.৪০%) ও নিয়ামত শেখ (৪৫.৬৫%) যথাক্রমে নওদা ও হরিহরপাড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।[31]

সারণিঃ ৪.১৩ পশ্চিমবঙ্গের ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	মইনুল হক	ফারাক্কা	কংগ্রেস	৫৭১৯৩	৫০.৫৪
২	হুমায়ুন রেজা	ঔরঙ্গাবাদ	কংগ্রেস	৫৫৩৬২	৪৫.১৫
৩	আবু হেনা	লালগোলা	কংগ্রেস	৬২০৩৪	৫১.৯৫
৪	গোলাম কিবরিয়া মিয়া	বেলডাঙা	কংগ্রেস	৬৪৫৯৭	৫৫.৮২
৫	জানে আলম মিয়া	সুতি	আর.এস.পি	৪৫৩৬৮	৩৮.৮৩
৬	আবুল হাসনাত	জঙ্গিপুর	আর.এস.পি	৪৯১৩২	৪২.৭৮
৭	ইদ্রিস মোহাম্মদ	ভরতপুর	আর.এস.পি	৫৫৬৬৭	৪৭.৫০
৮	ইউনুস আলী সরকার	জলঙ্গি	সি.পি.আই(এম)	৬৯২৮৮	৪৭.৮১
৯	আনিসুর রহমান সরকার	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৭৮১৫১	৫২.৮২
১০	মুজিবুর রহমান	ভগবানগোলা	ডব্লিউ.বি.এস.পি	৫১২৮৫	৪৩.৮৪
১১	আবু তাহের খান	নওদা	স্বতন্ত্র	৫৭৬১৩	৪৪.৪০
১২	নিয়ামত শেখ	হরিহরপাড়া	স্বতন্ত্র	৬২৯৫৯	৪৫.৬৫

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ ৭০৯-৭১১। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

২০০১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার জয়ের ধারা বজায় রাখেন এবং প্রদত্ত ভোটের ৪৭.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৯৯ টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছিলেন, যার মধ্যে সি.পি.আই(এম) ১৪৩ টি, সি.পি.আই (এম.এল) ২৫ টি, আর.এস.পি ১৭ টি, সি.পি.আই ০৬ টি, ডব্লিউ.বি.এস.পি ০৪ টি, ডি.এস.পি ০২ টি এবং এম.এফ.বি ০১ টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন। ২০০১ সালে নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৩০.৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬০ টি আসন দখল করেছিলেন, কংগ্রেস প্রাপ্ত ভোটের ৭.৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৬ টি আসন দখল করে। স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ০৯ টি আসলে জয়ী হয়েছিলেন।

[31] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 704-739.

জ্যোতি বসুর পর ২০০১ সালে নির্বাচনে বামফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৪৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে মোঃ সেলিম 'সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ, শহুরে কর্মকর্তাদের জন্য স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্প, যুব পরিষেবা এবং কারিগরি শিক্ষা', আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা 'ভূমি এবং ভূমি সংস্কার', আনিসুর রহমান 'প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন', হাফিজ আলম সায়রানি 'ত্রাণ' দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৬'র মন্ত্রিসভার মতো ২০০১ এর মন্ত্রিসভাতেও মাত্র চারজন মুসলিম সদস্য মন্ত্রী ছিলেন।

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

২০০৬ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রশ্নাতীতভাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন। এই নির্বাচনে সর্বাধিক ৩৪ টি রাজনৈতিক দলের ১১২৮ জন এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র ৫২৬ জন সহ মোট ১৬৫৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এরমধ্যে ১৭ টি রাজনৈতিক দলের ১৫৮ জন এবং স্বতন্ত্র ৫২ জন সহ মোট ২১০ জন ছিলেন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী যা মোট সদস্যের ১২.৬৯ শতাংশ মাত্র। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্বাধিক কংগ্রেস ৪৩ জন, তৃণমূল কংগ্রেস ৪২ জন, সি.পি.আই(এম) ৩২ জন, এস.পি ০৯ জন, বি এস.পি ০৭ জন, আর.এস.পি ০৪ জন, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩ জন মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য ১০ টি রাজনৈতিক দলের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ০১ থেকে ০৩ জন করে।

২০০৬ 'র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৪১ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে বামফ্রন্ট ৩২ টি, কংগ্রেস ০৭ টি, তৃণমূল কংগ্রেস ০২ টি নির্বাচনক্ষেত্রে মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংরক্ষিত দুটি আসন বাদে ১৭ টি আসনের মধ্যে ১২ টি আসনে জয়লাভ করে মুসলিম প্রার্থী। এরমধ্যে বামফ্রন্ট ০৯ টি (R.S.P-04, C.P.I(M)-04, W.B.S.P-01) আসনে জয়লাভ করে সমগ্র রাজ্যের ন্যায় এই জেলাতেও সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিজেদের অধীনে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে মাত্র ০৩ জন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন।

২০০৬ সালের নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ফারাক্কা ও লালগোলা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মইনুল হক (৪৯.০৫%) ও আবু হেনা (৪৯.২৪%) জয়ের ধারা বজায় রেখেছিলেন। ২০০১ সালে নওদা কেন্দ্র থেকে আবু তাহের খান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করলেও এই নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়ের ধারা বজায় রাখেন। সামশেরগঞ্জ থেকে তোয়াব আলী (৪৫.৯৯%), জলঙ্গী কেন্দ্রে ইউনুস সরকার (৫১.১৬%), ডোমকল কেন্দ্রে আনিসুর রহমান (৫১.৮৮%), হরিহরপাড়া থেকে ইনসার আলী বিশ্বাস (৪৫.১৪%) প্রত্যেকে সি.পি.আই(এম) প্রার্থী হিসেবে জয় পেয়েছিলেন। আর.এস.পি প্রার্থী জানে আলম মিয়া (৪৬.৯০%), আবুল হাসনাত (৪৮.৮৫%), মোহাম্মদ রাফাতুল্লাহ (৪৬.২৮%) এবং ইদ্রিস মোহাম্মদ (৪৯.৫৫%) যথাক্রমে সুতি, জঙ্গিপুর, বেলডাঙা এবং ভরতপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভগবানগোলা কেন্দ্রে চাঁদ মোহাম্মদ

W.B.S.P প্রার্থী হিসেবে ৪৬.৪৭ শতাংশ ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী আবু সুফিয়ান সরকারকে (৩৯.২৪%) পরাজিত করেছিলেন।[32]

সারণিঃ ৪.১৪ পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	তোয়াব আলী	সামশেরগঞ্জ	সি.পি.আই(এম)	৬৩৪০৭	৪৫.৯৯
২	ইউনুস সরকার	জলঙ্গী	সি.পি.আই(এম)	৮৪১০৯	৫১.১৬
৩	আনিসুর রহমান	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৮৬০৭৯	৫১.৮৮
৪	ইনসার আলী বিশ্বাস	হরিহরপাড়া	সি.পি.আই(এম)	৬৮৮৬২	৪৫.১৪
৫	জানে আলম মিয়া	সুতি	আর.এস.পি	৬১৬০৫	৪৬.৯০
৬	আবুল হাসনাত	জঙ্গিপুর	আর.এস.পি	৬১৫২৬	৪৮.৮৫
৭	মোহাম্মদ রাফাতুল্লাহ	বেলডাঙা	আর.এস.পি	৬৬৫২৭	৪৬.২৮
৮	ইদ্রিস মোহাম্মদ	ভরতপুর	আর.এস.পি	৬৩৬২১	৪৯.৫৫
৯	চাঁদ মোহাম্মদ	ভগবানগোলা	ডব্লিউ.বি.এস.পি	৬০৮৮৯	৪৬.৪৭
১০	মইনুল হক	ফারাক্কা	কংগ্রেস	৫৯৬৮২	৪৯.০৫
১১	আবু হেনা	লালগোলা	কংগ্রেস	৬৯৫৩৮	৪৯.২৪
১২	আবু তাহের খান	নওদা	কংগ্রেস	৭৪১৯২	৪৭.৯৭

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ ৭৫২-৭৫৬। এই গ্রন্থসূত্র থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

২০০৬ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট ২৩৫টি আসনে জয়লাভ করে কেবল তার শক্তি বৃদ্ধিই করেননি, বিরোধী পক্ষ হিসেবে কংগ্রেস (২১ টি) ও তৃণমূল কংগ্রেসকে (৩০টি) রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ২০০৬ সালে ১৮ই মে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা নিয়ে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিলেন। যে সরকারের সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে ০৫ জন মন্ত্রী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার', আনিসুর রহমান 'প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন', মুর্তাজা হোসেন 'কৃষি বিপণন এবং ত্রাণ' দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং আব্দুস সাত্তার 'সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং মাদ্রাসার শিক্ষা' ও আনোয়ারুল হক 'জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল' দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে

[32] Banerjee, Dilip, (2012), 'Election Recorder: A Analytical Reference', Kolkata, Star Publishing House, p.p. 740-780.

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে (১৯৭৭-২০১১) মন্ত্রিসভাতে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিদের খুব উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

দীর্ঘ শাসনে (১৯৭৭-২০১১) বামফ্রন্টের অপরাজেয় মনোভাব ২০০৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ইউ.পি.এ (United Progressive Alliance) সরকারের আমেরিকার সাথে 'অসামরিক পারমাণবিক চুক্তির' (২০০৭) বিরোধিতা করে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের জমি হারাতে থাকে। আবার "কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ" এই নীতি জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ফলে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে উর্বর কৃষি জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে বিতর্কও বামফ্রন্টকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে দেয়। ফলস্বরূপ ২০১১ সালের নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস জোট (কংগ্রেস ও এস.ইউ.সি) পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে।

২০১১ সালে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও সংরক্ষিত তপশিলি জাতি ও উপজাতির আসন বৃদ্ধি ঘটায় সাধারণ আসন ২১৮ থেকে কমে ২১০ টি হয়েছিল। এই নির্বাচনের ২৬ টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ১৭৯২ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এরমধ্যে রাজনৈতিক দল (১৯৬) ও স্বতন্ত্র (৬০) প্রার্থী সহ ২৫৬ জন ছিলেন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী যা মোট সদস্যের ১৪.২৮ শতাংশ মাত্র, যা পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা (২৭.০১%) তুলনায় অনেকটাই কম। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সি.পি.আই(এম) ৩৫ জন (১৬.৬০%), তৃণমূল কংগ্রেস ৩২ জন (১৪.১৫%), কংগ্রেস ২০ জন (৩১.২৫%), এস.ইউ.সি, বি.এস.পি, এস.ডি.পি ১০ জন, আর.এস.পি এফ.বি, বি.জে.পি ০৬ জন করে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য ১৩ টি রাজনৈতিক দলের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী ছিল ১-৪ জন। ২০১১ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক ৫৪ জন সংখ্যালঘু মুসলিম নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে বামফ্রন্ট পায় মাত্র ১৬ টি (C.P.I(M)-11, R.S.P & F.B-02, D.S.P -01) আসন, তৃণমূল কংগ্রেস জোট পায় ৩৭ টি (AITC- 22, I.N.C- 15), স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রার্থী ০১ টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন।

২০১১ সালে নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ফারাক্কা, লালগোলা, নওদা কেন্দ্রে মইনুল হক, আবু হেনা, আবু তাহের খান কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে ৩৮.৭৭, ৫১.৯৭, ৫১.৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ের ধারা বজায় রেখেছিলেন। সেই সাথে সুতি কেন্দ্রে ইমানী বিশ্বাস (৪৮.৮৭%), জঙ্গিপুর থেকে মোঃ সোহরাব (৪৬.৭৬%), রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্র থেকে আখরুজ্জামান (৫০.৯৯%), রানীনগর কেন্দ্রে ফিরোজা বেগম (৪৬ ৪৫%), রেজিনগর থেকে হুমায়ুন কবির (৪৯.৭৪%), বেলডাঙ্গা থেকে সফিউজ্জামান শেখ (৪৫.৩২%) প্রত্যেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) প্রার্থী হিসেবে শামসেরগঞ্জ থেকে তোয়েব

আলী (৪৬.৪৩%), হরিহরপাড়া কেন্দ্রে ইনসার আলী বিশ্বাস (৩৫.৫৬%), ডোমকল থেকে আনিসুর রহমান (৪৭.২২%), জলঙ্গি কেন্দ্রে আব্দুর রেজ্জাক (৪৯.৫৫%) জয়লাভ করেছিলেন। এছাড়া ভরতপুর কেন্দ্রে আর.এস.পি প্রার্থী ইদ্রিস মোহাম্মদ (৪৭.৭৮%) এবং ভগবানগোলা কেন্দ্রে চাঁদ মোহাম্মদ (৩৮.৬৩%) ডি.এস.পি প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন।[33]

সারণিঃ ৪.১৫ পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	মইনুল হক	ফারাক্কা	কংগ্রেস	৫২৭৮০	৩৮.৭৭
২	ইমানী বিশ্বাস	সুতি	কংগ্রেস	৭৩৪৬৫	৪৮.৮৭
৩	মোঃ সোহরাব	জঙ্গিপুর	কংগ্রেস	৬৮৬৯৯	৪৬.৭৬
৪	আখরুজ্জামান	রঘুনাথগঞ্জ	কংগ্রেস	৭৪৬৮৩	৫০.৯৯
৫	আবু হেনা	লালগোলা	কংগ্রেস	৭৪৩১৭	৫১.৯৭
৬	ফিরোজা বেগম	রানিনগর	কংগ্রেস	৭৬০৯২	৪৬.৪৫
৭	হুমায়ুন কবির	রেজিনগর	কংগ্রেস	৭৭৫৪২	৪৯.৭৪
৮	সফিউজ্জামান শেখ	বেলডাঙা	কংগ্রেস	৬৭৮৮৮	৪৫.৩২
৯	আবু তাহের খান	নওদা	কংগ্রেস	৮০৭৫৮	৫১.৬০
১০	তোয়েব আলী	শামসেরগঞ্জ	সি.পি.আই(এম	৬১১৩৮	৪৬.৪৩
১১	ইনসার আলী বিশ্বাস	হরিহরপাড়া	সি.পি.আই(এম	৫৮২৯৩	৩৫.৫৬
১২	আনিসুর রহমান	ডোমকল	সি.পি.আই(এম	৮১৮১২	৪৭.২২
১৩	আব্দুর রাজ্জাক	জলঙ্গি	সি.পি.আই(এম	৮৫১৪৪	৪৯.৫৫
১৪	ইদ্রিস মোহাম্মদ	ভরতপুর	আর.এস.পি	৭০৬৫৮	৪৭.৭৮
১৫	চাঁদ মোহাম্মদ	ভগবানগোলা	এস.ডি.পি	৬২৮৬২	৩৮.৬৩

সূত্রঃ Dilip Barnerjee, Election Recorder: A Analytical Reference, Kolkata, Star Publishing House, 2012, পৃ.পৃ ৮২৩-৮২৮; বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বাংলার রায়, কলকাতা, গ্রন্থমিত্র, ২০১১, পৃ.পৃ. ১৪৫-১৫৩। এই গ্রন্থসূত্রগুলো থেকে গবেষক এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

[33] চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ, (২০১১), 'বাংলার রায়, কলকাতা', গ্রন্থমিত্র প্রকাশনী, পৃ.পৃ. ১২১ -১৩৪।

২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব যে এই নির্বাচনে উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র বিরোধী জোটের পক্ষে মেরুকরণ যা আশা করা হয়েছিল প্রকৃত ফলাফল তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। এই নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস ২২৬ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮৪ টি আসনে জয়লাভ করেছিল। দলে প্রাপ্ত ভোটের হার ৩৯.০৮ শতাংশ এবং দলের আসন লাভের সাফল্যের হার ছিল ৮১ শতাংশ। অন্যদিকে নির্বাচনে ৪২ টি আসন পেয়ে কংগ্রেস আশাতীত ফল করলেও ২০০৬ সালের থেকে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ৫.৬২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট মাত্র ৬২ টি (C.P.I(M)-40, F.B-11, R.S.P-07, C.P.I-02, S.P & D.S.P-01) আসনে জয়লাভ করেছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১২৫ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জোট ৯২ টি আসন দখল করে এবং বামেরা কেবলমাত্র ৩৩ টি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল। এর থেকে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম ভোট ব্যাংক বামপন্থী থেকে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকে আবার সমর্থন করতে শুরু করে।[34]

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৩৮ সদস্যবিশিষ্ট প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। মমতা ব্যানার্জির প্রথম এই মন্ত্রিসভায় ০৬ জন সংখ্যালঘু মুসলিম মন্ত্রী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে আব্দুল করিম চৌধুরী 'গণশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা', জাবেদ আহমেদ খান 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ফায়ার এবং জরুরি পরিষেবা, সিভিল ডিফেন্স', হায়দার আজিজ সেফি 'কর্পোরেশন, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন', নুর আলম চৌধুরী 'প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন', ফিরহাদ হাকিম 'পৌর বিষয়ক, নগর উন্নয়ন', আবু হেনা 'মৎস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিল্প, উদ্যান পালন' দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০১১ সালে ৮ই জুন মমতা ব্যানার্জি তার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে আবু নাসের খান চৌধুরীকে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' ও সাবিনা ইয়াসমিনকে 'শ্রম' দপ্তরের মন্ত্রী করেছিলেন। এই প্রথম কোন মন্ত্রিসভায় সর্বাধিক ০৮ জন সংখ্যালঘু মুসলিম মন্ত্রী হয়েছিলেন যা জাতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের গুরুত্ববৃদ্ধি করেছিল।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

২০১৬ সালের নির্বাচনে একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যদিকে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট 'মহাজোট' গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ২০১৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ২১১ টি আসনে জয়লাভ করে পুনঃনির্বাচিত হয়। ১৯৬২ সালের পর এই প্রথম কোন রাজনৈতিক দল জোট না করে একক শক্তিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

২০১৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক ৫৬ জন সংখ্যালঘু মুসলিম নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ৩০ টিতে জয়লাভ করে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল এই

[34] চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ, (২০১১), 'বাংলার রায়', কলকাতা, গ্রন্থমিত্র প্রকাশনী, পৃ.পৃ. ৩১ -৩৩।

নির্বাচনে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট মহাজোট গঠন করেও যথাক্রমে ১৭ ও ০৯ টি করে আসনের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি আসনের মধ্যে সংরক্ষিত ০৩ টি আসন বাদে সাধারণ ১৯ টি আসনের মধ্যে ১৪ টি আসনে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। যার মধ্যে বাম কংগ্রেস 'মহাজোট' ১১ টি (কংগ্রেস ০৮ টি, বামফ্রন্ট ০৩ টি) এবং তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ০৩ টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। এই নির্বাচনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণ বাম কংগ্রেস 'মহাজোটের' উপর আস্থা রেখেছিল।

সারণিঃ ৪.১৬ পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	মইনুল হক	ফারাক্কা	কংগ্রেস	৮৩৩১৪	৫১.৬০
২	হুমায়ুন রেজা	সুতি	কংগ্রেস	৮৪০১৭	৪৫.২০
৩	আখরুজ্জামান	রঘুনাথগঞ্জ	কংগ্রেস	৭৮৪৯৭	৪৮.০০
৪	আবু হেনা	লালগোলা	কংগ্রেস	১০০১১০	৬১.৩০
৫	ফিরোজা বেগম	রানিনগর	কংগ্রেস	১১১১৩২	৫৯.০০
৬	রবিউল আলম চৌধুরী	রেজিনগর	কংগ্রেস	৭৯৭৭০	৪৩.৬০
৭	সফিউজ্জামান শেখ	বেলডাঙা	কংগ্রেস	৮৭০১৭	৫০.১০
৮	আবু তাহের খান	নওদা	কংগ্রেস	৬২৬৩৯	৩৫.২০
৯	মহসিন আলী	ভগবানগোলা	সি.পি.আই(এম)	১০৫০৩৭	৫৫.১০
১০	আনিসুর রহমান	ডোমকল	সি.পি.আই(এম)	৭১৭০৩	৩৬.৯০
১১	আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল	জলঙ্গি	সি.পি.আই(এম)	৯৬২৫০	৫০.৯০
১২	আমিরুল ইসলাম	সামশেরগঞ্জ	তৃণমূল কংগ্রেস	৪৮৩৮১	৩০.৪১
১৩	জাকির হোসেন	জঙ্গিপুর	তৃণমূল কংগ্রেস	৬৬৮৬৯	৩৭.৮০
১৪	নিয়ামত শেখ	হরিহরপাড়া	তৃণমূল কংগ্রেস	৭১৫০২	৩৮.০০

তথ্যসূত্রঃ Election Commission: West Bengal Assembly Election Result 2016, Govt. of India.

২০১৬ সালের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে প্রদত্ত ভোটের ৪৪.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ২১১ টি আসনের জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে বাম কংগ্রেস 'মহাজোট' প্রদত্ত ভোটের ৩৮.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ৭৬ টি আসনের জয়লাভ

করে (বামফ্রন্ট ৩২, কংগ্রেস ৪৪ টি)। এছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১০.৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ০৬ টি আসন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ০১ টি আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬ সালের ২৭ শে মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। প্রথম মন্ত্রিসভার থেকে দ্বিতীয় এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য একজন হ্রাস পেয়ে ৭ জন মন্ত্রী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা 'খাদ্য সংগ্রহ ও উদ্যানপালন', ফিরাদ হাকিম 'নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক', জাভেদ খান 'অসামরিক ও বিপর্যয় মোকাবিলা' দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী 'গণশিক্ষা, গ্রন্থাগার মন্ত্রণালয় এবং সংসদীয় বিষয়ে' স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং গোলাম রাব্বানী 'পর্যটন', জাকির হোসেন 'শ্রম', গিয়াসউদ্দিন মোল্লা 'সংখ্যালঘু বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষা' দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।[35] মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভাতেও সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্যদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জেলা থেকে জাতীয় রাজনীতি সর্বত্রই তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ঘটেছিল।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংখ্যালঘু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব

২০২১ সালের ২৭ শে মার্চ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত আট দফায় অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে ধর্ম, ভাষা ও জাতপাত ভিত্তিক মেরুকরণ রাজনীতি প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ধর্মীয় মেরুকরণ নির্দিষ্টভাবে তীব্র হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ-সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। সেই সাথে ২০১৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংসদে 'নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন' পাস করে ভারতে বসবাসকারী 'বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু' অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থীদের নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি ও পুনর্বাসনের আশ্বাস প্রদান করে। যা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণকে আরো তীব্র করে তোলে। কোভিড-১৯ অতিমারী ও তৎকালীন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কেন্দ্র করে সরকারি ত্রান বণ্টন ও তৎসহ গড়ে উঠা 'দুর্নীতি'কে হাতিয়ার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা পরিবর্তন করতে চাইলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

২০২১ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সহযোগী দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, অন্যদিকে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও আই.এস.এফ নিয়ে গঠিত 'সংযুক্ত মোর্চা' এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠা ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার সহযোগী রাজনৈতিক দলসমূহ এই

[35] The Hindu, (27th May, 2016), List of Ministers in Mamata's Cabinet, https://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/list-of-ministers-in-mamatas-cabinet/article8654872.ece (Accessed 22 April, 2024)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই নির্বাচনে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বাধিক ৪৭ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া কংগ্রেস ৩৪ জন বামফ্রন্ট ২৭ জন (সি.পি.আই(এম) ২২, ফরওয়ার্ড ব্লক ০৪, আর.এস.পি ০১ জন), আই.এস.এফ ১৬ জন এবং বিজেপি ০৯ জন সংখ্যালঘু মুসলিমকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল।

এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ জন সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে ৪৪ টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে জয়লাভ করে এবং ০১ টি আসনে জয়লাভ করে আই.এস.এফ। ২০২১ সালের নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংরক্ষিত তিনটি আসন বাদে ১৯ টি সাধারণ আসরের মধ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৫ জন, এবং প্রত্যেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। সমগ্র রাজ্যের মত এই জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর এককভাবে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। এই নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকেছে রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটাররা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ওই ভোটাররাই হয়ে উঠেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পরপর তিনবার সরকার গড়ার অন্যতম কারিগর। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের ২৯৪ টি আসনের মধ্যে ৭৪ টি কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটার ৪০ শতাংশ বা তার বেশি। ওই সব কেন্দ্র গুলির মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৭১ টি আসনে জয়লাভ করেছিল। বিজেপি পেয়েছে মাত্র দুটি আসন এবং ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আই.এস.এফ) পেয়েছিল ০১ টি আসন। এই নির্বাচনে রাজ্যে সার্বিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি এই দুই শক্তিধর রাজনৈতিক দলের লড়াইয়ের মাঝে তৃতীয় পক্ষের কোন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি।[36]

সারণিঃ ৪.১৭ পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থীর তালিকা (মুর্শিদাবাদ জেলা)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	বিধানসভা কেন্দ্র	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা হার
১	মইনুল হক	ফারাক্কা	তৃণমূল কংগ্রেস	১০২৩১৯	৫৪.৮৯
২	আমিরুল ইসলাম	সামশেরগঞ্জ	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৬৪১৭	৫১.১৩
৩	এমানি বিশ্বাস	সুতি	তৃণমূল কংগ্রেস	১২৭৩৫১	৫৮.৮৭
৪	জাকির হোসেন	জঙ্গিপুর	তৃণমূল কংগ্রেস	১৩৬৪৪৪	৬৮.৮২
৫	আখরুজ্জামান	রঘুনাথগঞ্জ	তৃণমূল কংগ্রেস	১২৬৮৩৪	৬৬.৫৯
৬	মহম্মদ আলী	লালগোলা	তৃণমূল কংগ্রেস	১০৭৮৬০	৫৬.৬৪

[36] আনন্দবাজার পত্রিকা, (৩রা মে, ২০২১), মমতার পাশেই সংখ্যালঘু ভোটাররা।

৭	ইদ্রিস আলী	ভগবানগোলা	তৃণমূল কংগ্রেস	১৫৩৭৯৫	৬৮.০৫
৮	আব্দুল সৌমিক হোসেন	রানিনগর	তৃণমূল কংগ্রেস	১৩৪৯৫৭	৬০.৭৯
৯	হুমায়ুন কবির	ভরতপুর	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৬২২৬	৫০.৯০
১০	রবিউল আলম চৌধুরি	রেজিনগর	তৃণমূল কংগ্রেস	১১৮৪৯৪	৫৬.৩১
১১	শেখ হাসানুজ্জামান	বেলডাঙা	তৃণমূল কংগ্রেস	১১২৮৬২	৫৫.১৯
১২	নিয়ামত শেখ	হরিহরপাড়া	তৃণমূল কংগ্রেস	১০২৬৬০	৪৭.৫১
১৩	সাহিনা মোমতাজ খান	নওদা	তৃণমূল কংগ্রেস	১১৭৬৮৪	৫৮.১৬
১৪	জাফিকুল ইসলাম	ডোমকল	তৃণমূল কংগ্রেস	১২৭৬৭১	৫৬.৪৫
১৫	আব্দুর রাজ্জাক	জলঙ্গি	তৃণমূল কংগ্রেস	১২৩৮৪০	৫৫.৭৮

তথ্যসূত্রঃ Election Commission: West Bengal Assembly Election Result 2021.

২০২১ সালে নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে প্রদত্ত ভোটের ৪৮.০২ শতাংশ ভোট পেয়ে ২১৫ টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে বিজেপি প্রদত্ত ভোটের ৩৭.৯৭ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭৭ টি আসন দখল করে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে অবস্থান করে। এই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, তারা একটিও আসন জয়লাভ করতে পারেনি। তবে এই নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আই.এস.এফ) ০১ টি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। ২০২১ সালের ৫ই মে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টানা তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। তাঁর এই মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মুসলিম সদস্য হিসেবে সর্বাধিক ৭ জন মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন। যাদের মধ্যে ফিরহাদ হাকিম 'নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক মন্ত্রী', জাভেদ খান 'অসামরিক ও বিপর্যয় মোকাবিলা', সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী 'গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা', মোঃ গোলাম রাব্বানী 'অপ্রচলিত নবীকরণযোগ্য শক্তি সম্পদ' দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া আখরুজ্জামান 'শক্তি মন্ত্রক', সাবিনা ইয়াসমিন 'সেচ জলপথ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন' এবং হুমায়ুন কবির 'কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন' (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[37] মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রিসভায় সর্বাধিক সংখ্যক সংখ্যালঘু সদস্যের মন্ত্রিত্ব তাদের জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল।

[37] Singh, Shiv Sahay, (10th May, 2021), 'Old and new faces, Representation for Women and Muslims in West Bengal Cabinet', The Hindu. https://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/old-and-new-faces-representation-to-women-and-muslims-in-west-bengal-cabinet/article34524022.ece (Accessed 25 April, 2024)

বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ইতিবৃত্ত(১৯৭১-১৯৯১)

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করেছিল। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশের চলার পথটি মসৃণ ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল আততায়ী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মূল ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত করার পাশাপাশি গণতন্ত্রকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। মুজিবুর রহমানের হত্যার পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ভাবাদর্শ রাষ্ট্রনীতিকে গ্রাস করেছিল। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনের আবহক্রমে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আবহ ও সাম্প্রদায়িক নীতির উপস্থিতি নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক হয়ে গেছে। এই নির্বাচনের সাথে যদি যুক্ত হয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন, তাহলে তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সাম্প্রদায়িকতা আরো প্রজ্বলিত হয়। নির্বাচন এলেই তাই বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা উদ্দীপ্ত হয় না, বরঞ্চ শংকিত হয়ে পড়ে। তাদের উপর নেমে আসে অত্যাচার, নিপীড়ন, অমর্যাদা, অপমান। তাছাড়া জনসংখ্যার অনুপাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নেই জাতীয় সংসদে। কোন রাজনৈতিক দলই তাদের মনোনয়ন প্রদান করে না সেই বিবেচনায়। অবশ্য দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো সংস্থাতেই সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নেই।[38] আমি মূলত আমার গবেষণা জাতীয় সংসদের নির্বাচনের উপরেই সীমিত রাখবো। কারণ জাতীয় সংসদ দেশের সার্বভৌমত্বের ধারক, সকল আইনের উৎস ও সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সংসদ নির্বাচিত করেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে। তাই জাতীয় সংসদে যদি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তাহলে কোনভাবেই সেই সংসদ তাদের জন্যে নির্ভরশীল স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, মন্ত্রিসভা গঠন এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৭২-১৯৯০):

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে ঘোষিত ‘স্বাধীনতার সনদের ভিত্তিতে’। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘অস্থায়ী সংবিধান আদেশ’ (১৯৭২) জারি করে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে 'সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার' প্রবর্তন করেছিলেন।[39]

[38] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ. ১৫।

[39] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ১৯-২০।

বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠনের কথাও তিনি বলেছিলেন। এই অস্থায়ী সংবিধানের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠনের দ্বারা ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্থায়ী সংবিধান, সংসদীয় ব্যবস্থা ও সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিল।[40]

এই সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার চার নীতি অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্থান দেওয়ার পাশাপাশি ৩১৫ সদস্যবিশিষ্ট (৩০০টি আসন সরাসরি ভোটের দ্বারা ও ১৫ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত) এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ১৯৭২ সালে সংসদীয় নির্বাচনী আসনের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিলেন।[41]

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৭৩):

এই ১৪ টি রাজনৈতিক দলের ১০৮৯ জন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ১২০ জন অর্থাৎ মোট ১২০৯ জন প্রার্থী প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই ১২০৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিল ৫৩ জন যা ৪.৩৮ শতাংশ মাত্র। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের মোট ১০৮৯ জন প্রার্থীর মধ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রার্থী ছিলেন ৩৯ জন (৩.৫৮%), বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রার্থী ছিলেন ০৫ জন (০.৪৮%) এবং খ্রিস্টানধর্মাবলম্বী ছিলেন ০২ জন (.০২০%) প্রার্থী।[42] জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে অধিক সংখ্যায় সংখ্যালঘুদের মনোনয়ন দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের ১৩ জন সংখ্যালঘু সদস্যের মধ্যে শুধুমাত্র হিন্দু অধ্যুষিত খুলনা, ফরিদপুর, যশোর ও বাকেরগঞ্জেই মোট ১১ জন হিন্দু সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ০৮ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল।[43]

প্রথম নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও ৩১৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মোট সংসদ সদস্যের ৪.৪৪ শতাংশ মাত্র।[44]

---

[40] শরীফ, আহমেদ, (২০১৭), 'বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র', ঢাকা, অনন্যা, পৃ. ৭৩।

[41] কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, (২০১৬), 'বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)', ঢাকা, আগমনী প্রকাশনী, পৃ.৭৫৭।

[42] Bangladesh Election Commission, (1973), 'Statistical Report, Jatiya Shangshad Election' Dhaka, Election Commission Secretariat p.p. 20-21.

[43] তদেব, পৃ.পৃ. ৭৫-১১১।

[44] Baxter, Craig, and M. Rashiduzzaman, (April, 1981), 'Bangladesh Votes: 1978 and 1979', Asian Survey, Vol. 21, No. 4, p.p. 485-489.

সারণিঃ ৪.১৮ বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ- ১৯৭৩)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম	আসন	রাজনৈতিক দল
১	কানাইলাল সরদার	রংপুর-১৫	আওয়ামী লীগ
২	পীযূষ ভট্টাচার্য	যশোর-৭	আওয়ামী লীগ
৩	কুবের চন্দ্র বিশ্বাস	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৪	হরনাথ বাইন	বাকেরগঞ্জ-১২	আওয়ামী লীগ
৫	চিত্তরঞ্জন সুতার	বাকেরগঞ্জ-১৪	আওয়ামী লীগ
৬	ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল	বাকেরগঞ্জ-১৫	আওয়ামী লীগ
৭	সন্তোষ কুমার বিশ্বাস	ফরিদপুর-১২	আওয়ামী লীগ
৮	ফনিভূষণ মজুমদার	ফরিদপুর-১৯	আওয়ামী লীগ
৯	মনোরঞ্জন ধর	ময়মনসিংহ-২৭	আওয়ামী লীগ
১০	মানিক চৌধুরী	সিলেট-১৮	আওয়ামী লীগ
১১	মানবেন্দ্র নারায়ণ	পার্বত্য চট্টগ্রাম	স্বতন্ত্র
১২	চাই তোয়াই রাজা	পার্বত্য চট্টগ্রাম	স্বতন্ত্র
১৩	কনিকা বিশ্বাস	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
১৪	সুদীপ্তা দেওয়ান	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ

(সূত্র: Bangladesh Election Commission, 'Statistical Report, Jatiya Shangshad Election' Dhaka, Election Commission Secretariat, p.p.115-120)

আওয়ামী লীগের মনোনীত ১৩ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন জয় লাভ করেছিল। এদের মধ্যে দুজন কণিকা বিশ্বাস এবং সুদীপ্তা দেওয়ান সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯.৫৭ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু। ১৯৬২-১৯৭৩ পর্যন্ত কোন আদমশুমারি না হওয়ায় এই সংখানুপাতে ৩১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট সংসদে ৬২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য থাকার পরিবর্তে মাত্র ১৪ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। সেই সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল সাফল্যের পর ২৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন এবং ৩রা অক্টোবর ১৪ জন প্রতিমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুজিবর রহমানের ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায়

মাত্র ০৩ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।[45] স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রীসভাতেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের সংকট ছিল ব্যাপক হারে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৭৯):

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে প্রথম বিপর্যয় দেখা দেয় ১৯৭৫ সালে ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য, ষড়যন্ত্রকারী একদল সেনা দ্বারা নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের সঙ্গে সঙ্গেই তারই মন্ত্রীসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ সেনা সমর্থনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে ৫ই নভেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমেদ পদত্যাগ করেন এবং ৬ই নভেম্বর আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম সেনা অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর পাল্টা সেনা অভ্যুত্থানে মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ ও তাঁর সঙ্গী মেজর হায়দার নিহত হয়েছিলেন। এই সামরিক সংকটময় পরিস্থিতিতে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে সারা দেশে সামরিক আইন জারী করেছিলেন।[46] ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম পদত্যাগ করলে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিল বাংলাদেশী সংবিধান সংশোধনীর 'The Proclamation (Amendment) order 1977 (Proclamation order No. 1 of 1977)' মাধ্যমে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহিম' বা 'আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি' সংযুক্ত করেছিল এছাড়া সংবিধানের মৌলিক নীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতার' পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাটির সংযোজন ঘটেছিল।[47]

জিয়াউর রহমান তাঁর সামরিক শাসনকে বৈধকরণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৭ সালে ৩০ শে মে সর্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে গণভোট (Referendum) এর আয়োজন করেন। এই নির্বাচনে কোন প্রার্থী ছিল না। নির্বাচনে ভোটারের সম্মুখে "রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি?" প্রশ্নের হ্যাঁ/না মতামত চাওয়া হয়। শতকরা ৯৮.৯ ভাগ ভোটার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচির স্বপক্ষে হ্যাঁ সূচক ভোট প্রদান করেন। অবশ্য এ

---

[45] Bangladesh Election Commission, (1973), 'Statistical Report, Jatiya Shangshad Election' Dhaka, Election Commission Secretariat, p.p. 115-120.

[46] কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, (২০১৬), 'বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)', ঢাকা, আগমনী প্রকাশনী, পৃ.পৃ. ৭৩৯-৭৪১।

[47] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ১০০-১০৩।

নির্বাচনে এত বিপুল সংখ্যক ভোটার তাদের মত প্রদান করেছিলেন কিনা এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।[48] তবে এ গণভোট যে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতার ভিত্তিকে আরো মজবুত করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় জিয়াউর রহমান দেশে একটি নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সামরিক ফরমানের দ্বাদশ সংশোধনী জারি করেন। ১৯৭৮ সালের ১৭ই এপ্রিল এই সংশোধনী আদেশ জারির দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি প্রদান করা হয়। এবং জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে ২৮শে এপ্রিল দলীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করেন।[49]

এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কোন সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিল না। তবে পাকিস্তান আমলে 'সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন' স্বাধীন বাংলাদেশে রসরাজ মন্ডলের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ তপশিলি ফেডারেশন' এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে পুনরায় জাগ্রত হয়েছিল।[50] নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় জিয়াউর রহমান ৭৬.৬৭ শতাংশ (১,৫৭,৩৩,৬০৭) ভোট পেয়ে ‘গণতান্ত্রিক ঐক্য’ জোটের প্রার্থী এম.এ.জি ওসমানীকে (২১.৭০ শতাংশ, প্রাপ্ত ভোট ৪৪,৫৫,২০০) পরাজিত করেছিলেন।[51] রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২৮ জন মন্ত্রী ও ২০ জন উপমন্ত্রী নিয়ে যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন, তাতে তপশিলি ফেডারেশনের রসরাজ মন্ডলকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনিই ছিলেন জিয়াউর রহমানের ২৮.০৬.১৯৭৮ থেকে ১৫.০৮.১৯৭৯ কালপর্বের মন্ত্রিসভার একমাত্র সংখ্যালঘু সদস্য।[52]

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণ বা গণতান্ত্রিকীকরণের শেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ১৯৭৮ সালের ৩০ শে নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ২৭শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছিলেন।[53] ৪১৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সহ মোট ২১২৫ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অবমূল্যায়ন মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রতিভাত হবার পাশাপাশি ১৪টি রাজনৈতিক দলের ৫২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে মনোনয়ন দেবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই নির্বাচনে জাতীয় সংসদে মোট ০৮ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন যা মোট সদস্যবৃন্দের ২.৬৬ শতাংশ মাত্র।[54]

---

[48] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ ৬৭-৬৮.।

[49] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ১১৫-১১৬।

[50] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ. ১১৮।

[51] Baxter, Craig, and M. Rashiduzzaman, (April, 1981), 'Bangladesh Votes: 1978 and 1979', Asian Survey, Vol. 21, No. 4, p. 492.

[52] জাহান, এমরান, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১১৯-১২০।

[53] Baxter, Craig, and M. Rashiduzzaman, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯২।

[54] জাহান, এমরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

সারণিঃ ৪.১৯ বাংলাদেশ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৭৯)

ক্রমিক সংখ্যা	বিজয়ী প্রার্থীর নাম	নির্বাচনক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল
১	সতীশচন্দ্র রায়	দিনাজপুর-৭	আওয়ামী লীগ (মালেক)
২	প্রফুল্লকুমার শীল	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ (মালেক)
৩	সুধাংশু শেখর হাওলাদার	বাকেরগঞ্জ-১৪	আওয়ামী লীগ (মালেক)
৪	ফণিভূষণ মজুমদার	ফরিদপুর-১১	আওয়ামী লীগ (মালেক)
৫	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সিলেট-২	জাতীয় একতা পার্টি
৬	সুনীল কুমার গুপ্ত	বাকেরগঞ্জ-৫	বি এন পি
৭	উপেন্দ্রলাল চাকমা	পার্বত্য চট্টগ্রাম-১	জাসদ
৮	অং শ্রে প্রু চৌধুরী	পার্বত্য চট্টগ্রাম-২	স্বতন্ত্র

(সূত্রঃ Bangladesh Election Commission, (1979), 'Statistical Report, Jatiya Shangshad Election' Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ১৬৫-১৬৭)।

১৯৭৯-র নির্বাচনেও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছিল ব্যাপকভাবে। কিন্তু মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সুবিচার করেননি। ২৯৫ টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামী লীগ মাত্র ০৮ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল, যা মোট সদস্য সংখ্যা ২.৭১ শতাংশ মাত্র।[55]

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে বি.এন.পি'র ছিল একক প্রাধান্য। মহিলাদের জন্যে যে ৩০টি আসন সংরক্ষিত ছিল তাতে ক্ষমতাশীল বিএনপি কোন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনীত করেন নি। ১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিদ্বদ্বির সংখ্যা ১৫ জন বৃদ্ধি পেলেও বিজয়ী সদস্য সংখ্যা ০৬ জন হ্রাস পেয়েছিল।[56]

১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিল ৪২ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন এই মন্ত্রিসভায় একমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংসদ সদস্য সুনীল কুমার গুপ্তাকে পেট্রোলিয়াম খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম-২ থেকে নির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ অংশ্রে প্রু চৌধুরী বি এন.পিতে যোগদান করলে ১৯৭৯ সালের

[55] Bangladesh Election Commission, (1979), 'Statistical Report, Jatiya Shangshad Election' Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ১৬৫-১৬৭।

[56] কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, (২০১৬), 'বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)', ঢাকা, আগমনী প্রকাশনী, পৃ.পৃ. ৩৯০-৩৯৮।

১০ই মে তাঁকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে এই মন্ত্রীপরিষদের আকার বৃদ্ধি করে ৬৩ সদস্যবিশিষ্ট করা হলেও তাতে কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যকে স্থান দেয়া হয়নি।[57] রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এক ঘোষণা বলে ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এ ঘোষণার ফলে বাংলাদেশের জারি করা ৩ বছর ১০ মাস ২১ দিনের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং তাঁর বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। বাংলাদেশ পুনরায় গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে শুরু করে। কিন্তু ১৯৮১ সালের ৩০ শে মে বিদ্রোহী সেনার সদস্যের দ্বারা জিয়াউর রহমান নিহত হলে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের অপমৃত্যর মধ্য দিয়ে পুনরায় সামরিক শাসন চালু হয়।[58]

বাংলাদেশের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৮৬)

১৯৮২ সালে ২৪ শে মার্চ বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাপ্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দেশের সামরিক আইন জারি করার পাশাপাশি দ্বিতীয় সংসদ ভেঙে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে ১১ই ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন দ্বারা সরাসরি রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সেনা সর্বাধিকারীর পদে আসীন হয়েছিলেন।[59] রাষ্ট্রপতি এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিজের অনুগত রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের মতো তিনি ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।[60] এবং ১৮৮৫ সালের ২১ শে মার্চ রাষ্ট্রপতি এরশাদ একটি গণভোটের আয়োজন করেছিলেন, যেখানে হ্যাঁ অথবা না ভোটের নিরিখে তিনি ৯৪.১৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিলন। একদিকে এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার বৈধকরণ ও অন্যদিকে বিরোধী দলগুলির গণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৮৬ সালের ৭ই মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[61]

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২৮টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ০৮ টি রাজনৈতিক দল ৩২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী (২৭ জন হিন্দুধর্মাবলম্বী, ০৪ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও ০১ জন খ্রিস্টানধর্মাবলম্বী) কে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া এই নির্বাচনে 'বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট' ০৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথম ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বতন্ত্র ৪৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮ জন (১৭ জন হিন্দুধর্মাবলম্বী ও ০১ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী) ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী

[57] Bangladesh Election Commission: প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৬৫-১৬৭।

[58] কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ৭৪১-৭৪৩।

[59] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ১২৮-১৩৯।

[60] আহমেদ, মহিউদ্দিন, (২০১৮), বি. এন. পির সময়য় অসময়, ঢাকা, প্রথমা, পৃ.পৃ. ১৮৬-১৮৮।

[61] জাহান, এমরান, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ১৪৬-১৫০।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ এই নির্বাচনে ১৫২৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৫০ জন (৩.২৭%) ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী যা ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের চেয়ে ১৮ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী হ্রাস পেয়েছিল।[62] এই নির্বাচনে জাতীয় সংসদে মোট ০৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন যা মোট সদস্যবৃন্দের ২.১৩ শতাংশ মাত্র।

সারণিঃ ৪.২০ বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৮৬)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচন ক্ষেত্রে	রাজনৈতিক দল
১	সতীশচন্দ্র রায়	দিনাজপুর-২	আওয়ামী লীগ
২	বরুন রায়	সুনামগঞ্জ-১	আওয়ামী লীগ
৩	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	গণতন্ত্র পার্টি
৪	সুনীল কুমার গুপ্ত	বাকেরগঞ্জ-১	জাতীয় পার্টি
৫	বিনয় কুমার দেওয়ান	রাঙ্গামাটি	জাতীয় পার্টি
৬	মংশ্রে প্রু চৌধুরী	বান্দারবন	জাতীয় পার্টি
৭	মালতী রাণী	সংরক্ষিত মহিলা সংসদ	জাতীয় পার্টি

(সূত্রঃ Bangladesh Election Commission, (1986), 'Statistical Report, Jatiya Shangshad Election' Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ১৫৯-১৮৯।)

এই তৃতীয় জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির ছিল একক প্রাধান্য। মহিলাদের জন্যে যে ৩০টি আসন সংরক্ষিত ছিল তাতে ক্ষমতাশীল জাতীয় পার্টির মনোনয়নে সংখ্যালঘু নারী সদস্য হিসাবে একমাত্র মালতী রানী সংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের তুলনায় ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংখ্যালঘু সদস্যের সংখ্যা ০১ জন হ্রাস পেয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর এরশাদ যে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন সেখানে সুনীল কুমার গুপ্ত ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে একমাত্র প্রতিমন্ত্রী।[63]

১৯৮৭ সালে ২৮ শে অক্টোবর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন ঘোষণা করেছিলেন। এই গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সালের ২৭ শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ সারাদেশে জরুরী অবস্থা জারী করেন এবং ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ১৯৮৮ সালের

[62] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (১৯৮৬), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদন: জাতীয় সংসদ নির্বাচন', ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ২৯-৩০।

[63] Bangladesh Election Commission, (1979), 'Statistical Report, Jatiya Shangshad Election' Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ১৫৯-১৮৯।

৩রা মার্চ ঘোষণা করেছিলেন। এই নির্বাচনকে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি সম্মিলিতভাবে বয়কটের ডাক দিয়েছিল। ১৯৮৮ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ০৮টি রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ৯৭৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সাংবিধানিকভাবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় চতুর্থ সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০ টিতেই সীমিত ছিল। এই নির্বাচনে মাত্র ০৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মোট সদস্য সংখ্যার মাত্র ১.২১ শতাংশ। জাতীয় পার্টির মনোনয়নে মাগুরা-২ নির্বাচনক্ষেত্র থেকে নিতাই রায় চৌধুরী, বাকেরগঞ্জ-১ থেকে সুনীল কুমার গুপ্ত, রাঙ্গামাটিতে বিনয় কুমার দেওয়ান এবং বান্দারবনের নির্বাচনক্ষেত্র থেকে মংশ্রে প্রু চৌধুরী নির্বাচিত হন।[64] প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অংশগ্রহণ না করায় এই নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে এরশাদ সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল আন্তর্জাতিক মহল। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত গণ আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক মহলের চাপে ১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক শাসনের অবসান ঘটেছিল।[65]

বাংলাদেশের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ এই তিনটি সংসদেরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সামরিক শাসকের অধীনে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতিতে। যেহেতু এইসব নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে রেখেছিলেন সামরিক শাসকরা, তাই সংখ্যালঘুরা কে কোথায় কাকে ভোট দিচ্ছে তা নিয়ে তাদের খুব বেশি চিন্তার কারণ ছিল না। কারণ সংখ্যালঘুদের ভোটের উপর তাদের রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা ছিল না। যার ফলস্বরূপ, এই সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের জন্যে শুধু বঞ্চনায়ই নয়, ছিল চরম হতাশারও।[66]

১৯৯১-এর পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের অবস্থান:

সামরিক শাসক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সরকারের পতনের একটি ক্রান্তিকালীন সময়কালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন(১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর)। বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদের স্বল্পকালীন দায়িত্বভার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জন্মের ২০ বছর পর ১৯৯১ সালের নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তি আশার সঞ্চার হয়। কারণ এই প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি অন্তবর্তীকালীন কেয়ারটেকার বা নিরপেক্ষ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বাংলাদেশ স্বাধীনের পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু, অবাধ ও দুর্নীতিমুক্ত হয়নি। যার ফলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চর্চা

[64] কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, (২০১৬), 'বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)', ঢাকা, আগমনী প্রকাশনী, পৃ.৭৪৪।

[65] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ৭৭-৭৯।

[66] শরীফ, আহমেদ, (২০১৭), 'বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র', ঢাকা, অনন্যা, পৃ. ১১৫।

অবিকশিত ও অপরিণতই থেকে যায়। সেদিক থেকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল সাহাবুদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর। ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এই অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[67]

বাংলাদেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৯১):

১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৫টি রাজনৈতিক দলের ২৩৬৩ জন প্রার্থী, এবং স্বতন্ত্র ৪২৪ জন প্রার্থীসহ সর্বমোট ২৭৮৭ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল হিসেবে 'বাংলাদেশ হিন্দু লীগ' ০৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৫টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ২১টি রাজনৈতিক দল ৭৩ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছিল যা, মোট প্রার্থীর ৩.২২ শতাংশ। এই ৭৩ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী ০৭ জন ছিলেন বৌদ্ধ এবং ০১ জন ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।[68] প্রতিটি নির্বাচনের ন্যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় (১১ জনকে) মনোনয়ন দিয়েছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এছাড়া বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ০৭ জন, জাতীয় পার্টি ০৫ জন হিন্দু ও ০১ জন বৌদ্ধপ্রার্থীসহ মোট ০৬ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছিল। B.N.P মাত্র ০৩ জন হিন্দু ও ০১ জন বৌদ্ধসহ মোট ০৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল।[69] প্রতিটি নির্বাচনের ন্যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৬,২১,৮১,৭৪৩ জন। এই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৩,৪৪,৭৭,৮০৩ টি এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৫৫.৪৫ শতাংশ। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেননি। নির্বাচনী ফলাফলের দেখা যায় বি.এন.পি প্রদত্ত ভোটের ৩০.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে সর্বাধিক ১৪০টি আসনে জয়লাভ করে। বি.এন.পি-র থেকে সামান্য কম ৩০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ মাত্র ৮৮টি আসন লাভ করে। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী প্রদত্ত ভোটের ১২.১৩ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ১৮টি আসনে জয়ী হয়। অথচ তার চেয়ে কম ১১.৯২ শতাংশ ভোট পেয়ে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে জয় লাভ

---

[67] দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ই জুন, ১৯৮৮।

[68] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ১৮৪-১৮৬।

[69] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (১৯৯১), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদন: জাতীয় সংসদ নির্বাচন' ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৩৪৯-৩৫২।

করে। তাছাড়া এই নির্বাচনে বাকশাল ০৫টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ১.৮১ শতাংশ), বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ০৫টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ১.১৯ শতাংশ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), গণতন্ত্রী পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, জাসদ (সিরাজ), ওয়ার্কার্স পার্টি ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রত্যেকের একটি করে আসনে জয়লাভ করে এবং নির্দলীয় প্রার্থী ০৩টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৪.৩৯ শতাংশ) জয়ী হয়।[70] এই নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু লীগ ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি কোন আসনে বিজয়ী হতে পারেনি।

সারণিঃ ৪.২১ বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৯১)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র	রাজনৈতিন দল
১	সতীশচন্দ্র রায়	দিনাজপুর-২	আওয়ামী লীগ
২	শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী	নাটোর-২	আওয়ামী লীগ
৩	ধীরেন্দ্রনাথ সাহা	নড়াইল-১	আওয়ামী লীগ
৪	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
৫	সুধাংশু শেখর হাওলাদার	পিরোজপুর-১	আওয়ামী লীগ
৬	কল্পরঞ্জন চাকমা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
৭	বীর বাহাদুর	পার্বত্য বান্দাবরন	আওয়ামী লীগ
৮	দীপংকর তালুকার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	আওয়ামী লীগ
৯	প্রমোদ মানকিন	ময়মনসিংহ-১	আওয়ামী লীগ
১০	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	গণতন্ত্রী পার্টি
১১	পরিতোষ চক্রবর্তী	রংপুর-১	জাতীয় পার্টি(উপনির্বাচনে বিজয়ী)
১২	ম্যা ম্যা চিং	সংরক্ষিত মহিলা আসন	বিএনপি

(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদন: জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৩০৫-৩৩৭।)

৩০০ সদস্যবিশিষ্ট পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ০৯ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু, গণতন্ত্রী পার্টির ০১ জন ও জাতীয় পার্টির ০১ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া ৩০ জন সংরক্ষিত মহিলা সংসদদের মধ্যে বি.এন.পি'র মনোনয়নে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে একমাত্র ম্যা ম্যা চিং নির্বাচিত হয়েছিল। নির্বাচিত ১১ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে মাত্র ০৭ জন বিজয়ী হয়েছিলেন সংখ্যালঘু

[70] Bangladesh Bureau of Statistics, (1992), 'Bangladesh Population Census 1991, Community Series, Sixty Four Districts', Dhaka.

অধ্যুষিত নির্বাচনকেন্দ্র থেকে। হিন্দু অধ্যুষিত নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় প্রমাণ করে যে, আওয়ামী লীগের প্রতি প্রধান ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সার্বিক সমর্থনকে।[71] এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি.এন.পি ১৪০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করলেও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। এহেন পরিস্থিতিতে নির্বাচনে ১৮টি আসনে বিজয়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন করায় রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের আহ্বানে ১৯৯১ সালের ১৯শে মার্চ বেগম খালেদা জিয়া ৩২ সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন।[72] বেগম খালেদা জিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করলেও তখনও পর্যন্ত প্রচলিত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশের বিদ্যমান থাকায় সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৯১ সালের ১০ই আগস্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে বাংলাদেশ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।[73] বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ১৯৯১-১৯৯৬ শাসনকাল পর্বের শুরুতে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেও পরবর্তীকালে বর্ধিত হয়ে মন্ত্রিসভা ৪১ সদস্য বিশিষ্ট হয়েছিল। এই মন্ত্রিসভায় একমাত্র সংখ্যালঘু সদস্য হিসেবে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় টেকনোক্র্যাট কোটায় তৎকালীন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২৩ জন পূর্ণ মন্ত্রীর মধ্যে কোন সংখ্যালঘু সদস্যকে নিযুক্ত করেনি খালেদা জিয়া তার মন্ত্রিসভায়।[74] জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল সংকটময়।

খালেদা জিয়ার শাসনকালে সামাজিক অপরাধ ও সন্ত্রাস, দলীয়করণ ও দুর্নীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। ১৯৯২ সালের ভারতের বাবরি মসজিদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়িক সহিংসতা সমগ্র বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করেছিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের ২৭শে জুন আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্মিলিতভাবে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা প্রদান করে ভবিষ্যৎ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করবার দাবি জানালে খালেদা জিয়া এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অসংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বিরোধীদলের ১৪৭ জন সদস্য জাতীয় সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটি ছিল একটি নজিরবিহীন ঘটনা। সারা দেশব্যাপী বিরোধী দলগুলির হরতাল কর্মসূচি এবং সরকার বিরোধী গণ-আন্দোলন

---

[71] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (১৯৯১) 'নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন: জাতীয় সংসদ নির্বাচন', ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৩০৫-৩৬৭।

[72] কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, (২০১৬), 'বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)', ঢাকা, আগমনী প্রকাশনী, পৃ.পৃ. ৭৮০-৭৮৮।

[73] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ২০৩-২০৬।

[74] মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, (২০১৭), 'আমাদের জাতীয় সংসদ ও নির্বাচন', সময়, ঢাকা, পৃ.পৃ. ৪৩-৫২।

সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শে ১৯৯৫ সালের ২৪ শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়েছিলেন।[75]

পরবর্তীকাল নির্বাচন কমিশন ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবচেয়ে বিতর্কিত একটি নির্বাচন ছিল। চতুর্থ নির্বাচনের মতো ষষ্ঠ নির্বাচনেও প্রধান প্রধান সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জন সত্ত্বেও এই নির্বাচনে ৩০০ আসনে মোট ১৪৫০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এর মধ্যে ৩০০ জন ছিলেন বিএনপির দলীয় প্রার্থী। নির্বাচনের বিএনপি মোট ০৪ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্য ৪০ টি ভুঁইফোঁড় রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৯৩ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৫৭ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৪০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দু-একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল সম্পর্কে জনগণ ছিল অজ্ঞ।[76] নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এই নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ছিল ২৬.৫৪ শতাংশ। এই নির্বাচনে বি.এন.পি ২৭৮টি আসনে, ফ্রিডম পার্টি ০১টি আসনে, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স জোট ০১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১০টি আসনে জয়লাভ করে। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাত্র ০৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বিএনপি'র সমর্থনে। খুলনা-১ থেকে প্রফুল্ল কুমার মন্ডল, মাদারীপুর-৩ আসন থেকে গণেশচন্দ্র হালদার, পার্বত্য রাঙামাটি থেকে পারিজাত কুসুম চাকমা ও পার্বত্য বান্দরবান থেকে সাচিং প্রু জেরী জয়লাভ করে। মহিলা সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্য থেকে একমাত্র সংখ্যালঘু মহিলা প্রার্থী হিসাবে ম্যাম্যাচিং নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই নির্বাচনী ফলাফল ও চলমান বিরোধী দলগুলি আন্দোলনের মধ্যেই ১৯৯৬ সালে ১৯শে মার্চ রাষ্ট্রপতির আহবানে বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন ২৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। যেখানে কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যকে স্থান দেওয়া হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে বাংলাদেশের ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ছিল সবচেয় স্বল্পায়ু। এ সংসদের স্থিতিকাল ছিল মাত্র ১১ দিন এবং মোট কার্যদিবসের সংখ্যা ছিল মাত্র চার দিন। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রের ইতিহাসে ১৫ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল একটি বিতর্কিত ও প্রহসনের নির্বাচন। ১৯৯৬ সালের ২৮ শে মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ২৯ শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবলুপ্ত করেছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৯৬ সালে ১২ জুন বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।[77]

---

[75] জাহান, এমরান, প্রাগুক্ত, পৃ.পৃ. ২০৩-২০৮।

[76] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ২৩০-২৩৪।

[77] শরীফ, আহমেদ, (২০১৭), 'বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র', ঢাকা, অনন্যা, পৃ. ১৪৭।

বাংলাদেশে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (১৯৯৬):

খালেদা জিয়া সরকারের শাসনামলে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং একটি জাতীয় উপনির্বাচনে সরকারের ব্যাপক প্রভাব ও কারচুপির কারণে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে নিরপেক্ষতা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দল পরবর্তী নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকাল সরকার ব্যবস্থার জন্য দাবি জানা। তাই ১৯৯৬ সালের ২৯শে মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অবলুপ্তির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারের অবসান ঘটলে। ১৯৯৬ সালের ৩০ শে মার্চ রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংবিধান মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের বিদায়ী বিচারপতি মহম্মদ হাবিবুর রহমানকে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করেন। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালের ৭ই এপ্রিল মোঃ আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণের পর মহম্মদ আবু হেনা ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন বাংলাদেশে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে।[78]

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের ২২৯০ জন প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র ২৮৪ জন প্রার্থীসহ মোট ২৫৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৮টি রাজনৈতিক দল মাত্র ৪৯ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এই ৪৯ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ৩৯ জন হিন্দু, ০৮ জন বৌদ্ধ ও ০২ জন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিল এবং স্বতন্ত্র ২৮৪ জনের মধ্যে ১৮ জন (১২ জন হিন্দু, ও ০৬ জন বৌদ্ধ প্রার্থী) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। অর্থাৎ ২৫৭৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৭ জন যা মোট প্রার্থীর মাত্র ২.৬০ শতাংশ।[79] সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি ১৪ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এই নির্বাচনে বি.এন.পি ০৬ জন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ০৫ জন, জাতীয় পার্টির ০৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল।[80] এছাড়া সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ হিন্দু লীগ ০৩ জন, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (স্বপন), সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন (সুধীর),ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও জাকের পার্টি প্রত্যেকে ০১ জন করে সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল।[81]

---

[78] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ২৩৪-২৪১।

[79] তদেব, পৃ.পৃ. ২৪১-২৪৩।

[80] Bangladesh Election Commission: (1996), Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ১২০-২০০।

[81] Bangladesh Election Commission: (1996), Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ৮১-১৬১।

১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেননি। নির্বাচনী ফলাফলের দেখা যায় আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের ৩৭.৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে সর্বাধিক ১৪৬ টি আসনে জয়লাভ করে। বি.এন.পি প্রদত্ত ভোটের ৩৩.৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে ১১৬ টি ও জাতীয় পার্টি প্রদত্ত ভোটের ১৬.৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩২ টি আসন লাভ করে। এই নির্বাচনে ইসলামী মৌলবাদী দলের ফলাফল ছিল আশাতীতভাবে নিম্নগামী। মাত্র ০৩টি আসলে তারা জয় লাভ করে। যদিও প্রাপ্ত ভোটের জামায়াতে ইসলামের শতকরা হওয়ার ছিল ৮.৬১ শতাংশ। এছাড়া এই নির্বাচনে জাসদ(রব), ইসলামে ঐক্য জোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রত্যেকে ০১টি করে আসনে জয়লাভ করে।[82]

সারণিঃ ৪.২২ বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-১৯৯৬)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র	রাজনৈতিন দল
১	সতীশচন্দ্র রায়	দিনাজপুর-২	আওয়ামী লীগ
২	বীরেন শিকদার	মাগুড়া-২	আওয়ামী লীগ
৩	ধীরেন্দ্রনাথ সাহা	নড়াইল-১	আওয়ামী লীগ
৪	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
৫	পঞ্চানন বিশ্বাস	খুলনা-১	(উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৬	নারায়ন চন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	(উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৭	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	হবিগঞ্জ-২	(উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৮	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	(উপনির্বাচনে বিজয়ী)
৯	কল্পরঞ্জন চাকমা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
১০	বীর বাহাদুর	পার্বত্য বান্দাবরন	আওয়ামী লীগ
১১	দীপংকর তালুকার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	আওয়ামী লীগ
১২	গৌতম চক্রবর্তী	টাঙ্গাইল-৬	বিএনপি
১৩	ভারতী নন্দী (সরকার)	সংরক্ষিত মহিলা সংসদ	আওয়ামী লীগ
১৪	চিত্রা ভট্টাচার্য	সংরক্ষিত মহিলা সংসদ	আওয়ামী লীগ
১৫	এথিন রাখাইন	সংরক্ষিত মহিলা সংসদ	আওয়ামী লীগ

(সূত্রঃ Bangladesh Election Commission: Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, 1996, Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ৩৭-৬৭।)

[82] Bangladesh Election Commission: (1996), Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, Dhaka, Election Commission Secretariat, পৃ.পৃ. ৩৭-৬৭।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১২ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে মহিলাদের প্রতি সুবিচার করে। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৪.৫৪ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু যা ১৯৯১ সালের তুলনায় ০.৯১ শতাংশ সদস্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-১ থেকে পঞ্চানন বিশ্বাস, খুলনা-৫ থেকে নারায়ন চন্দ্র চন্দ, হবিগঞ্জ-২ থেকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং ঠাকুরগাঁও-১ থেকে রমেশ চন্দ্র সেন উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি থাকলেও প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় রাজনৈতিক অচল অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। এমতাবস্থায় জাতীয় পার্টির সমর্থনে ১৯৯৬ সালে ২৩শে জুন শেখ হাসিনা ২২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আবার ফিরে আসে এবং শেখ হাসিনা ছিলেন বাংলাদেশের দশম প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই মন্ত্রিসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কল্পরঞ্জন চাকমাকে পূর্ণমন্ত্রী ও সতীশ চন্দ্র রায়কে মৎস্য ও পশু সম্পদ বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[83]

১৯৯৬-এর জুনের নির্বাচনের পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল বিশেষভাবে বি.এন.পি ও তার সহযোগী সন্ত্রাসীদের দ্বারা, তা উল্লেখযোগ্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে অনেক দিন। সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই মূল আলোচনা হয় সন্ত্রাস নিয়ে। অথচ, সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে কোন কথা হয়নি। অসাম্প্রদায়িক, মৌলবাদমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল বলে দাবিদার যে আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তাদের এই নিরবতা ছিল, কি শুধু রাজনৈতিক কৌশল? সেজন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মিলিত দাবি, জাতীয় সংসদের সেই আইন পাস করা হোক যাতে আগামী দিনের নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ করতে না হয়।[84] তাদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল সংকটপূর্ণ।

বাংলাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০০১):

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল একটি উল্লেখযোগ্য সময়। এই সময়টি হল বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনামল।

---

[83] Bangladesh Election Commission: (1996), Statistical Report, 7th Jatiyo Shangshad Election, Dhaka, Election Commission Secretariat, p.p. 3-9.

[84] কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, (২০১৬), 'বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬)', ঢাকা, আগমনী প্রকাশনী, পৃ.পৃ. ৭৪৮-৭৫৫।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালের ১৩ই জুলাই সপ্তম জাতীয় সংসদে নির্ধারিত কার্যকাল শেষ হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোহম্মদ লতিফুর রহমানকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।[85] স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯১ সালে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচনকে প্রহসন থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেবার শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারেনি। কিন্তু ১৯৯৬-এর পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু-তনয়া শেখ হাসিনা কোন রাজনীতিবিদকে রাষ্ট্রপতি আসনে মনোনীত না করে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে উৎখাত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের ষড়যন্ত্রের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে 'কৃতজ্ঞতা ঋণ' শোধ করেছিলেন, তাতে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাস শুধু কলঙ্কিত হয়নি, বিচারপতি-রাষ্ট্রপতির দল নিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠিত উজ্জ্বল ভাবমূর্তিও ভুলুণ্ঠিত হয়েছিল। বিচারপতি লতিফুর রহমান শুধু দলনিরপেক্ষ অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান রূপে মনোনীত বিচারপতির ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেননি, নির্বাচনের সাংবিধানিক নিরপেক্ষতার ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি জোটকে (জামাতে ইসলামী, জাতীয় পার্টির একাংশ, ইসলামী ঐক্যজোট- এই তিন শরীফ দলকে নিয়ে চার দলীয় ঐক্যজোট গঠিত) ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান নানা রকমভাবে ষড়যন্ত্র, কারচুপি, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার, সংখ্যালঘু নির্যাতন- যত কিছু সম্ভব সব কিছুই করেছিলেন।[86]

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৫৫টি রাজনৈতিক দলের ১৯৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং এদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল ৪৮৬ জন। এই নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ৩০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যদিকে বিএনপি, জামায়েত ইসলামী, জাতীয় পার্টি (না-ফি) এবং ইসলামী ঐক্য জোট একত্রে 'চারদলীয় ঐক্যজোট' গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বিএনপি ২৫২টি আসনে, জামায়াতে ইসলামী ৩১টি আসনে, জাতীয় পার্টি (না-ফি) ১১টি আসনে এবং ইসলামী ঐক্যজোট ০৬টি আসনে প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কেবল ০১ জন করে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া দলের সংখ্যা ছিল ২২টি। ১৭টি দল ছিল যাদের প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২ থেকে ১০ জন এবং ১১ থেকে ৩০ জন প্রার্থী

[85] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১০৭-১০৮।

[86] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ২৬৯-২৭০।

মনোনয়ন দেওয়া দলের সংখ্যা ছিল ৬টি। জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট) নামে ২৮১টি আসনে, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ১৪০টি আসনে এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ৬৪টি আসনে প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছিল। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ হিন্দু লীগ একমাত্র গোপালগঞ্জ-৩ আসনে বীরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল।[87] অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫৫টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৫টি দল ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনোনয়ন দিয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১৪৫৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মধ্যে ৬০ জন (৫০ জন হিন্দু, ০৭ জন বৌদ্ধ ও ০৩ জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী) ধর্মীয় সংখ্যালঘু মনোনয়ন পেয়েছিল এবং স্বতন্ত্র ৪৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন প্রার্থী ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু। অর্থাৎ এই নির্বাচনে মোট ১৯৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিল ৭৯ জন যা মোট প্রার্থীর ৪.০৭ শতাংশ। ২০০১ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৫ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে ছিল। কিন্তু বি.এন.পি'র ধর্মীয় সংখ্যালঘু ০৫ জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ০৫ জনকে, জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) ০৪ জন এবং সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ০৫ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়।[88] এই নির্বাচনে ১১টি বামপন্থী দল মিলিতভাবে একটি নির্বাচনী ঐক্যজোট গড়ে তুলেছিল। এই বামপন্থী ঐক্য জোট ২৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নেত্রকোনা-১ আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রবাদপ্রতীম নেতা মণি সিংহের পুত্র দিবালোক সিংহ, একমাত্র তিনি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন এবং বাকিরা নির্বাচনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।[89]

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭,৪৯,৪৬,৩৬৪ জন। এই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৫,৬১,৮৫,৭০৭ টি এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৭৫.৫৯ শতাংশ। এই নির্বাচনে বিএনপি পেয়েছিল ৪০.৯৭ শতাংশ আর আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৪০.১৩ শতাংশ। দুটি দলের প্রাপ্ত ভোটের হারের পার্থক্য ছিল মাত্র ০.৮৪ শতাংশ, এক শতাংশও নয়। অথচ বিজয়ী আসন সংখ্যায় বিএনপি পেয়েছিল ১৯৬টি এবং আওয়ামী লীগ পেয়েছিল মাত্র ৬২টি আসন। এছাড়া অন্যান্য দলগুলির মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ১৭ টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ৪.২৮ শতাংশ), জাতীয় পার্ট (না-ফি) ০৪টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ১.১২ শতাংশ), ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট ১৪টি আসনে(প্রদত্ত ভোটের ৭.২৫ শতাংশ), ইসলামী ঐক্যজোট ০২ টি, (প্রদত্ত ভোটের ০.৬৮ শতাংশ), স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ০৬টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৪.০৬ শতাংশ), কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ এবং জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) ০১ টি করে আসনে জয়ী হয়েছিল। এই নির্বাচনে ১১ দলীয় বাম গণতান্ত্রিক জোট ১৭৫টি আসনে এবং জাতীয়

[87] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১১১-১১২।

[88] Bangladesh Election Commission: (2001), Statistical Report, 8th Jatiya Shangshad Election, Dhaka, Election Commission Secretariat, p.p. 202-317.

[89] তদেব, পৃ.পৃ. ২০২-৩২০।

সমাজতন্ত্রিক দল ৭৫টি আসনে প্রার্থী দিলেও তারা কোন আসনে জয়ী হতে পারেননি। এছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ হিন্দু লীগের একমাত্র প্রার্থী বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র মাত্র ৯২২টি ভোট পেয়ে শুধু পরাজিত হননি সাথে জামানত জব্দও হয়েছিল।[90]

সারণিঃ ৪.২৩ বাংলাদেশ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-২০০১)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র	রাজনৈতিন দল
১	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	আওয়ামী লীগ
২	পঞ্চানন বিশ্বাস	খুলনা-১	আওয়ামী লীগ
৩	প্রমোদ মানকিন	ময়নমনসিংহ	আওয়ামী লীগ
৪	বীর বাহাদুর	পার্বত্য বান্দারবন	আওয়ামী লীগ
৫	গৌতম চক্রবর্তী	টাঙ্গাইল-৬	বিএনপি
৬	ধীরেন্দ্রনাথ সাহা	নড়াইল-১	বিএনপি(উপনির্বাচনে জয়ী)
৭	মণি স্বপন দেওয়ান	রাঙ্গামাটি	বিএনপি
৮	মনোরঞ্জন শীল	দিনাজপুর-১	স্বতন্ত্র

সূত্রঃ Bangladesh Election Commission: Statistical Report, 8th Jatiya Shangshad Election, 2001, Dhaka, Election Commission Secretariat, p.p. 37-107.

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিল ০৮ জন যা মোট প্রার্থীর ২.৪২ শতাংশ মাত্র। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ০৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী বিজয়ী হন। ময়মনসিংহ-১ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রমোদ মানকিন, সুনামগঞ্জ-২ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, খুলনা-১ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে পঞ্চানন বিশ্বাস এবং বান্দরবান থেকে বীর বাহাদুর বিজয়ী হন। এছাড়া বিএনপির মনোনয়নে তিনজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী যথা টাঙ্গাইল-৬ থেকে গৌতম চক্রবর্তী, রাঙ্গামাটি থেকে মণি স্বপন দেওয়ান এবং নড়াইল-১ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ধীরেন্দ্রনাথ সাহা উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন এবং দিনাজপুর-১ কেন্দ্র থেকে মনোরঞ্জন শীল স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি.এন.পি এককভাবে ১৯৩ টি এবং জোটগতভাবে নেতৃত্বাধীন 'চারদলীয় ঐক্যজোট' ২১৬টি আসলে জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের বিপুল ও নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী জোট প্রধান বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে খালেদা জিয়া তৃতীয়বার বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ২০০১ সালের ১০ই

[90] Bangladesh Election Commission: (2001) Statistical Report, 8th Jatiya Shangshad Election, 2001, Dhaka, Election Commission Secretariat, p.p. 6-14.

অক্টোবর খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৬০ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রিসভায় ২৮ জন মন্ত্রী ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী ও ০৪ জন উপমন্ত্রীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যের ০২ জন মন্ত্রী হয়েছিলেন, গৌতম চক্রবর্তীকে জলসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং মণি স্বপন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[91] অষ্টম জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিসভায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য না থাকায় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক স্বার্থ একদিকে যেমন বিপন্ন হয়েছিল অন্যদিকে নির্বাচন পরবর্তীকালে জঙ্গিবাদের উত্থান ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়ন সারা বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকে সংকটে সম্মুখীন করে তুলেছিল।

বাংলাদেশে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০০৮):

অষ্টম জাতীয় সংসদে কার্যকাল অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের কার্যকাল শেষ হয়েছিল ২০০৬ সালের ২৭শে অক্টোবর। সংবিধান মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কে. এম. হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অস্বীকার করলে রাষ্ট্রপতি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। বিএনপি মনোনীত ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে প্রভাবিত রিয়াজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সেনাবাহিনী এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে পদচ্যুত করে। সেনাবাহিনী সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ না করে তাদের মনোনীত ডক্টর ফখরুদ্দীন আহমেদকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দু'বছর ক্ষমতায় থাকার পর নির্বাচিত সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অষ্টম সংসদ এবং নবম সংসদের মাঝখানে দু'বছর একটা শূন্যতা রয়েছে এটাও বাংলাদেশের সংসদের ইতিহাসের নতুন নয়। কারণ আমার আলোচনায় আগেও দেখিয়েছি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতীক যে বাংলাদেশের সংসদ তার ধারাবাহিকতা বারবার কিভাবে বিঘ্নিত ঘটেছে।[92] সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠনের ফলশ্রুতি হিসেবে ২০০৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এ.টি.এম শামসুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নির্বাচন কমিশন বহুকাঙ্খিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর দিনটি ধার্য করেছিল। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৮ টি রাজনৈতিক দলের ১৪১৬ জন প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র ১৫১ জন প্রার্থী সহ মোট ১৫৬৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাসদ, ওয়ার্কাস পার্টি সম্মিলিতভাবে ১৪ দলীয় মহাজোট

[91] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ. ১১৬।

[92] জাহান, এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ২৭১-২৭৬।

গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্ব দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি এবং এল.ডি.পি সম্মিলিতভাবে চার দলীয় ঐক্যজোটের।[93]

সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৬৪টি আসনে, জাতীয় পার্টি ৪৯ টি, জাসদ ০৭ টি, ওয়াকার্স পার্টি ০৫ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অন্যদিকে বিএনপি ২৬০ টি, জামাতে ইসলামী ৩৯ টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ০২ টি এবং এল.ডি.পি ১৮ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৮ টি রাজনৈতিক দলের মোট ১৪১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৯ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। এই ৪৯ জনের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ১০ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও ০১ জন ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এছাড়া স্বতন্ত্র ১৫১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন (০৮ জন হিন্দু ও ০৪ জন বৌদ্ধ) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ মোট ১৫৬৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬১ জন। যা মোট পার্থের ৩.৮৯ শতাংশ মাত্র।[94] অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ১৮ জন হ্রাস পেয়েছিল। যদিও আওয়ামী লীগ ২০০১ সালের মতো ২০০৮ সালের নির্বাচনে ১৫ জন সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন দেয়, ২০০১ সালের তুলনায় এই নির্বাচনে বিএনপির ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী দুজন বৃদ্ধি পেয়ে মোট ০৭ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা একজন হ্রাস পেয়েছিল বিগত নির্বাচনের তুলনায়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিকল্পধারা বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম-২ আসনে ভূদেব চক্রবর্তীকে, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল গাইবান্ধা-১ আসনে বীরেন চন্দ্র শীলকে এবং গণফোরাম ফরিদপুর-৩ আসনে স্বপন কুমার গাঙ্গুলিকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছিল। এই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের মত কোন সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।[95] যার ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের কোনো অস্তিত্ব থাকলো না এই নির্বাচনে, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক সংকট স্বরূপ হিসেবে দেখা দেয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৮,১০,৫৮,৬৯৮ জন। এই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৭,০৬,৪৮,৪৮৫ টি এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৮৭.১৩ শতাংশ যা ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটদান। এই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগে নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২ টি আসনের বিজয়ী হয়েছিল। আওয়ামী লীগ একাই ২৩০ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৪৮.০৮ শতাংশ), জাতীয় পার্টি ২৭ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৭.০৮ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ০৩টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৭২ শতাংশ) এবং

---

[93] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ. ১৩৮।

[94] শরীফ, আহমেদ, (২০১৭), 'বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র', ঢাকা, অনন্যা, পৃ.পৃ. ২২০-২২২।

[95] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ১৫১-৩০৯।

ওয়ার্কাস পার্টি ০২ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৩৭ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল। অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ৩৩টি আসন পেয়েছিল যার মধ্যে বিএনপি একাই ৩০ টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ৩২.৫০ শতাংশ), জামায়াতে ইসলামী ০২টি আসন (প্রদত্ত ভোটের ৮.৭০ শতাংশ), বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ০১ টি (প্রদত্ত ভোটের ০.২৫ শতাংশ), এল.ডি.পি. ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.২৭ শতাংশ) জয়লাভ করেছিল। এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়ী হয়েছিলেন ০৪ টি আসনে যাদের প্রদত্ত ভোট ছিল ২.৯৮ শতাংশ।[96]

সারণিঃ ৪.২৪ বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ-২০০৮)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচনক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল
১	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	আওয়ামী লীগ
২	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	দিনাজপুর-১	আওয়ামী লীগ
৩	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ
৪	রনজিত কুমার রায়	যশোর-৪	আওয়ামী লীগ
৫	বীরেন শিকদার	মাগুরা-২	আওয়ামী লীগ
৬	ননী গোপাল মন্ডল	খুলনা-১	আওয়ামী লীগ
৭	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৮	ধীরেন দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
৯	প্রমোদ মানকিন	ময়মনসিংহ	আওয়ামী লীগ
১০	সুকুমার রঞ্জন ঘোষ	মুন্সীগঞ্জ-১	আওয়ামী লীগ
১১	সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	আওয়ামী লীগ
১২	যতীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
১৩	দীপংকর তালুকদার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	আওয়ামী লীগ
১৪	বীর বাহাদুর	পার্বত্য বান্দারবন	আওয়ামী লীগ
১৫	অপু উকিল	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
১৬	সাধনা হালদার	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
১৭	এথিন রাখাইন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৯৮-১০৮।

[96] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ১৫১-৩০৯।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০৩ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে মহিলাদের প্রতি সুবিচার করে। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন রাখাইন উপজাতির এথিন রাখাইন। তিনি সপ্তম সংসদেও আওয়ামী লীগের মনোনীত মহিলা সংসদ ছিলেন। নবম সংসদে আওয়ামী লীগ মনোনীত অন্য দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা সংসদ হলেন সাধনা হালদার এবং অপু উকিল। এই তিন মহিলা সংসদকে নিয়ে ৩৪৫ আসন বিশিষ্ট নবম সংসদের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংসদ সংখ্যা ছিল ১৭ জন যা মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৪.৬৩ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু।[97]

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬২টি আসনে জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় রাষ্ট্রপতি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনে অনুরোধ জানালে সংসদনেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ৬ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৩৬ সদস্যবিশিষ্ট্য মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দু বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজত্বকালের অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের পুনর্জন্ম হয়েছিল। শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সদস্য হিসেবে রমেশ চন্দ্র সেনকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরূপে, দীপঙ্কর তালুকদারকে চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রীর রূপে এবং দিলীপ বড়ুয়াকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। দিলীপ বড়ুয়া বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রথম সংখ্যালঘু মন্ত্রী, যিনি সংসদ সদস্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় ঐক্যজোটভুক্ত সাম্যবাদী দলের নেতা। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে ৩১শে জুলাই মন্ত্রিসভার সম্প্রচারিত করে শেখ হাসিনা সংখ্যালঘু সংসদ প্রমোদ মানকিনকে সংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেন। এছাড়া ২০১১ সালের জুন মাসে সুনামগঞ্জের সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে পূর্ণমন্ত্রীরূপে রেলমন্ত্রণালয় দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর দুর্নীতি সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে তাকে রেল মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হয়েছিল। শেখ হাসিনা তাঁর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা কার্যকালে একসাথে পাঁচ জন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যের মন্ত্রিপরিষদে স্থান পাওয়া বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন রাজনৈতিক-বিশ্লেষকরা।[98] এর আগে কোন সরকারের শাসনামলে মন্ত্রিসভায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের একসাথে দেখা যায়নি, যা শেখ হাসিনার

[97] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৩৬-৫৮।

[98] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৫৯-১০৮।

দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় দেখা গিয়েছিল। এর ফলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী জাতীয় রাজনীতিতে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০১৪)

বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালের ২৫শে জানুয়ারি এবং সংসদের শেষ অধিবেশন হয়েছিল ২০১৩ সালের ২০শে নভেম্বর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৩ (৩)(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে ২৭শে অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ২৪শে জানুয়ারি ২০১৪ সালের মধ্যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করা ছিল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। সেই মতানুসারে বাংলাদেশের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রথা বাতিল হয়ে যায় এবং নির্বাচিত সরকারের অধীন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিধান প্রণীত হয়। সেইমতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হওয়ার পর নির্বাচিত সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত প্রথম এ নির্বাচনে দেশবাসীর মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি এবং আন্তর্জাতিক মহলেও ছিল ব্যাপক আগ্রহ।[99] কিন্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচনের দাবিতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ও জামায়েত ইসলামীসহ ১৮ দলীয় ঐক্য জোট দশম সংসদ নির্বাচন বর্জন করে। যার ফলস্বরুপ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), তরিকত ফেডারেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফেডারেশন সহ অন্যান্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মাত্র ১২টি রাজনৈতিক দল দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ। নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১৩ সালের ২৫ শে নভেম্বর তিনি নির্বাচনের তারিখ এবং সিডিউল ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের আদেশ অনুসারে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ ২০১৩ সালের ২রা ডিসেম্বর এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৩। এই নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পরে দেখা যায় ৩০০টি নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে ১৫৩টি নির্বাচনী কেন্দ্রে সংসদ সদস্যগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেছেন, যার মধ্যে আওয়ামী লীগেরই রয়েছে ১২৭ জন। যে নির্বাচনে দেশের অর্ধেকের বেশি ভোটার তাদের পছন্দমতো কোন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে না, তা গণতন্ত্রের জন্যে শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়, বিপদজ্জনকও। যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় সূচিত করে(৮২)।[100] এবং দেশের বাকি ১৪৭ টি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় ৫ই জানুয়ারি ২০১৪ সালে।

---

[99] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১৩৯-১৪০।

[100] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৩-৪।

সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৪৭টি আসনে, জাতীয় পার্টি ৮৬ টি আসনে, জাসদ ২৪ টি আসনে, ওয়াকার্স পার্টি ১৮ টি আসনে, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ০৩টি আসনে, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২৮টি আসনে, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বি.এন.এফ) ২২টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১০৪ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২টি রাজনৈতিক দলের মোট ৪৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জন ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু। এবং ২৬ জনের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মধ্যে ২১ জন ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ০৪ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও ০১ জন ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এছাড়া স্বতন্ত্র ১০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১ জন (০৭ জন হিন্দু ও ০৪ জন বৌদ্ধ) ছিলেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ মোট ৫৪৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। যা মোট প্রার্থীর ৬.৮১ শতাংশ মাত্র। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থী ২৪ জন হ্রাস পেয়েছিল। যদিও আওয়ামী লীগ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল যা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়ে দুজন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর আগে কোন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এত বেশি সংখ্যক সংখ্যালঘু প্রার্থীকে নির্বাচনে মনোনয়ন দেননি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের মত কোন সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।[101] যার ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের কোনো অস্তিত্ব থাকলো না এই নির্বাচনে, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হিসেবে দেখা দেয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৯,১৯,৬৫,১৬৭ জন। এই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ১,৭৩,৯২,৮৫০ টি এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৪০.০৪ শতাংশ। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক ভাবে ২৩৪ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৪৮.০৮ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল, জাতীয় পার্টি ৩৪ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৭ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ০৫ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ১.১৯ শতাংশ), ওয়ার্কাস পার্টি ০৬ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটের ২.১০ শতাংশ), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ০২ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ১.০৪ শতাংশ), জাতীয় পার্টির (জে.পি) ০২ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটের ০.৭৩ শতাংশ) এবং বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট মাত্র ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৬৩ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয়ী হয়েছিলেন ১৬ টি আসনে যাদের প্রদত্ত ভোট ছিল ১৫.০৬ শতাংশ।[102]

---

[101] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১৫৭-১৫৮।

[102] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন', ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৬০-৭৩।

সারণিঃ ৪.২৫ বাংলাদেশ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ-২০১৪)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচনক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল
১	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	আওয়ামী লীগ
২	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	দিনাজপুর-১	আওয়ামী লীগ
৩	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ
৪	রনজিত কুমার রায়	যশোর-৪	আওয়ামী লীগ
৫	স্বপন ভট্টাচার্য্য	যশোর-৫	স্বতন্ত্র
৬	বীরেন শিকদার	মাগুরা-২	আওয়ামী লীগ
৭	পঞ্চানন বিশ্বাস	খুলনা-১	আওয়ামী লীগ
৮	নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৯	ধীরেন দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
১০	পংকজ নাথ	বরিশাল-৪	আওয়ামী লীগ
১১	প্রমোদ মানকিন	ময়মনসিংহ	আওয়ামী লীগ
১২	সুকুমার রঞ্জন ঘোষ	মুন্সীগঞ্জ-১	আওয়ামী লীগ
১৩	মৃণাল কান্তি দাস	মুন্সীগঞ্জ-৩	আওয়ামী লীগ
১৪	জয়া সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	আওয়ামী লীগ
১৫	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
১৬	ঊষাতন তালুকদার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	স্বতন্ত্র
১৭	বীর বাহাদুর উশৈ সিং	পার্বত্য বান্দারবন	আওয়ামী লীগ
১৮	হেপী বড়াল	সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৬০-৮০।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০১ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনজন মহিলা সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হলেও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবশ্য আওয়ামী লীগ মাত্র একজন সংরক্ষিত মহিলা সংখ্যালঘু প্রার্থী হেপী বড়ালকে মনোনয়ন দিয়ে ছিল। এই ১৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জয় লাভ করে এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে যশোর-৫ থেকে স্বপন ভট্টাচার্য এবং রাঙ্গামাটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ঊষাতন তালুকদার বিজয়ী হয়েছিলেন দশম

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলাদের আসন ৪৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ করা হয়েছিল। ফলে এই এক জন মহিলা সংসদকে নিয়ে ৩৫০ আসন বিশিষ্ট দশম সংসদের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংসদ সংখ্যা ছিল ১৮ জন যা মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৫.১৪ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু।[103]

দশম সংসদ গঠন প্রক্রিয়ার শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ নবনির্বাচিত ১৪ দলীয় জোটের সংসদীয় দলনেত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানান। শেখ হাসিনা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এক অভিনব সরকার গঠন করেন যাকে তিনি বলেছিলেন ঐক্যমত্যের সরকার। যে সরকারে অংশ নিয়েছেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দল। দশম সংসদ নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বে গঠিত ৪৯ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদে, ২৯ জন মন্ত্রী ১৭ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ২ জন উপমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেছিলেন। ২৯ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে একজন সংখ্যালঘুও স্থান পায়নি, তবে অবশ্য ৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মন্ত্রীপরিষদের স্থান দিয়েছিলেন। যে চারজন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, যেমন বীর বাহাদুরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারায়ণ চন্দ্রকে মৎস্য প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়, বীরেন শিকদারকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং প্রমোদ মানকিনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী করা হয়। নবম সংসদের নির্বাচনে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুকন্যা যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পথ প্রশস্থ করে দিয়েছিলেন, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের উপর সেই আস্থা যে রাখতে পারেননি, তা তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সংখ্যালঘুদের অবস্থান দেখলে বোঝা যায়। প্রতিটা নির্বাচনের মত দশম সংসদ নির্বাচনেও সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল এবং তার জন্য তাদের অনেক কঠিন মূল্যও পরিশোধ করতে হয়েছে। যাই হোক বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য নির্বাচনের অর্থই হলো শুধুই হারানোর কিছুই পাওয়ার নয়।[104]

বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (২০১৮)

বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় এই নির্বাচনেও নির্বাচিত সরকারের অধীন নির্বাচন কমিশনারের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ‘মহাজোট’ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি.এন.পি) নেতৃত্বে গঠিত 'জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট' জোটসহ সর্বমোট ৩৯ দলের ১৭২০ জন ও স্বতন্ত্র ১২৮ জন প্রার্থী সহ মোট ১৮৪৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোট ৭৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

[103] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০০৮), ‘পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন’, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃ.পৃ. ৭-৮।

[104] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১৫৯-১৬০।

করেছিলেন যা মোট সদস্যের ৪.২৭ শতাংশ মাত্র। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যালঘু সদস্যদের মনোনয়নের দিক থেকে এককভাবে সবচেয়ে বেশি ১৮ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। তবে এই নির্বাচনের সামগ্রিকভাবে সংখ্যালঘু প্রার্থী বেশি মনোনয়ন দিয়েছিল বামপন্থী দলগুলি। যেমন সি.পি.বি মনোনয়ন দিয়েছিল ১৭ জনকে জাসদ ৯ জনকে, বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টি ০৭ জনকে। এছাড়া গণফোরাম ০৩ জন, বি.এন.এফ ০৩ জন, ন্যাপ ০২ জন এবং গণতন্ত্র পার্টি ০১ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে বি.এন.পি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ০৬ জনকে, জাতীয় পার্টি তিনজন ইসলামিক দল হিসেবে পরিচিত জাকের পার্টি ০১ জনকে মনোনয়ন দিয়েছিল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ০২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০,৪১,৪২,৩৮১ জন। এই নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৮,৫১,১৪,৪৩১ টি এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৮০.২ শতাংশ। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৫৭ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৭৪.৬৩ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল, জাতীয় পার্টি ২৩ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ৫.২২ শতাংশ), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৭ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ১৩.০৬ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ০২ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৭২ শতাংশ), ওয়ার্কাস পার্টি ০৪ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের.০.৭৬ শতাংশ), বিকল্পধারা বাংলাদেশ ও গণফোরাম ২ টি করে আসনে, বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৫১ শতাংশ), জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) ০১ টি আসনে(প্রদত্ত ভোটে ০.২১ শতাংশ) এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মাত্র ০১ টি আসনে (প্রদত্ত ভোটের ০.৩৩ শতাংশ) বিজয়ী হয়েছিল। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন ০২ টি আসনে যাদের প্রদত্ত ভোট ছিল ০.৯৬ শতাংশ।[105]

সারণিঃ ৪.২৬ বাংলাদেশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যালঘু সদস্যগণ (সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ-২০১৮)

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত সদস্যের নাম	নির্বাচনক্ষেত্র	রাজনৈতিক দল
১	রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও-১	আওয়ামী লীগ
২	মনোরঞ্জন শীল গোপাল	দিনাজপুর-১	আওয়ামী লীগ
৩	সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ-১	আওয়ামী লীগ
৪	রনজিত কুমার রায়	যশোর-৪	আওয়ামী লীগ
৫	স্বপন ভট্টাচার্য্য	যশোর-৫	আওয়ামী লীগ

[105] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, (২০১৮), 'পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচ, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,

৬	বীরেন শিকদার	মাগুরা-২	আওয়ামী লীগ
৭	পঞ্চানন বিশ্বাস	খুলনা-১	আওয়ামী লীগ
৮	নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	খুলনা-৫	আওয়ামী লীগ
৯	ধীরেন দেবনাথ শম্ভু	বরগুনা-১	আওয়ামী লীগ
১০	পংকজ নাথ	বরিশাল-৪	আওয়ামী লীগ
১১	মানু মজুমদার	নেত্রকোণা-১	আওয়ামী লীগ
১২	অসীম কুমার উকিল	নেত্রকোণা-৩	আওয়ামী লীগ
১৩	মৃণাল কান্তি দাস	মুন্সীগঞ্জ-৩	আওয়ামী লীগ
১৪	জয়া সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	আওয়ামী লীগ
১৫	জুয়েল আরেং	ময়মনসিংহ	আওয়ামী লীগ
১৬	কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	পার্বত্য খাগড়াছড়ি	আওয়ামী লীগ
১৭	ঊষাতন তালুকদার	পার্বত্য রাঙ্গামাটি	আওয়ামী লীগ
১৮	বীর বাহাদুর উশৈ সিং	পার্বত্য বান্দারবন	আওয়ামী লীগ
১৯	বাসন্তী চাকমা	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
২০	অরমা দত্ত	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ
২১	গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার	সংরক্ষিত মহিলা আসন	আওয়ামী লীগ

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৮ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ও ০৩ জন মহিলা সদস্য সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত দলীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিনজন সংখ্যালঘু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়ে মহিলাদের প্রতি সুবিচার করে। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন চাকমা উপজাতির বাসন্তী চাকমা। একাদশ সংসদে আওয়ামী লীগ মনোনীত অন্য দুই ধর্মীয় সংখ্যালঘু মহিলা সংসদ হলেন অরমা দত্ত এবং গ্লোরিয়া ঝর্না সরকার। এই তিন মহিলা সংসদকে নিয়ে ৩৫০ আসন বিশিষ্ট একাদশ সংসদের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংসদ সংখ্যা ছিল ২১ জন যা মোট নির্বাচিত সাংসদ সদস্যের মধ্যে ৬ শতাংশ ছিল ধর্মীয় সংখ্যালঘু।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন 'মহাজোট' ৩৩৮ টি আসনে (৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ) জয়লাভ করে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। যেখানে ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৩ জন উপমন্ত্রীকে নিযুক্ত

করেছিলেন। তাঁর এই মন্ত্রীসভায় মাত্র ৩ জন সংখ্যালঘু সদস্য মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে সাধন চন্দ্র মজুমদার 'খাদ্য মন্ত্রণালয়', বীর বাহাদুর উশৈ সিং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের' পূর্ণমন্ত্রী হয়েছিলেন। এবং স্বপন ভট্টাচার্য্য 'স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের' একমাত্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্রগুলোর ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও জটিল ইস্যু। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠী—উভয়েই তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোতে প্রান্তিক থেকে গেছে, যদিও প্রতিনিধিত্বের রূপ, মাত্রা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিকাশ লাভ করেছে।

১৯৫২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত নির্বাচন ক্ষেত্রগুলি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, স্বাধীনতার প্রথম কুড়ি বছর কংগ্রেস শাসনের সময় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মোট বিধায়কদের মধ্যে গড়ে মাত্র ১২ শতাংশ ছিলেন মুসলমান প্রতিনিধি এবং প্রথম বিধানসভায় মুসলমান সদস্য ছিলেন মাত্র ৮.৭৫ শতাংশ। দেশভাগের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের একটি অংশ দেশত্যাগ করে, ফলে মুসলমান সমাজের নেতৃত্বহীনতা ও বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরাট অনুপস্থিতি প্রতিনিধিত্বের প্রান্তিকরন ঘটিয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গণমুখী, প্রগতিবাদী ও সেক্যুলার রাজনীতির দাবিদার বামফ্রন্ট ১৯৭৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত টানা ৩৪ বছর রাজ্য শাসন করেছে এবং সংখ্যালঘু মুসলমানরা ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথচ মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কোন শর্তই বামফ্রন্ট সরকার মানেনি। রাজ্য বিধানসভা বা সংসদে তো নয়ই, এমনকি দলীয় পদেও গুরুত্ব দেয়নি সিপিআই(এম)। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলাতেও সম্পাদক করা হয়নি কোন মুসলমান নেতাকে। কেবলমাত্র মহম্মদ সেলিম খুব অল্প সময়ের জন্য বীরভূম জেলা সম্পাদক ছিলেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতা থাকাকালীন মুসলমান বিধায়ক ছিলেন গড়ে ১৩ শতাংশ এবং রাজ্য মন্ত্রিসভায় সর্বাধিক ০৫ জন খুব বেশি হলে ০৬ জন সংখ্যালঘু প্রতিনিধ মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং তারা কেউ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ পাননি।

২০১১ সাল থেকেই এই চিত্র পুনরায় পাল্টাতে শুরু করেছে, বর্তমানে সংখ্যালঘু মুসলমানরা ডানপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি নিজেদের সমর্থন বজায় রেখেছে। ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বিধানসভায় মোট সদস্যের প্রায় ২০ শতাংশ ছিল সংখ্যালঘু মুসলমান প্রতিনিধি। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা যেভাবে বেড়েছে বিধানসভায় তার প্রতিনিধিত্ব কমবেশি সেই হারে বাড়লেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক ০৭ জন ছিলেন মুসলমান প্রতিনিধি। এবং মুসলমান বিধায়কদের যে দপ্তরগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নগর উন্নয়ন দপ্তরের ছাড়া বেশিরভাগই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে রাজ্য

বিধানসভায় বা লোকসভায় (সাংসদ) পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান প্রতিনিধিত্ব সংখ্যানুপাতিক না হওয়ার একটি বড় কারণ মূলত আসন সংরক্ষণ। যার ফলে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে মুসলমানরা। এ নিয়ে রাজ্য মুসলমান সমাজে রয়েছে বিস্তর ক্ষোভ।

একইভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যে প্রান্তিকীকরণের সূত্রপাত ঘটেছিল পূর্ব পাকিস্তান কালপর্বে 'যুক্ত নির্বাচনী' ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে, তা স্বাধীন বাংলাদেশ কালপর্বে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি ও চেতনাকে করায়ত্তকরণের মধ্য দিয়ে 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' নিজ অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিল। ১৯৭৩ থেকে ২০২১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিকভাবে বলিষ্ঠ করার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়েছিল। ১৯৭৩ থেকে ২০২১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কোনো জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক দলগুলি সংখ্যানুপাতে মনোনয়ন প্রদান করেনি। এমনকি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতেও সংখ্যালঘুদের মনোনয়নের প্রবণতা সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি যা রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণ ও অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের সংকটকে সুতীব্র করেছিল। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর পর্বে যেখানে আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে পরিচিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সুতরাং লক্ষণীয় যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হল—ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অনেক সময় প্রতীকী রয়ে গেছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম নেতারা নির্বাচিত হলেও, বিশেষ করে গরিব ও নিম্নবর্গের মুসলমানদের দাবিগুলো প্রায়ই নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত হয় না। একইভাবে, বাংলাদেশে নির্বাচিত হিন্দু সংসদ সদস্যরা দলীয় নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীলতার কারণে স্পষ্টভাবে সংখ্যালঘু ইস্যুতে কথা বলার ক্ষেত্রে সংযত থাকেন। তবে একটি পার্থক্যও লক্ষণীয়; পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম ভোট একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফ্যাক্টর হওয়ায় দলগুলো কখনও কখনও মুসলিম প্রার্থীদের মনোনয়নে আগ্রহী থাকে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে হিন্দু ভোট বিভক্ত এবং তুলনামূলকভাবে কম কেন্দ্রীভূত, ফলে এটি রাজনীতিতে শক্তিশালী প্রভাব রাখতে কম সক্ষম।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানোর বিষয় নয়; বরং তা রাজনৈতিক নিরাপত্তা, বাক-স্বাধীনতা ও সক্রিয় নাগরিকত্বেরও সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও রাজনৈতিক শঙ্কা ও অভিযোগ থেকে মুসলিম সম্প্রদায় মুক্ত নয়। অপরদিকে, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ এবং ভোটাধিকারে বাধা দেওয়া হয়েছে—যা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকে নিছক একটি ভয়ভীতির পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি কেস স্টাডি

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বাংলাদশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষত হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান এর উপর যে চিত্র উঠে এসেছে সেখানে একটি বিষয় স্পষ্টত প্রামণিত যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এর পিছনে বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল বাংলাদেশী হিন্দুদের দেশান্তরিত হওয়ার ঘটনা। বিশেষ করে বাংলাদশের সীমান্তবর্তী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। সাধারনত 'দেশান্তর'কে আক্ষরিক অর্থে বলা যায় 'এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিগমণ'। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই লক্ষ করা যায় মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের দেশান্তর ঘটেছে বারংবার, যার পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে আরও উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু এই সহজ অঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে দেশান্তরের সঙ্গে যদি যুক্ত হয় দেশভাগ কিংবা একটি জাতির মুক্তি অর্জনের জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতা তখন দেশান্তরের প্রসঙ্গটি একটি অন্য ব্যঞ্জনা বহন করে।[1] 'স্থানান্তরন' তথা মাইগ্রেশন আজ আর কোনও একটি দেশের সমস্যা নয়। এটি সারা বিশ্বের এক জ্বলন্ত সমস্যা। স্থানান্তর যেমন একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তার সমস্যা তেমনি স্থানান্তরিতদের আত্মপরিচয় ও মানবিক অধিকারেরও গভীর সমস্যা।[2]

১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং তার পরবর্তী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতের ইতিহাস কিংবা আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস যেভাবে দেশান্তরিত মানুষের আগমনের সাক্ষী থেকেছে তার অভিঘাত অনুভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি-জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে।[3] পূর্ব পাকিস্তান—পরবর্তীকালে বাংলাদেশ—থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আগমন শুধু একটি জনসংখ্যাগত স্থানান্তরের ঘটনা নয়, বরং তা ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর, যা বাস্তুচ্যুতি, প্রান্তিকতা এবং নতুন করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় চিহ্নিত। এই উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী কেবলমাত্র ভৌগোলিক সীমান্ত অতিক্রম করেনি; তারা বহন করে এনেছে এক ধরনের সংখ্যালঘু সত্ত্বার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা, যা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংঘর্ষ ও সংলাপের মাধ্যমে নতুন রূপ ধারণ করেছে। তাই এই অধ্যায়ে মূলত বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গে আগমনের কারণ, অভিগমনের স্থান এবং তাদের জীবন প্রবাহ একটি কেস স্টাডি হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনার গুরুত্ব দু'টি নির্দিষ্ট কারণে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, এটি পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে

[1] মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ, (মার্চ, ২০১৯), স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ. একক মাত্রা, পৃ. ১২।

[2] নাগ, সৌমেন, (মার্চ, ২০১৯), স্থানান্তরিত জনস্রোতের সুনামি আনতে পারে বিপর্যয়. একক মাত্রা, পৃ. ২৬।

[3] মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

উপস্থাপিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু অভিজ্ঞতার তুলনামূলক কাঠামোকে আন্তঃসীমান্ত প্রেক্ষাপটে সম্প্রসারিত করে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের অভিজ্ঞতা একটি ভিন্ন মাত্রার 'সংখ্যালঘুতা' প্রকাশ করে—যেখানে তারা সংখ্যাগুরু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও উদ্বাস্তু ও পরবাসী পরিচয়ের কারণে প্রান্তিকতার এক ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন।

তাদের এই বাস্তুচ্যুতি ও পুনর্বাসনের অভিজ্ঞতা কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত বেদনার আখ্যান নয়; এটি এক বৃহত্তর রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ধর্ম, ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতীয় পরিচয়ের দ্বন্দ্ব এক জটিল বাস্তবতা রূপে উদ্ভাসিত হয়।

বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের পশ্চিমবঙ্গে অভিগমনের কারণঃ

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনে বর্তমান করুণ পরিনতির পিছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। "১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাজনের পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে যে দুর্ভাগ্যের সূচনা হলো তার আর শেষ হলো না বুঝি"। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ নিজদেশে পরবাসী হয়ে রয়েছে। শহর, গঞ্জ, গ্রাম-গ্রামান্তরে সাম্প্রদায়িকতা, ভারতবিদ্বেষ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। ভারতবিদ্বেষজাত হিন্দুবিদ্বেষ সাধারণ মানুষের চেতনায় সমার্থক। পাকিস্তানি দ্বিজাতিতত্ত্বের বড় লালনকর্তার ভূমিকা পালন করে চলেছে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের শাসককুলই। নিরন্তর ধর্মীয় পার্থক্যকে মূর্ত করে তোলার প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকারের কোন খামতি নেই। যার তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারি প্রতিক্রিয়ায় স্বাধীনতা উত্তর-পূর্ব সময়কালে প্রায় দুই কোটি ধর্মীয় হিন্দু সংখ্যালঘু নরনারী--আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।[4] থানা-পুলিশ-প্রশাসন পূর্ব বাংলার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেয় না। আইন-আদালতে তাদের জন্য সুবিচার নেই। কদাচিৎ দু'একটি ক্ষেত্রে 'রায়' পেলেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদের জন্য 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।[5] ভিয়েতনাম, প্যালেষ্টাইন, ইজরাইল, সিরিয়া বা সুদূর আফ্রিকা নয়—আমাদেরই নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে এত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অধিকার হরণের ঘটনা ঘটে চলেছে বছরের পর বছর ধরে- আমরা কী কেউ তার খোঁজ রাখি?

১৯৪৭ সালে 'খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা' এবং পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও বিবাদের ঘটনা। অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা দিয়ে উপমহাদেশে সংখ্যালঘু মানুষের উচ্ছেদ যজ্ঞ শুরু হয়েছিল। দেখতে দেখতে অতি দ্রুততার সহিত বিহার, পাঞ্জাবে এই

[4] প্রামাণিক, বিমল, (২০০৮), 'পশ্চিমবঙ্গের অশনিসংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ', কলকাতা. জি. সি. মোদক, পৃ. ২৫।

[5] তদেব, পৃ. ২৫।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে আরম্ভ করে। ১৯৪৬-এ হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংখ্যালঘু মানুষের মনে ব্যাপক ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে সীমান্ত পেরিয়ে কাতারে কাতারে সংখ্যালঘু মানুষ ভারতে প্রবেশ করে। এই প্রসঙ্গে ক্রমে একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়-তাহল ভারতের পশ্চিম ও পূর্বসীমান্তে দু'রকমভাবে সংখ্যালঘু সমস্যার উদ্রেক শুরু হল। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সংখ্যালঘু মানুষের আগমন ঘটল একসাথে। শুধু তাই নয়, ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যস্থতায় জনবিনিময় ও সম্পত্তি বিনিময় নীতির দ্বারা অচিরেই পশ্চিম সীমান্ত অর্থৎ পাঞ্জাবে সংখ্যালঘু সমস্যার নিরসন ঘটল। কিন্তু ভারতের পূর্ব প্রান্তে অর্থৎ বিভক্ত বঙ্গের সংখ্যালঘু মানুষের সমস্যার সমাধান হল না। বিভক্ত বঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতি হল-যে কোন শর্তে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের আগমন আটকানো। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত এই নীতির দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উচ্ছেদ-সাধন আটকানো গেল না। বিভাজিত ভারতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু মানুষের উচ্ছেদসাধন যেন একটি সহজ সত্যে পরিণত হল।[6] যার ফলস্বরূপ ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের ভারতের আগমনের ক্ষেত্রে বহুবিধ কারণ ছিল।

পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য, অত্যাচার ও দুঃশাসনের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)

দেশ বিভাজনের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে বাধ্যতামূলকভাবে ভারতে চলে আসা সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহের অন্যতম। পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও বিবাদের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আইনের শাসন প্রবর্তন করতে সক্ষম না হওয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় দেশত্যাগের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। "পাকিস্তান গঠনের সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। পাকিস্তানের প্রশাসনি ব্যবস্থা এমন রূপ ধারণ করে যার ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়"।[7] সাম্প্রদায়িক হিংসা, সামাজিক নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক সংকট ও নিরাপত্তার অভাবের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ নিজেদের বিপন্নবোধ করে এবং নিজের জন্মভূমির ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে আসে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রায় ১১ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন, যার মধ্যে

[6] পাল, বাবুল কুমার, (২০১০), বরিশাল থেকে দণ্ডকারন্য পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস. কলকাতা. গ্রন্থমিত্র, পৃ. ৬০।

[7] প্রামাণিক, বিমল, (২০০৮), পশ্চিমবঙ্গের অশনিসংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ. কলকাতা. জি. সি. মোদক, পৃ. ২৮।

প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ ছিলেন শহুরে পেশাজীবী, ৫ লাখ ৫০ হাজার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, ১ লাখের কিছু বেশি কৃষক এবং ১ লাখের কিছু কম ছিলেন কারিগর।[8]

দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে যে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার ক্ষেত্রে নানা ঘটনা অনুঘটক হিসাবে কাজ করে চলেছে। এ বিষয়ে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ভারতের হায়দ্রাবাদের 'পুলিশ অ্যাকশন' হিন্দু-বিরোধী মানসিকতা তৈরী করতে সাহায্য করেছিল।[9] দৃষ্টান্তস্বরূপ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'উদ্বাস্তু' থেকে একটি ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারেঃ এক হিন্দু মহিলা পুকুরে স্নান করতে নেমেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু যুবক ও বৃদ্ধ মুসলমান পুকুরের দু'পারে জড়ো হয়ে অশ্লীল ছড়া কাটতে শুরু করল। এপার থেকে আওয়াজ উঠল-"পাক পাক পাকিস্তান"। অন্য পার থেকে উওর এল, "হিন্দুর ভাতার মুসলমান"। ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমান সিঁড়ি বেয়ে স্নানের নেমে এসে বলল, "বিবিজান, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! দেরি করছো কেন? বাড়ি যাবে না?" মেয়েটি তখনও জলের মধ্যে স্থির, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর দু'পারে সমবেত মানুষের আনন্দোল্লাসের মধ্যে মধ্যবয়স্ক লোকটি বলল, "আরে, তোদের চাচির গাঁটগুলো শক্ত হয়ে হেছে রে। ওর নড়বার শক্তি নেই। তোরা ওকে হাত ধরে জল থেকে তুলে নিয়ে আয়"।[10]

হিন্দুরা কী ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণায় পুড়ছিল, এ ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। এরা হিন্দু মধ্যবিত্ত। এরাই পূর্ববঙ্গের সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী সম্প্রদায়। স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের আচার-আচারণ একেবারে পালটে যায়। তারা সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের, বিশেষত হিন্দু নারীদের নির্যাতন করে তাদের অস্থির করে তোলে। তাদের নিরাপত্তাবোধ নষ্ট করে দেয়। তা সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুরা তাদের ভিটে-মাটি কামড়ে পড়ে থাকত যদি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন তাদের পাশে দাঁড়াত। ঘটেছিল কার্যত ঠিক উল্টোটাই। সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মুসলমানদের সঙ্গে পাকিস্তানি প্রশাসনের যোগসাজেশ ছিল। যার ফলস্বরূপ হিন্দুদের মনে সরকারের প্রতি অনাস্থা জন্মেছিল। এবং নিরুপায় হয়ে তারা অজানা, অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছিল।[11]

১৯৫০ সালে হিন্দু সংখ্যালঘুদের পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আগমনের হার সবচেয়ে তীব্রতর হয়। এর কারণ ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। খুলনা জেলার বাগের কালশিরা গ্রামে পুলিশ জনৈক কমিউনিস্ট যুবককে গ্রেপ্তারের জন্যে গিয়ে এক হিন্দু রমণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে গ্রামবাসীদের যৌথ আক্রমণে এক পুলিশকর্মী নিহত হয়। এর পর পালটা অভিযানে পুলিশ আশেপাশে হিন্দু গ্রামগুলিতে আক্রমণ করলে সেখানে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গে এটা ছিল প্রথম দাঙ্গা। পূর্ব-পাকিস্তানের নিরস্ত্র, অসহায় সুংখ্যালঘু

[8] চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), প্রান্তিক মানব. কলকাতা. দীপ প্রকাশন, পৃ. ১৮।

[9] বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, (১৯৭০), উদ্বাস্তু. কলকাতা. সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৫৬।

[10] তদেব, পৃ. ১৫৭।

[11] চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), প্রান্তিক মানব. কলকাতা. দীপ প্রকাশন, পৃ. ২২।

হিন্দুদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য, হিন্দু নারীদের তাদের পিতা অথবা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন শুরু করে, তার ফলে যন্ত্রণায় কাতর, নিরুপায় ও পুরোপুরি বিধ্বস্ত এক বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠী এক বিশাল হিমপ্রবাহের মতো পশ্চিমবঙ্গে এসে আছড়ে পড়ে।[12] মুখ্যত গণতন্ত্রাণের দাবি প্রতিহত করার জন্য মুসলিম লিগ রাজনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে দাঙ্গা বাধিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আতঙ্কিত মুসলমানেরাও এবার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে যেতে শুরু করে। পরিস্থিতি তখন এতই মারাত্মক হয়ে উঠেছিল যে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান এবং তাদের জীবন নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে ৪ এপ্রিল ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে **'নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি'** নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী সীমান্তের দুদিকের উদ্বাস্তরা যাতে ঘরে ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের আশ্বস্ত করা হয়। তারা যে স্থাবর সম্পত্তি ফেলে এসেছে, তার মালিকানা তাদের আছে। চুক্তিতে বলা হয়, "উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করবে"। তাদের জীবন, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয় এবং মত প্রকাশ ও ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়।[13]

'নেহরু-লিয়াকৎ' চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যেসব মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তারা সবাই স্বদেশে ফিরে আসে। ভারতে আইনের শাসন বহাল থাকায় তারা যাতে তাদের এদেশে ফেলে যাওয়া স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পায় তার জন্য নেহরু উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ফলে চুক্তির শর্তাদি বহুলাংশে কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু উদ্বাস্তরা পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারেনি। কেননা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসন **'নেহরু-লিয়াকৎ'** চুক্তি কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে ধর্মীয় হিন্দু সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারেনি বা সে চেষ্টাও করেনি। ফলে যারা গিয়েছিল, তারাও তাদের স্থাবর সম্পত্তি ফিরে পায়নি।[14] উপরন্তু ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের আইন সভায় এমন কয়েকটি আইন পাশ করানো হলো যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিজেদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। এই সময়কার পূর্ব-পাকিস্তান সরকারকৃত গৃহীত আইনগুলির মধ্যে একটি ছিল-

'The East Bengal Evacuees Property (Restoration of Possession) Act 1951(Act XXIII): এটি একটি ভণ্ডামীর আইন, পাকিস্তান যে কাগজে-কলমে 'নেহরু-লিয়াকৎ' চুক্তিকে যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে তা দেখানোর চেষ্টা। পাকিস্তান সরকার খুব ভালো করেই জানত, সম্পত্তি নেবার জন্য কোনো হিন্দু ফিরবে না। যদি একটি হিন্দুও ফিরে আসে তাহলে তারা যাতে সম্পত্তির পুর্নদখল না পায় তার জন্য সরকার উপযুক্ত

[12] হোসেন, মোল্লা আমীর, (২০১৮), হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (খুলনা পর্ব) ১৯৪৭-৭১, ঢাকা. সুবর্ণ প্রকাশণী, পৃ. ২১৬।

[13] প্রামাণিক, বিমল, (২০০৮), পশ্চিমবঙ্গের অশনিসংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ. কলকাতা. জি. সি. মোদক, পৃ. ২৮।

[14] চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), প্রান্তিক মানব. কলকাতা. দীপ প্রকাশন, পৃ.পৃ. ১৮-১৯।

বন্দোবস্ত করেছিল 'The East Bengal Evacuees (Administration of Immovable Property) Act 1951 (XXIV) এই আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। এই আইনে বলা হয়েছিল যে যদি কোনো হিন্দু নিজের সম্পত্তি পুর্নদখল নেবার জন্য ভারত থেকে ফিরে আসে তাহলেও সে দখল পাবে না, যদি সেই সম্পত্তি ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকার সরকারী কাজে অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল নিয়ে থাকে।[15] তৎকালীন পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা কীভাবে এবং কতখানি প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই দুটো আইন।

১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার ভারতে গমনাগমনের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করায় পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে এরপর ইচ্ছামতো আর ভারতে যাতায়াত করা যাবে না। এই আশঙ্কায় কেবলমাত্র সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে।[16] এরপর 'The Prevention of Transfer of Property and Removal of Documents and Records act, 1952' (East Bengal Act) এবং 'East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance of 1954' এই আইন দুটো প্রণয়নের দ্বারা পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনোবল আবার ভেঙ্গে দেয় এবং সরকারের অনুমতি ছাড়া হিন্দু সম্প্রদায় তাদের নিজেস্ব সম্পত্তিও বিক্রি করার অধিকার হারায়। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী 'Pakistan Administration of Evacuees Property Act XII of 1957' আইন জারি করে এবং Elective Body Disqualification order of 1959' নামের একটি অমানবিক আইন প্রয়োগ করে ৬ জন বিশিষ্ট সংখ্যালঘু হিন্দু নেতাকে সরকারি অফিসের পক্ষে অযোগ্য ঘোষণা করে। এছাড়াও ১৯৫৫ থকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বেশকিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সংঘটিত হয়। এসব কারণে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী নিরাপত্তার সন্ধানে ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকে।[17]

১৯৫৮ সালে ৪ই অক্টোবর পাকিস্তান জুড়ে এক Coup d'etat বা সেনা অভ্যুত্থান ঘটে এবং অসামরিক সরকার গদিচ্যুত হন। স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন এবং সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন।[18] আইয়ুব খান পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হিন্দু সমাজের অংশগ্রহণের কার্যকারিতা বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হন। সমাজের সর্বক্ষেত্র থেকে হিন্দু উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় হিন্দু সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয় এবং ব্যাপকহারে

[15] রায়, তথাগত, (২০২২), যা ছিল আমার দেশ. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ.পৃ. ১৮১-১৮২।

[16] বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, (১৯৭০), উদ্বাস্তু. কলকাতা. সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৯৫।

[17] আজাদ, সালাম, (১৯৯৬), হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে. ঢাকা. সাস পাবলিকেশন্স, পৃ. ৮৭।

[18] রায়, তথাগত, (২০২২), যা ছিল আমার দেশ. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ১৮৯।

নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে। এই হয়রানির ফলে বহু হিন্দু নেতা এসময় দেশ ত্যাগ করেন, অন্যরা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন দেশে প্রবল ভারতবিদ্বেষ ও হিন্দুবেদ্বেষ প্রচার করে।[19]

আইয়ুব খান সরকার কীভাবে হিন্দুদের জীবন দুর্বিষহ করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করত তার কিছু বিবরণ জয়ন্তকুমার রায় দিয়েছেন। আইয়ুব সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ধর্মী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে তাড়াতে পারলে পুর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানরা অনেক নরম হবে এবং পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের প্রভুত্ব মেনে নেবে। সেইজন্য তারা ছোট ছোট, স্থানীয় স্তরে নির্যাতনে উৎসাহ দিত। জয়ন্তকুমার রায় এমন দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, যথা- ১৯৬১ সালের মে-জুন মাসে ফরিদপর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) ইস্ট পাকিস্তান রাইফলস (একটি আধাসামরিক বাহিনী) সরাসরি হিন্দুহত্যায় অংশ নিয়েছিল। এই অঞ্চলের হিন্দুরা প্রধানত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের, অনেকেই 'মতুয়া' অর্থাৎ 'হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের' অনুগামী। তথাকথিত উচ্চবর্ণের শহুরে হিন্দুদের তুলনায় এঁরা ছিল অনেক বেশি সাহসী। একসময় এই উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ নমঃশূদ্র মানুষদের ছায়া মাড়ালে স্নান করতেন, কিন্তু এই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের মত ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি, বহু চেষ্টা করেও এদের মুসলমান করা যায়নি। এরকম একটি প্রচেষ্টার পরে মুসলমানরা নমঃশূদ্রদের আক্রমণ করে, নমঃশূদ্ররা প্রতিআক্রমণ করে। এই পরিস্থিতিতে ইস্ট পাকিস্তান রাইফলস-এর লোক এবং মুসলমানরা যৌথ ভাবে নমঃশূদ্রদের উপর আক্রমণ করে। তৎকালীন ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানান যে আনুমানিক প্রায় পাঁচশ হিন্দু মারা গিয়েছিল এবং বহু আহত ও নিখোঁজ হয়েছিল।

অন্য ঘটনাটি ঘটেছিল রাজশাহীতে, ১৯৬২ সালে ২২শে এপ্রিল। পাকিস্তানী সামরিক শাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান এদিন রাজশাহীতে একটি অত্যন্ত উত্তেজকপূর্ণ ভাষণ দেন, যে ভাষণে তিনি পুরোপুরি কল্পিত ভাবে ভারতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার কথা বর্ণনা করাছিলেন। আজম খানের বক্তৃতায় আরও এক হিন্দু নিধন যজ্ঞ আরম্ভ হল এবং রাজশাহীর সহকারি হাই কমিশনারের তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদের ফলেই এ ব্যাপারে হত্যা বন্ধ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই হত্যাকাণ্ডে আনুমানিক প্রায় তিন হাজার অমুসলিম অর্থাৎ প্রধানত হিন্দু, কিছু সাঁওতাল বা উপজাতিরাও খুন হয়।[20] এই সকল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও বৈষম্যের শিকার হয়ে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ লাখ সংখ্যালঘু মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে।[21] ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরে 'হযরতবাল' মসজিদ থেকে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্ত বর্বোরোচিত ঘটনাগুলি

[19] রহমান, মতিউর ও হক, সৈয়দ আজিজুল, (১৯৯০), বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়. ঢাকা. জ্ঞান প্রকাশনী, পৃ. ৩১।

[20] রায়, তথাগত, (২০২২), যা ছিল আমার দেশ. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ.পৃ. ১৯২-১৯৩।

[21] প্রামাণিক, বিমল, (২০০৮), পশ্চিমবঙ্গের অশনিসংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ. কলকাতা. জি. সি. মোদক, পৃ. ৩১।

ঘটে তারই ফলশ্রুতে ব্যাপক সংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় পুনরায় তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে।[22] ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রাক্কালে পাকিস্তান সরকার ৬ সেপ্টেম্বর **'Defence of Pakistan Ordinance'** চালু করার ফলে দেশের হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্দশা আরেক দফা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৬ সালে জারি হয় **'East Pakistan Enemy Property (Lands and Building) Administrations and Disposal Order of 1966'** আইন, যা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব-পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।[23] যার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জীবন প্রবাহ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই আইন পাকিস্তান শাসনকালে জারি হলেও এর কার্যকারিতা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের আমলেও অব্যাহত।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশের নির্বাচনের ফল শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পক্ষে যায়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সংসদ বা ফেডারাল অ্যাসেম্বলীতে শেখ মুজিব ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭ পেলেন অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এবং পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক সংসদে ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮ পেলেন-অর্থাৎ নব্বই শতাংশেরও বেশি আসন। নির্বাচনের এই ফল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলনা। এই সময় ঢাকায় জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং শেখ মুজিবরের বৈঠকও ব্যর্থ হয়। তারপর এল বহু কাঙ্ক্ষিত বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত ঘোষণা **"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"** এবং এক কালান্তক দিন, কেয়ামতের মত, ১৯৭১-র ২৫শে মার্চ যেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মেজর জেনারেল খাদিম হুসেন রাজা ও রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে নিজের দেশের নাগরিকদের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ব্যাপক ও নৃশংসতম হত্যালীলা চালাল। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী।[24] এ সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম কবির তাঁর 'Minority Politics in Bangladesh' গ্রন্থে লিখেছে-

"In order to crush the nationalist movement the Pakistan army started a campaign of genocide in Bangladesh on 25 March 1971. The Hindus in particular were targets of the army. In the first few days of the Pakistan army's operations, their targets were the student's, dormitories, Bengali police and East Pakistan Rifles headquarters, and the Hindu populated areas of Dacca. In other cities, too, Hindus become prime targets of the army crackdown. Prominent Hindu politicians, lawyers, doctors, businessmen and teachers, whenever found, were killed by the army. During the entire period of the civil war, they were discriminated against by the Pakistan army. Their houses were

[22] রায়, তথাগত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

[23] প্রামাণিক, বিমল, (২০০৮), পশ্চিমবঙ্গের অশনিসংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ. কলকাতা. জি. সি. মোদক, পৃ. ৩২।

[24] রায়, তগতথা, (২০২২), যা ছিল আমার দেশ. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ.পৃ. ২০৫-২০৬।

bunt, property looted, women raped and temples destroyed. Under such circumstances, they either had to cross the border and take shelter in India, or else had to flee to the remote villages where there were no army camps. Later, their lives in the villages were also made insecure when the Pakistan army recruited 100000 Razakers, a Bengali collaborator military force".[25]

এই সময় বাংলাদেশের ধর্মীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ১২০০ বছরের পুরানো ঢাকার ঐতিহাসিক রমনা কালীমন্দির পাকিস্তানি সেনানাহিনী দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনী প্রামান্য এবং বিস্তারিতভাবে সম্ভবত এই প্রথম বর্ণিত হয়েছে। যার ফলে ১৯৭১ সালের হিন্দুবিরোধী পৈশাচিকতার কাহিনী খানিকটা বিশ্বদুয়ারে উন্মচিত হয়। তবে পৈশাচিকতা যে কত নির্মম হতে পারে সেটা আন্দাজ করা বোধহয় কঠিন। পূর্ব-পাকিস্তানে যত জায়গায় এই ধরনের বীভৎস অত্যাচার হয়েছিল তার মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে মারাত্মক খুলনা জেলা, ডুমুরিয়া উপজেলার ছোট শহর চুকনগরের গণহত্যা। চুকনগর জায়গাটি খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের সঙ্গে যশোর থেকে আসা মহাসড়কের সংযোগস্থল-খুলনা ও যশোর থেকে আনুমানিক পঁচাশি কিলোমিটারের মাঝে অবস্থিত। খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কটি সাতক্ষীরা হয়ে আরও পশ্চিমে ভোমরা-ঘোকসাডাঙা সীমান্ত হয়ে বসিরহাটের কাছে ভারতে ঢুকেছে। শহরের পাশ দিয়ে ভদ্রা নামে ছোট নদীও প্রবাহিত। এই শহরটি কয়েকটি মহাসড়কের সংযোগস্থল হবার দরুণ এবং নৌকায় করে জলপথেরও সুবিধা থাকার দরুণ খুলনা, বাগেরহাট এমনকি পিরোজপুর অঞ্চল থেকে বিশাল সংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দু এখানে জড়ো হয়েছিল- উদ্দেশ্য সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া। কারণ তারা জানতে পেরে গিয়েছিল পাক সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই তাদের উপর প্রচণ্ড হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করবে। তারপর যা ঘটেছিল তার পাশে ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যাকাণ্ডও ম্লান হয়ে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী এই অসহায়, নিরস্ত্র সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। যার ফলস্বরূপ চুকনগরে আনুমানিক নয় থেকে দশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল।[26] এছাড়া আরও একটি ভয়ঙ্কর গণহত্যা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, যেখানে অমুসলমান ছাত্ররা থাকতেন এবং থাকেন। এই জগন্নাথ হলের গণহত্যা সম্বন্ধে সবিস্তার উল্লেখ পাওয়া যায় রতনলাল চক্রবর্তীর লেখা "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যাঃ ১৯৭১, জগন্নাথ হল" বইতে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে আনুমানিক তিনশত ছাত্র ও সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছিল।

[25] Kabir, Muhammad Ghulam, (1980). Minority Politics in Bangladesh, Dhaka, Vikas Publisher, p.p. 83-84.

[26] রায়, তগতথা, (২০২২), যা ছিল আমার দেশ. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ.পৃ. ২১৯-২২০।

সারণিঃ ৫.১, ১৯৭১ সালের উল্লেখযোগ্য গণহত্যাগুলির একটি সার্বিক চিত্র দেওয়া হয়েছে।

গণহত্যার স্থান			তারিখ (১৯৭১)	গণত্যার বলি	গণহত্যাকারী	আনুমানিক নিহতের সংখ্যা
গ্রাম/শহর	জেলা	বিভাগ				
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা শহর	ঢাকা	২৫ মার্চ	হিন্দু,ছাত্র, আওয়ামী লীগ সমর্থক	পাকিস্তানী সেনাবাহিনী	৩১০ +
শাঁখারিপট্টি	ঢাকা শহর	ঢাকা	২৬ মার্চ	হিন্দু	পাক সেনা	৮০০০
রমনা কালীবাড়ি, সূত্রাপুর	ঢাকা শহর	ঢাকা	২৭ মার্চ	হিন্দু	পাক সেনা	২৬৫
জিঞ্জিরা	ঢাকা শহর	ঢাকা	১ এপ্রিল	হিন্দু	পাক সেনা	১০০০ +
আখিরা	দিনাজপুর	রংপুর	১৭ এপ্রিল	হিন্দু	পাক সেনা, বিহারী মুসলমান	৯৩-১২৫
জাঠিভাঙা	ঠাকুরগাঁও	রংপুর	২৩ এপ্রিল	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	৩০০০-৩৫০০
কড়ই কাদিপুর	জয়পুরহাট	রাজশাহী	২৬ এপ্রিল	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	৩৭০
কালিগঞ্জ	নীলফামারি	রংপুর	২৭ এপ্রিল	হিন্দু	পাক সেনা	৪০০
ঈশানগোপালপুর	ফরিদপুর	ঢাকা	২ মে	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	২৮
মুজফরাবাদ	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৩ মে	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	৩০০ +
গোপালপুর	নাটোর	রাজশাহী	৫ মে	আওয়ামী লীগ সমর্থক	পাক সেনা, রাজাকার	৪৪
ডেমরা, বাউশগাড়ি	পাবনা	রাজশাহী	১৩ মে	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	৯০০
বাড়িয়া	গাজীপুর	ঢাকা	১৪ মে	হিন্দু	পাক সেনা	২০০
কেতনার বিল	বরিশাল	বরিশাল	১৫ মে	হিন্দু	পাক সেনা	৫০০ +
চুকনগর	খুলনা	খুলনা	২০ মে	অধিকাংশ হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	১০,০০০
সাতানিখিল	মুন্সীগঞ্জ	ঢাকা	২০ মে	হিন্দু	পাক সেনা	১৪
গালিমপুর	সিলেট	সিলেট	২০ মে	হিন্দু	রাজাকার	৩৩
ডাকরা	খুলনা	খুলনা	২১ মে	হিন্দু	শান্তি কমিটি, রাজাকার	২,০০০
মধ্যপাড়া	শরীয়তপুর	ঢাকা	২২ মে	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	৩৭০
ভীমরুলী	পিরোজপুর	বরিশাল	২২ মে	হিন্দু	শান্তি কমিটি	১৫
বাখরাবাদ	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	২৪ মে	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	১৪২

কুড়িয়ানা	পিরোজপুর	বরিশাল	২৫ মে	হিন্দু	পাক সেনা, মাদ্রাসা ছাত্ররা	৫০০ +
বুরুঙ্গা	সিলেট	সিলেট	২৬ মে	হিন্দু	পাক সেনা,রাজাকার	৭১-৯৮
বাগবাটি	সিরাজগঞ্জ	রাজশাহী	২৭ মে	হিন্দু	আলবদর, শান্তি কমিটি, পাক সেনা	২০০
বরগুণা	বরগুণা	বরিশাল	২৯-৩০ মে	হিন্দু, আওয়ামী লীগ সমর্থন	পাক সেনা, কেন্দ্রিয় শান্তি কমিটি	১০০ +
দলদলিয়া	গাইবান্ধা	রংপুর	২ জুন	হিন্দু	পাক সেনা, বিহারী মুসলমান	২০
গোলাঘাট	নীলফামারি	রংপুর	১৩ জুন	বাঙালি ও মাড়োয়ারি হিন্দু (রামদা, বেয়নেট)	পাক সেনা, বিহারী মুসলমান	৪৩৭
আদিত্যপুর	সিলেট	সিলেট	১৪ জুন	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	৬৩
মাকালকান্দি	হবিগঞ্জ	সিলেট	১৮ অগাস্ট	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	১০০
পোমরা	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৪ সেপ্টেম্বর	হিন্দু (জ্যান্ত কবর)	পাক সেনা	১৩
কৃষ্ণপুর	হবিগঞ্জ	সিলেট	১৮ সেপ্টেম্বর	হিন্দু	পাক সেনা, রাজাকার	১২৭
সূর্যমণি	পিরোজপুর	বরিশাল	৭ অক্টোবর	হিন্দু	রাজাকার	২৪
শাখাঁরিকাঠি	বাগেরহাট	খুলনা	৪ নভেম্বর	হিন্দু	রাজাকার	৪২
বুদ্ধিজীবী হত্যা	দেশব্যপী	দেশব্যপী	২৫ মার্চ-১৪ ডিসেম্বর	বুদ্ধিজীবী অধিকাংশ মুসলিম	পাক সেনা, রাজাকার, আলবাদর, শান্তি কমিটি	১০০০ +
বাঙালি-মুসলিম সৈনিক হত্যা	ময়নামতী ক্যান্টনমেন	চট্টগ্রাম	২৭-২৮ মার্চ	বাঙালি মুসলিম অফিসার ও জওয়ান	পাক সেনা (পশ্চিম পাকিস্তানী)	১৭ অফিসার ৯১০ জওয়ান

সূত্রঃ তথাগত রায়, "যা ছিল আমার দেশঃ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের পূর্ববাংলা ত্যাগের কাহিনী", মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০২২, পৃ-২২৪-২৬।[27]

[27] রায়, তগতথা, (২০২২), 'যা ছিল আমার দেশ', কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ.পৃ. ২২৪-২২৬।

প্রায় নয় মাস ধরে চলা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রায় এক কোটি মানুষ (৯৮,৯৯,৩০৫) ভারতবর্ষে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই উদ্বাস্তু জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষই ছিল হিন্দু। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গঠনের পর তাদের একাংশ এরাজ্যেই থেকে গিয়েছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা (১৯৭১-২০২১)

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে হিন্দুদের অবস্থা জানার জন্য ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কালখণ্ডটিকে দুটি ভাগের মাধ্যমে পর্যালচনা করা। প্রথমত- বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন শাসনকাল এবং দ্বিতীয়ত- বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিরোধী জোটের নেতৃত্বাধীন শাসনকাল। এই দুটি ভাগে ভাগ করার যৌক্তিকতা হচ্ছে, বাংলাদেশের শাসনভার কার হাতে আছে তার উপরে পুরোপুরি নির্ভর করে হিন্দুদের নিরাপত্তা। "কার হাতে আছে"- এই প্রশ্নটি একটু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, বাংলাদেশের শাসনভার আওয়ামী লীগের হাতে না আওয়ামী লীগবিরোধী (সাধারণত মৌলবাদী) কোনো দলের হাতে। কারন বাংলাদেশে স্বাধীনতা এসেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকর্মী তাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের হাত ধরে। বাংলাদেশের জন্মলগ্নেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন যে দেশের অন্যতম স্তম্ভ হবে ধর্মনিরপেক্ষতা। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সঙ্কুচিত, ভীত, বিপদগ্রস্ত সংখ্যালঘু হিন্দু সপ্রদায়ের সাহস জুগিয়েছে বঙ্গবন্ধু এবং এই সপ্রদায় প্রায় চোখ বুজে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছে এবং ভোট দিয়েছে।[28] ফলস্বরূপ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলির বিরাগভাজন হয়েছেন এবং যখনই এই সব দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে হিন্দুদের উপর অত্যাচার আবার পাকিস্তান আমলের মাত্রাকেও কখন ছাড়িয়ে গিয়েছে। শুধু মাত্র আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলি ক্ষমতায় এলেই যে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় অত্যাচারিত হয়েছেন এবং আওয়ামী লীগ শাসনপর্বে অত্যাচারিত হয়নি তা বলা যায় না। বহু অত্যাচারের পরেও হিন্দুদের যেটুকু সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল তা হস্তগত করার জন্য বহু ছোটবড় আওয়ামী লীগ নেতার লোলুপ চোখ ছিল এবং সেই সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য তারা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, একথাও স্বীকার করতে হবে যে স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ যেটুকু ধর্মনিরপেক্ষতার স্বাদ পেয়েছে এবং হিন্দুরা যেটুকু নিরাপত্তা পেয়েছে তার পুরোটাই বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে আওয়ামী লীগের দৌলতে। এইজন্যই বালাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগকে ঢেলে সমর্থন দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের যেমনি স্বাধীনতা আছে বিভিন্ন তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুবিধা যে দল দিচ্ছে তাদের ভোট দেবার, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের পক্ষে এই

[28] রায়, তগতথা, (২০২২), 'যা ছিল আমার দেশ', কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ.পৃ. ২৪০-২৪১।

বিলাসিতা অকল্পনীয়। তাদের দল বেছে নেবার স্বাধীনতা নেই- ভালো হোক, খারাপ হোক, আওয়ামী লীগই তাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

তাই স্বাধীন বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা বর্ণনা ও আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগ আমল এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী আমলকে আলাদা করে পর্যালোচনার প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আমল (১৯৭১-৭৫) দিয়েই যার আরম্ভ ।

স্বাধীন বাংলাদেশঃ শেখ মুজিবুর রহমান শাসনকাল (১৯৭১-১৯৭৫)

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠিত হয়। এই ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী আশা করেছিল যে তারা পূর্ণ নাগরিকের মতো স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করতে পারবে।[29] সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থা দেখে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল পরিস্থিতি ধীরে ধীরে হলেও বদলাতে লাগল এবং সংখ্যালঘু হিন্দুরা অনুভব করলেন যে তাঁদের সঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা দৃশ্যত বা অদৃশ্যত পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকলো যে হিন্দুরা ভারত থেকে ফিরে এসে মুসলমানদের কাছে বেচে দেওয়া জমিজমা ফেরৎ নেওয়ার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করছে। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে ভারতের কাছে বেচে দিয়েছে। এখন মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি কোন কিছুই নিরাপদ নয়। আওয়ামী লীগ সরকার সদ্য স্বাধীন দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যার কোনটির সমাধান করতে পারেনি। সর্বত্র অনিয়ম, অরাজকতা, অব্যবস্থা চলতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবক্তা তৎকালীন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।[30]

আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িকতার একটা আবরণ নিজের চারিদিকে সৃষ্টি করে রাখলেও, তারা ১৯৭২ সাল থেকেই হিন্দু সম্পত্তি ব্যাপক আকারে দখল এবং লুণ্ঠন করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বভাবতই প্রত্যাশা ছিল যে, পাকিস্তান আমলে প্রণীত সাম্প্রদায়িক শোষণমূলক 'শত্রু সম্পত্তি আইন' বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু পাকিস্তানের শত্রু ভারত এবং সেই সূত্র ধরে যে, 'শত্রু সম্পত্তি আইন', তা বাংলাদেশে বহাল রাখা হয়। শুধু নামটা পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অর্পিত সম্পত্তি আইন'। বলা বাহুল্য, শত্রু সম্পত্তি বা আর্পিত সম্পত্তি আইন বহাল রাখা ছিল হিন্দুদের গণতান্ত্রিক সমতাভিত্তিক অধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতার মৌল

[29] চক্রবর্তী, দীপংকর, (২০০৭), 'বাংলাদেশ প্রসঙ্গে', কলকাতা, অনীক, পৃ. ২১২।

[30] প্রামাণিক, বিমল, (২০০৮), 'পশ্চিমবঙ্গের অশনিসংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ', কলকাতা, জি. সি. মোদক, পৃ. ৩৬।

চেতনার সাথে এই আইন ছিল সম্পূর্ণ সাংঘাতিক। ড. আবুল বারকাত এই আইনটিকে মানবতা বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক হিসেবে সনাক্ত করে মন্তব্য করেছেন, আইনটির কোন আইনগত, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি নেই। তহসিল অফিসের রেকর্ড বিশ্লেষণ করে আবুল বারকাত দেখিয়েছেন, ২০০৬ সাল পর্যন্ত ১১,৫০,৬০৬ টি হিন্দু পরিবারের জমি (হিন্দুদের মোট পরিবারের ৪৩%) এই আইনের কারণে কোনো না কোনো মাত্রায় হাতছাড়া হয়ে গেছে। হাতছাড়া এই জমির মোট পরিমাণ ২০,০১,০০০ একর (হিন্দুদের মোট জমির ৪৫%)। তবে এ হলো শুধু তহসিল অফিসে তালিকাভুক্ত হওয়া জমির হিসাব। এর বাইরেও বিপুল পরিমাণ জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের নামে হিন্দুদের হাতছাড়া হয়েছে। বারকাত দেখিয়েছেন, হাতছাড়া হওয়া সম্পত্তির প্রকৃত পরিমাণ তহসিল অফিসের এই হিসেবের চেয়ে অন্তত ২৯% বেশি, অর্থাৎ প্রায় ২৬,০০,০০০ একর।[31] রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করে একটি জনগোষ্ঠীর জমি কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করার এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতারাও হিন্দু সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুরা পঙ্গু হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বাধীন নাগরিকের একান্ত ন্যায় সঙ্গত অধিকারসমূহও নিশ্চিত করতে পারেনি। ১৯৭২ সালে দুর্গাপূজার সময়ে প্রায় একই দিনে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান আমলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেশবিখ্যাত একটি ৫০০ বছরের কালী মন্দির ছিল যা রমনা কালী মন্দির নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা এটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে সংখ্যালঘু হিন্দুরা স্বভাবতই আশা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার তা পুনর্নির্মাণ করে দেবেন এবং তারা সরকারের কাছে দাবি পেশও করেছিল। কিন্তু সে দাবি আওয়ামী লীগ সরকার অগ্রাহ্য করে; এমনকি পাকিস্তান আমলে মন্দিরের যতটুকু সম্পত্তি ছিল, তারও বেশির ভাগটা হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তাছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের আমল থেকেই ক্রমশ মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চেতনা রাষ্ট্র ও সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, যা মুক্তিযুদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ১৯৭২ সালে বিলুপ্ত 'ইসলামিক একাডেমী' কে 'ইসলামী ফাউন্ডেশন' নামে ১৯৭৫ সালে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন শ্রম, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলেন, বাংলাদেশ ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি আস্থাশীল এবং সে ইসলামী আদর্শ শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাছাড়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার, আলবদর ঘাতকরা পাকিস্তানি সরকার ও জামাতে ইসলামীর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের উপর হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অন্যান্য নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছিল- যাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য ক্রিমিনাল কেস বা অপরাধের মামলা ছিল, তাদের বিরুদ্ধে সেইসব মামলা আওয়ামী লীগ সরকার প্রত্যাহার করে, তাদের আটক অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করা এবং সর্বোপরি তাদের দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করে। ফলে সার্বিকভাবে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অ-

[31] Barkar, Abul, et al, (2008), 'Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property, Dhaka, Pathak Shamabesh, p.p.-167-169.

জনপ্রিয় হতে থাকে। বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা যতই বাড়তে থাকে, ততই হিন্দুদের জন্য পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে থাকে। সেইসাথে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জমিজমা, বাড়িঘর দখল হতে থাকে এবং সংখ্যালঘু নারীরা ধর্ষণ, অপহরণের শিকার হতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আশাহত হন এবং দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসতে থাকে।[32]

জিয়াউর রহমান শাসনকাল (১৯৭৭-১৯৮১)

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির স্রোতটাই গেল পাল্টে। 'মুক্তিযুদ্ধের মৃত্যুযজ্ঞ ও রক্তস্নানে সিঞ্চিত হয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে সমান নাগরিক অধিকারের যে স্বপ্ন রক্তপদ্মের কুঁড়ির মতো দল মেলেছিলো তা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেলো'।[33] ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় উপাদানসমূহের অনুপ্রবেশ আরও বেড়ে যায়। শেখ মুজিবের হত্যার পর ক্ষমতায় আসেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। মোশতাকের পর এলেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মৌলবাদী পাকিস্তানপন্থী নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলসমূহকে রাজনীতির আসরে নামার আইনগত অধিকার প্রদান করলেন। নিজের ক্ষমতা ও শক্তিকে সংহত করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধাপরাধী, দালাল ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তিকে স্বদলে স্থান দিলেন। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং মন্ত্রিত্বে তাদের আসীন করলেন। ফলে ইসলামী মৌলবাদীরা আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নির্যাতিত হওয়ার আতঙ্ক, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আতঙ্ক। তাদের এই আতঙ্ক বা আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করলো বাংলাদেশের সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। তাঁর উদ্যোগে "The BNP government also introduced significant policy changes in the socio-cultural life of Bangladesh. The most important was the move away from secularism to Islamic ideals. While under Sheikh Mujibar Rahman secularism was the basis of the state, General Zia made it more Islamic."[34]

জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে ১৯৭৮ সালে প্রথমেই ১৯৭২ সালে প্রণীত 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে' রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাতিল করে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'কে রাষ্ট্রীয় 'সকল কাজের ভিত্তি'বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ এর সংবিধানের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের ধারাটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত করা হয়। মুসলিম দেশসমূহের সাথে 'ইসলামী

[32] সরকার, দিব্যদ্যুতি, (২০১৯), 'বাংলাদেশি হিন্দু ডায়াস্পোরিক হিন্দু', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১৪-১৯।

[33] ছফা, আহমদ, (১৭-২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯), 'উত্তরণ সংখ্যা', পৃ. ৫।

[34] Hussain, Ghulam, (1988), 'General Zia and The BNP', Dhaka, p. 69.

ঐক্য' গড়ে তোলার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে। এ সবের সার্বিক ফলস্বরূপ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের আর্থি-সামাজিক, রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও অধিকার খর্বিত হতে থাকে। 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' এর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এই আইন বহাল রাখার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে এক সার্কুলারের মাধ্যমে বলা হয় যে, তহসিল অফিসের যে সব তহসিলদার বা কর্মচারী নিজ নিজ এলাকার অর্পিত সম্পত্তি (সরকারি ভাষায় কনসাইন্ড ভেস্টেড প্রপার্টি) খুঁজে বের করতে পারবেন বা ঐ সংক্রান্ত খবর দিতে পারবেন, সরকার পুরস্কৃত করবে। এই খুঁজে বের করার কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সম্মানী দেবার কথাও ঘোষণা করে।[35] ফলে সারাদেশে ব্যাপকভাবে হিন্দু সম্পত্তি 'অর্পিত সম্পত্তিতে' পরিণত হতে থাকে। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কঠিনতর সংকটের মুখোমুখি হলেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এবং নিজভূমে পরবাসী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে সর্বস্ব খুইয়ে আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসতে লাগলো এ-পার বাংলায়।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শাসনকাল (১৯৮২-১৯৯০)

জিয়াউর রহমানের পর বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করার সময় ঘোষণা করেছিলেনঃ "সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, নজিরবিহীন দুর্নীতি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, প্রশাসনিক অচলবস্থা, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংকটের ফলে জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ এক দারুন হুমকির সম্মুখীন। ক্ষমতাসীদের হীন স্বার্থপরতা, অযোগ্যতা, স্বজনপ্রীতি, সীমাহীন দুর্নীতি এবং কোন্দল এ সরকারকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছে। জিয়াউর রহমানের সরকারের ওপর আজ দেশবাসীর আস্থা নেই"। ক্ষমতা দখলের অজুহাত হিসেবে হাজির করা এরশাদের ওই সব অভিযোগ সেদিন সঠিক থাকলেও আজ তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক একই অভিযোগ এনেছে দেশবাসী। কারণ তাঁর সম্পর্কেও এই অভিযোগগুলি সর্বাংশে ত বটেই, বরং আরও বেশী করে প্রযোজ্য।[36] জিয়াউর রহমানের আমলে ইসলামীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তা এরশাদের আমলে পূর্ণতা লাভ করে। ১৯৮২ সালের ২২ ডিসেম্বর এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ইসলাম ও কোরাণের নীতিই হবে নতুন সংবিধানের ভিত্তি। যার লক্ষ্য হিসেবে তিনি কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- (১) ৫ বছর বয়স থেকে বাধ্যতামূলক আরবী শিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ (পরে এই সিদ্ধান্ত ছাত্র আন্দোলনের চাপে বাতিল করেন)।

(২) সরকারি কাজে সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার ঘোষণ।

(৩) রমজান মাসে হোটেল, রেষ্টুরেন্ট বন্ধ রাখা।

---

[35] রহমান, মতিউর ও হক, সৈয়দ আজিজুল, (১৯৯০), 'বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়', ঢাকা, জ্ঞান প্রকাশনী, পৃ. ৩২।

[36] চক্রবর্তী, দীপংকর, (২০০৭), 'বাংলাদেশ প্রসঙ্গে', কলকাতা, অনীক, পৃ. ২১২।

(৪) স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য দীনিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে কোরাণ ও সুন্নাহবিরোধী কোন আইন গ্রহণ না করার কথা ঘোষণা করেন। তার ফলে, শুধু যে মুসলিম মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিই উৎসাহিত হয়েছে তা নয়, সাম্প্রদায়িক অবস্থারও অবনতি ঘটেছে। যার ফলে ১৯৮৭ সালে ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, অত্যাচার, লুটপাট সংঘটিত হয়।[37]

রাষ্ট্রকে ইসলামিকরণের শেষ পদক্ষেপটি এরশাদ গ্রহণ করে ১৯৮৮ সালে ৭ জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী গ্রহনের মধ্য দিয়ে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে। এর ফলে ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান', ২৮(১) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না' এবং ২৯(২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী, পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না' প্রভৃতি সাংবিধানিক সুরক্ষা কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রধর্মের বাইরে ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। তাছাড়া সংবিধানের এই অষ্টম সংশোধনটি এরশাদ এমন সময়ে সংঘটিত করে যখন একদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রবলভাবে তাঁর বিরোধী ছিল, এবং অন্যদিকে ভারতে 'রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ' নিয়ে উত্তেজনা বিরাজমান। ফলে বাংলাদেশে সমাজবিরোধী এবং দুষ্কৃতিকারীরা হিন্দু নিপীড়নের মোক্ষম উপলক্ষ ও সুযোগ পেয়ে যায়। সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, সংখ্যালঘুদের অর্থসম্পদ ও জমি-বাড়ি দখল করা এবং দেশত্যাগের নির্দেশ সংবলিত হুমকি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী দুষ্কৃতিদের মুখে শোনা যায় সাম্প্রদায়িক হুঙ্কার- 'যা, ইন্ডিয়ায় গিয়ে থাক'।[38] বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মতো হিন্দুরা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ নিপীড়নের শিকার হন।

খালেদা জিয়া শাসনকাল (১৯৯১-৯৬ ও ২০০১-০৬)

এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে BNP (Bangladesh National Party) জোট দল ক্ষমতাশীন হয়। কট্টর মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দল 'জামাতে ইসলামী' কে সঙ্গে নিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে BNP ক্ষমতাসীন হওয়ার

[37] প্রামাণিক, বিমল, (12.05.1990) "Interface of Migration an Inter-religious Community Relations in Bangladesh and Estern India", kolkata. কর্তৃক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

[38] Bangladesh Hindhu Bauddha Khristan Oikya Parisad, (1993), 'Communal Persecution and Repression in Bangladesh', Dhaka, Oikya Parisad, pp. 69-75.

সাথে সাথে সারা দেশজুড়ে হিন্দু সংখ্যালঘুদে উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। এই অত্যাচার যে অবশ্যম্ভাবী তা নির্বাচনের পূর্বেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অনুভব করেছিলেন। কারণ BNP নির্বাচনী স্লোগান তুলেছিল 'বিসমিল্লাহ কায়েম রাখ ধানের শীষে সীল মার', 'শেখ হাসিনার অপর নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম', 'জয় বাংলা জয় হিন্দ লুঙ্গী খুইল্যা ধুতি পিন্দ'। এছাড়া BNP হিন্দু অধ্যুষিত নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে স্লোগান তুলেছিল 'হিন্দু যদি বাঁচতে চাও বাংলা ছেড়ে চলে যাও'।[39] প্রধানত ভারতবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক প্রচার ও আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল হিসেবে অভিযুক্ত করে। সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে এই অজুহাতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নেমে আসে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও নির্যাতন। যার ফল স্বরূপ মন্দির, মঠ, গির্জা বিধ্বস্ত হলো, বাড়িঘর ভস্মীভূত হলো, সম্পত্তি লুটপাট হলো, মা-বোনদের ধর্ষণ ও লাঞ্ছিত করা হলো, বহু মানুষ আহত ও নিহত হলো। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র উদাসীন থাকলেও, সামান্য যা কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে, তার কয়েকটি রিপোর্ট এখালে উল্লেখিত করা হল-

যশোর জেলায় ১৯৯১ সালে ৬/৭ এপ্রিল ৫টি গ্রামের সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক অত্যাচার ও লুঠপাট চালানো হয়। এ সম্পর্ক ঢাকা থেকে 'দৈনিক বাংলার বাণীতে' প্রকাশিত রিপোর্টের অংশ বিশেষ 'সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে সংখ্যালঘু ৫টি গ্রামের কয়েকশ পরিবারের হাজার হাজার মানুষ (08.04.1991) দিনটিতে নিরাপত্তার দাবিতে যশোরের জেলা প্রশাসকের অফিস ঘেরাও করে নিরাপত্তার দাবি জানায়। নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের ভারতে পাঠিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়।[40] ২৩.৪.১৯৯১ দিনটিতে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার পীরের বাড়ি, মুসুরিয়া ও নাইয়াবাড়ি গ্রামে সংখ্যালঘুদের উপর দুর্বৃত্তরা বর্বরোচিত আক্রমণ ও লুঠপাট চালায় এবং নারী ও শিশুদের উপর চলে অকথ্য নির্যাতন। কোটালীপাড়ার সংখ্যালঘুদের বসতবাড়িতে এখন বিরাজ করছে শ্মশনের নীরবতা।

১৯৯৭ সালে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী শাহরিয়ার কবীর লিখেছিলেন, "'৭৫-এর পর থেকে আওয়ামী লীগ যে ভয়াবহ সরকারি নির্যতনের শিকার হয়েছিল তার কবল থেকে হিন্দু সম্প্রদায় রেহাই পায়নি। '৭৫ থেকে '৯৬ পর্যন্ত যারাই ক্ষমতায় ছিল তাঁদের শত্রু ছিল আওয়ামী লীগ এবং তাদের বিবেচনায় হিন্দুমাত্রই আওয়ামী লীগের সমর্থক। এই বিবেচনা থেকে হিন্দুদের উপর এমনভাবে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালানো হয় যাতে তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। '৯২ –এ সারা দেশে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার অজুহাতে খালেদা জিয়ার সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন চালায়। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে প্রায় তিনহাজার ছয়শ মন্দির ও উপাসনালয় সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছিল। এই সহিংসতায় সারা দেশে বারোজন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিহত, দুই হাজার মানুষ আহত

[39] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ. ৮৪।

[40] দৈনিক বাংলার বাণী, ০৯.০৪.১৯৯১।

এবং দুই হাজার ছয়শ মহিলার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় দুইশ কোটি টাকা। দেশের আটটি বিভাগের চৌষট্টি জেলার মধ্যে তেতাল্লিশটি জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা অর্থাৎ হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সরাসরি আক্রান্ত হয়েছিল মৌলবাদীদের দ্বারা।[41] ১৯৯২ সালে যেভাবে হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দির, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তা এর আগে কখনো ঘটেনি। খালেদা জিয়ার সরকার '৯২–এ একটি গোপন সরকারী সার্কুলারের দ্বারা ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল যে হিন্দুদের যাতে শিল্প বা বাণিজ্যিক ঋণ না দেওয়া হয়, এবং তাদের স্থায়ী আমানতের টাকাও যেন তারা অবাধে তুলতে না পারে। বি এন পি-র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নগ্নরূপ তীব্র আকার ধারণ করে '৯৬–এর জাতীয় নির্বাচনের সময়। হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোতে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে তাদের ভোট কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের পর প্রকাশিত এক শ্বেতপত্রে শাহরিয়া কবীর দেখিয়েছেন যে আওয়ামী লীগ সমর্থক হওয়ার অভিযোগে সাত থেকে আট লক্ষ হিন্দুকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি।[42]

২০০১ সালে বাংলাদেশের অষ্টম সংসদ নির্বাচন হলো সংখ্যালঘুদের নির্যাতন-নিপীড়নের ক্লেদাক্ত ইতিহাস; যার সাথে জড়িত ছিল দেশের মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তি- যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা হারাবার পর ২০০১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন মৌলবাদী ইসলাম পন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সাথে গভীর ষড়যন্ত্র করে। ক্ষমতা দখলের পর বিএনপি জামায়াতের দলীয় ক্যাডারা যে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর তাঁর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শাহরিয়া কবীর। তাঁর বহু পরিশ্রমের ফসল সংখ্যালঘু অমূল্য দলিল 'শ্বেতপত্রঃ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন'[43] গ্রন্থে। শাহরিয়া কবীরের 'শ্বেতপত্র' প্রধানত অত্যাচারের তথ্যসম্ভারে পূর্ণ। এই ১৫০০ দিনের নির্যাতনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কবীর প্রায় ২৭০০-র উপর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এর থেকেই অনুমান করা যায় ২০০১-২০০৮ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কত বড় গণ-অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, কত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। ২০০১ সালে নির্বাচন-পূর্ব এবং নির্বাচন-উত্তর সময়কালে সবচেয়ে ঘৃণ্য দিক ছিল নারী ধর্ষণ। সিরাজগঞ্জের অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরী পূর্ণিমা শীলকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছিল খালেদা জিয়ার দলীয় ক্যাডারেরা তা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশ-বিদেশে বিবেকবান মানুষ কেঁপে উঠেছিল। পূর্ণিমা শীল প্রতীক হয়ে উঠেছিল ২০০১-এর হিন্দু নারী নির্যাতনের; হাজার হাজার নারী পূর্ণিমা শীলের মতো বাংলাদেশের 'গণতন্ত্রের প্রহরীদের' হাতে সম্ভ্রম

[41] আজাদ, সালাম, (১৯৯৬), 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করেছে', ঢাকা, সাস পাবলিকেশন্স, পৃ.পৃ. ৪৫-৪৬।

[42] কবীর, শাহরিয়ার, (১৯৯৭), 'বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা', ঢাকা, অনন্যা, পৃ. ২৮।

[43] কবীর, শাহরিয়ার, (২০০৫), শ্বেতপত্রঃ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন, ঢাকা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

হারিয়েছিল, যা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং রাজাকারদের হাতে নারী নির্যাতনের ঘটনার সমতুল্য বলা যায়। বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর এই ঘৃণ্য অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেনঃ 'ধর্ষণের ক্ষেত্রে ছয় বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত হামলাকারীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি"।[44]

২০০১ সালে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার ভয়াবহচিত্র প্রতিভাত হয়েছিল হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সমীক্ষায়। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমীক্ষায় দেখা যায় যে ৩৭টি ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন, ৭টি হত্যাকাণ্ড, ৩৫১টি শারিরীক নির্যাতন, ৫৩৫টি গৃহ ধ্বংস এবং ৬০টি মন্দির অপবিত্রকরণ ও বলপূর্বক গৃহ থেকে উৎপীড়নের ঘটনা ঘটেছিল। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রের' সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে ১১২টি, রাজশাহী বিভাগে ৫৯টি, খুলনা বিভাগে ৯৭টি, বরিশাল বিভাগে ৬১টি, সিলেট বিভাগে ৪টি এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৯১টি গ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্যাতন ও আক্রমণের শিকার হয়েছিল। এছাড়া এই দুই মাসে খুন হয়েছিল ৩৪ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ১২২ জন নারী ধর্ষিতা হয়েছিল এবং ১৪০২ জন আহত ও নিপীড়নমূলক ঘটনা ঘটেছিল ১২৮টি। ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধবংসের ঘটনা ঘটেছিল ১৩৭৭টি। শুধুমাত্র ভোলা জেলায় ৬ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল ১৫০০ জন এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ৬০০ জন নারী। ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর সহিংসতার অনিবার্য পরিণতি ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশান্তর। বরিশাল থেকে ১৬,০০০ জন, চট্টগ্রাম থেকে ১০,০০০ জন, ভোলা জেলা থেকে ২,০০০ জন, ফরিদপুর থেকে ৫,০০০ জন এবং নোয়াখালি থেকে ২,৫০০ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিরুদ্দেশ হয়েছিল।[45]

শেখ হাসিনা শাসনকাল (১৯৯৬-২০০১ ও ২০০৮-২০২৪)

১৯৯৬ সালে ৩০ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পতন ঘটে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়, যার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। এই নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের অনাকাঙ্ক্ষিত অবসানের ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ পুনরায় বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসে। শেখ হাসিনা ছিলেন বাংলাদেশের দশম প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয় নারী সরকার প্রধান।[46] শেখ হাসিনা হলেন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার দীর্ঘকালীন শাসক প্রধান। ৭ম জাতীয়

[44] ঘোষ, মানস, (২০১৩), বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে না পেরে এখন হামলার পথ ধরেছেন খালেদা, উপ সম্পদকীয়, দৈনিক স্টেটসম্যান, কলকাতা।

[45] সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনঃ সংখ্যালঘু নির্যাতন, জনতদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন, (২০১২), ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১৭৮-১৮২।

[46] জাহান, মো. এমরান ও খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, (২০১৮), 'বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪', ঢাকা, অবসর, পৃ.পৃ. ২৪১-২৪৮।

সংসদ নির্বাচনে জয় লাভের পর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হাসিনা সরকার পরাজিত হয়। এবং পরবর্তী নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে বর্তমান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শাসক প্রধান হিসাবে বিরাজমান। অর্থাৎ ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত এবং ২০০৮ সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত।

সাধারণভাবে শেখ হাসিনা সরকারকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনদরদী সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন শেখ হাসিনা শাসনকালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোট মানে ধরে নেওয়া হয় আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক। তাই ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছিল বলেই সংখ্যালঘুদের উপর নেমে এসেছিল চরম সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস। আক্রান্ত হয়েছিল বাংলাদেশের বহু সংখ্যালঘু পল্লী। হিন্দুদের ঘরবাড়ি পোড়ানো হয়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে সম্পদ। শারিরীভাবে লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দু রমণীরা। ৯৬-এর নির্বাচনের পরে সংখ্যালঘুদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল বিশেষভাবে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীদের দ্বারা, সরকার গঠনের পর শেখ হাসিনা সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সন্ত্রাসের উপর কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।[47] উপরুন্তু শেখ হাসিনা প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও বাংলাদেশে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' অপরিবর্তিত থাকে।

শেখ হাসিনা যে ধর্মীয় সহনশীলতার ভিত্তিতে সমাজ গড়তে ব্যর্থ, সেটা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাগুলো। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিষয়টি জীবন-মৃত্যুর, একইসঙ্গে বেঁচে থাকা অথবা ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিংবা সম্মানের সঙ্গে বাঁচা অথবা দাসত্ব বরণ করে নেওয়ার মতো। মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা বিষয়ক সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানিয়েছে, ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ৩ হাজার ৬৭৯টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হামলা, ঘরবাড়ি ও দোকানে আগুন দেওয়া, বিভিন্ন মাত্রায় ভাঙচুরের ঘটনা থেকে শুরু করে ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এ ধরনের হামলা ও সহিংসতাগুলো সুনির্দিষ্ট একটি ছক অনুসরণ করেছে। ২০১২ সালে রামু, উখিয়া ও টেকনাফের ঘটনা, ২০১৬ সালে নাসিরনগর, ২০১৯ সালে ভোলা এবং ২০২১ সালে সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর, কুমিল্লা, রংপুর ও নড়াইলের ঘটনাগুলোর মধ্যে শুধু রামু, উখিয়া ও টেকনাফে ১৯টি বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে।[48] বাকি ঘটনাগুলো হিন্দুদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলার উদাহরণ। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে এক বিস্ময় জাগানো সাদৃশ্য রয়েছে, যার নেপথ্যের কারণটি খুব সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা চলে ঠাকুরগাঁও, নেত্রকোনা, শেরপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, দিনাজপুর, লালামনিরহাট ও লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন জায়গায়।

[47] সিংহ, কঙ্কর, (২০১৫), 'নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব', ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ.পৃ. ১০৩-১০৮।

[48] আনাম, মাহফুজ, (২৩ জুলাই ২০২২), 'সংখ্যালঘুর চোখে বাংলাদেশ', দ্য ডেইলি স্টার।

Association of Land Reform and Development (ALRD) নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বেনারকে বলেন, "রক্ষণশীল হিসেবে ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে শাসকশেণি ও তাঁদের প্রতিনিধিরা জমিজমা দখলের আশায় হিন্দু ধর্মালম্বীদের ওপর হামলায় ইন্ধন জোগান এবং পৃষ্ঠপোষোকতা করেন"।[49]

যার ফলস্বরূপ, বাংলাদেশে হিন্দু হত্যার অন্যতম ঘটনা হল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগরে ২০১৬ সালের নভেম্বরের ঘটনা। রসরাজ দাস নামক একটি অর্ধস্বাক্ষর মৎস্যজীবী ছেলের নামে রটিয়ে দেওয়া হয় যে সে ফেসবুকে নবীকে এবং কাবা শরীফকে অপমান করেছে। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে এরকম একটি ছবিও পোস্ট করা হয়। অথচ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা রসরাজ জানেই না ফেসবুক কি পদার্থ-কিন্তু তা সত্ত্বেও সে জোড়হাতে মুসলমান জনতার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। কোনো লাভ হয়নি। প্রচন্ড মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনদ্বয় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, ও হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার মুসলমান নাসিরনগরের হিন্দুদের আক্রমণ করে এবং রসরাজের প্রচন্ড অত্যাচার করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়। মন্দির অপবিত্র করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে সব কাফেরকে নাসিরনগর ছেড়ে চলে যেতে হবে।[50] এছাড়া সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বিচারে হামলার খবর বারবার সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হলো; পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে যজ্ঞেশ্বর রায় হত্যা, সাতক্ষীরার আশাশুনিতে ১০০ হিন্দু পরিবারকে গ্রামছাড়া করা, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ৭০ বছরের সাধু পরমানন্দ খুন, কক্সবাজারে হিন্দুদের বাড়িঘর ও মন্দির ভাঙচুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যার হুকমি ও ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনে ধর্মপ্রচারে বাধা দেওয়ার ঘটনা ছাড়া আর একটি নৃশংস হত্যার সাক্ষী হয়ে রয়েছে ঝিনাইদহ অঞ্চলে দরিদ্র হিন্দু পুরোহিত সত্তরোর্ধব আনন্দগোপাল গাঙ্গুলী যখন সাইকেল করে যজমান বাড়ি যাচ্ছিলেন; আর শ্যামানন্দ দাস, ভোরবেলায় পুজোর ফুল তুলছিলেন দুজনকেই কুপিয়ে হত্যা করা হয়। সাম্প্রতিক বাগেরহাটের বেমরতা গ্রামের বাসিন্দা খান কামরুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমে বলেন, তাঁদের ওই গ্রামটিতে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা ছিল বেশি। গত দুই দশকের ব্যবধানে এখন সেখানে উল্টো অবস্থা বিরাজ করছে।[51]

---

[49] শরীফ, শাহরিয়ার, (৩০ নভেম্বর, ২০১৬), 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু চিত্রঃ তিন দশক পর দেশে হিন্দু না থাকার আশঙ্কা গবেষকদের', ঢাকা, বেনার নিউজ।

[50] রায়, তগতথা, (২০২২), 'যা ছিল আমার দেশ', কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৩০৯।

[51] শরীফ, শাহরিয়ার, (৩০ নভেম্বর, ২০১৬), 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু চিত্রঃ তিন দশক পর দেশে হিন্দু না থাকার আশঙ্কা গবেষকদের', ঢাকা, বেনার নিউজ।

সারণিঃ ৫.২ অভিন্ন বঙ্গ ও বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের জনসংখ্যা শতাংশ

বছর	শতাংশ %	হিন্দু জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	মন্তব্য
১৯০১	৩৩.০০	৯,৫৪৬,২৪০	২৮,৯২৭,৬২৬	পূর্ববঙ্গ অঞ্চল
১৯১১	৩১.৫০	৯,৯৩৯,৮২৫	৩১,৫৫৫,৩৬৩	দেশ ভাগের আগে
১৯২১	৩০.৬০	১০,১৭৬,০৩০	৩৩,২৫৪,৬০৭	
১৯৩১	২৯.৪০	১০,৪৬৬,৯৮৮	৩৫,৬০৪,১৮৯	
১৯৪১	২৮.০০	১১,৭৫৯,১৬০	৪১,৯৯৯,২২১	
১৯৫১	২২.০৫	৯,২৩৯,৬০৩	৪২,০৬২,৪৬২	পাকিস্তানি শাসনকালে
১৯৬১	১৮.৫০	৯,৬৭৯,৬৬৯	৫০,৮০৪,৯১৪	
১৯৭৪	১৩.৫০	৯,৬৭৩,০৪৮	৭১,৪৭৮,৫৪৩	বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর
১৯৮১	১২.১৩	১০,৫৭০,২৪৫	৮৭,১২০,৪৮৭	
১৯৯১	১০.৫১	১১,১৭৮,৮৬৬	১০৬,৩১৫,৫৮৩	
২০০১	৯.৬০	১১,৮২২,৫৮১	১২৩,১৫১,৮৭১	
২০১১	৮.৫৪	১২,২৯৯,৯৪০	১৪৪,০৪৩,৬৯৭	
২০২২	৭.৯৫	১৩,১৩০,১০৯	১৬৫,১৫৮,৬১৬	

সূত্রঃ ভারতের আদমশুমারি ১৯০১-১৯৪১, পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫১-১৯৬১ সালের আদমশুমারি, বাংলাদেশ সরকারের আদমশুমারি ১৯৭৪-২০২২।

উপরে সারণি ৫.২ -এর তথ্যপঞ্জি থেকে একটি প্রধান বিষয় সামনে চলে আসে, এই বিষয়টি হচ্ছে ক্রমহ্রাসমান হিন্দু জনসংখ্যা। তথ্যানুসারে বলা যায় ১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গ অঞ্চল (বর্তমানে বাংলাদেশ)-এ জনসংখ্যার ৩৩% হিন্দু জনসংখ্যা ছিল। ১৯৪১ সালে দেশভাগের আগে জনসংখ্যার প্রায় ২৮% ছিল হিন্দু। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর ১৯৫১ সালে সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ২২%-এ নেমে আসে, কারণ ইস্ট বেঙ্গল ইভাকিউজ অ্যাক্টের মাধ্যমে হিন্দুরা তাদের বিষয়-সম্পত্তি হারিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে চলে আসে। পাকিস্তানি শাসনকালে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী যারা পূর্ব বাংলায় থেকে গিয়েছিল তারা বৈষম্যমূলক নতুন আইনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সময়, ডিফেন্স অফ পাকিস্তানি অর্ডিন্যাস, এবং পরে শত্রু (হেফাজত ও নিবন্ধন) আদেশ, হিন্দুদের "শত্রু" হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা ১৩.৫% এ নেমে এসেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ও সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস অব্যাহত রয়েছে, যা ২০২২ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় হিন্দু জনসংখ্যা ৭.৯৫%-এ নেমে এসেছে। এই

সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন, বাহ্যিক অভিবাসন, ১৯৭১ সালে অসমভাবে হিন্দুদের লক্ষ্য করে বাঙালি গণহত্যাকে দায়ী করা যায়।[52]

সারণিঃ ৫.৩ অর্পিত সম্পত্তি আইনে সংখ্যালঘুদের বেদখলীকৃত জমির পরিমাণ (১৯৭২-২০০৬)

সময়কাল	অর্পিত সম্পত্তি আইনে বেদখলীকৃত জমির পরিমাণ	বেদখলের সংখ্যা
১৯৭২-১৯৭৫	৭,২৩২ ডেসিমল	৪৪টি
১৯৭৬-১৯৮১	৮,৭৮৩ ডেসিমল	৫৪টি
১৯৮২-১৯৯০	৪,৫৯৯ ডেসিমল	৩৯টি
১৯৯১-১৯৯৫	৩,৫৯৬ ডেসিমল	৪২টি
১৯৯৬-২০০১	৭৫৪ ডেসিমল	১৮টি
২০০১-২০০৬	১,৭৫১ ডেসিমল	৬৮টি

(সূত্রঃ আবুল বারকাত (সম্পাদিত): বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস, ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০০৯, পৃ. ৭১-৭২।[53]

১৯৭২-১৯৭৫ কালপর্বে শেখ মুজিবর রহমানের সময়ে হিন্দু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে যে পরিমাণ জমি বেদখল হয়েছিল জিয়াউর রহমানের সময়ে তা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। হোসেন মহম্মদ এরশাদের শাসনকালে এই বেদখলের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেলেও ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতালাভ ও তাঁর ১৯৯১-১৯৯৬ শাসনকালে পুনরায় সম্পত্তি বেদখলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৬-২০০১ কালপর্বে শেখ হাসিনার শাসনকালে এই সম্পত্তি বেদখলের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেলেও বেগম খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় শাসনকালে ২০০১-২০০৬ কালপর্বে সম্পত্তি বেদখলের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। শেখ হাসিনার পরবর্তী শাসনকালে ২০০৮-২০২৪ কালপর্বেও সম্পত্তি বেদখলের ঘটনা বৃদ্ধি না পেলেও একেবারে কিন্তু বন্ধ হয়নি। অর্পিত সম্পত্তি সুবিধাভোগীদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততা ছিল সর্বাধিক। মোট অর্পিত সম্পত্তির বেদখলকৃতদের মধ্যে ৪৫.২ শতাংশ বিএনপি, ৩১.৪ শতাংশ আওয়ামী লীগ কর্মীরা সম্পৃক্ত ছিল।[54]

[52] ভারতের আদমশুমারি ১৯০১-১৯৪১, পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫১-১৯৬১ সালের আদমশুমারি, বাংলাদেশ সরকারের আদমশুমারি ১৯৭৪-২০২২।

[53] বারকাত, আবুল (সম্পাদিত), (২০০৯), 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস', ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, পৃ. ৭১-৭২।

[54] তদেব, পৃ. ৯৪।

বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের পশ্চিমবঙ্গে অভিগমনের স্থানঃ

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের দেশ ছেড়ে বাধ্যতামূলকভাবে চলে আসা তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহের অন্যতম। সুন্দরী জন্মভূমির সঙ্গে ভালোবাসার অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ একটি জীবন্ত, জাগ্রত মনুষ্যগোষ্ঠীকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলে দেওয়ার সংগ্রাম চলেছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪-১৫ আগস্ট দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের দুই প্রান্তে দুটি জাতির আত্মখণ্ডন ঘটে। মান-সম্ভ্রম ও ধর্মনাশের ভয়ে পূর্ববঙ্গ (পূর্ব-পাকিস্তান) থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ (হিন্দু) নবসৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাব প্রদেশ থেকেও অগণিত মানুষ পাঞ্জাব (ভারতের অন্তর্ভূক্ত), হরিয়ানা ও দিল্লিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সেদিন ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত পাঞ্জাবে এক প্রচণ্ড বিধ্বংসী হত্যালীলা ও জনবিনিময়ের দ্বারা জন্মভূমি থেকে দুই বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠীকে স্বল্পকালের মধ্যে উপড়ে ফেলার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু বিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান—এই দুই মনুষ্যগোষ্ঠীর বিনিময় হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসতে হয়েছিল শুধু হিন্দুদের। এই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে অঞ্চল বিশেষে বলা হয় 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা'। এই 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' জনগোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গে তাদের উদ্বাস্তু জীবন সংগ্রামের সামগ্রিক তথ্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উদ্বাস্তু'[55] (১৯৬০) গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাঙালি হিন্দুদের উপড়ে ফেলাটা একটা দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণাময় প্রক্রিয়া। দেশবিভাজনের পর বাঙালি হিন্দুদের অবস্থা হয়েছিল ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো। হিন্দুদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের বিতাড়নের জন্য মাঝে মাঝে সরকারি আমলাতন্ত্র ও মুসলমান জনসাধারণের যোগসাজশে একতরফা দাঙ্গা হয়েছে। আর হৃতসর্বস্ব বিধ্বস্ত মানুষের তরঙ্গ এসে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়েছে। কখনো এই জনস্রোত এসেছে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উন্মত্ত তরঙ্গের মতো; কখনো এসেছে ক্ষীণ ধারায়। কিন্তু আজও তা থেমে থাকেনি, থামবেও না। যতদিন একটিও অ-মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) থাকবে, ততদিন ঘরছাড়া মানুষের পদধ্বনি শোনা যাবে। ওদের চলে না এসে কোনো উপায় নেই।[56] পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে কোনো তথ্য জানতে গেলে যে কাজের উল্লেখ না করে জানা সম্ভব নয়, তা হল, ১৯৯০-এর দশকে প্রকাশিত, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 'দ্য মার্জিনাল মেন' (The Marginal Men, 1990) যার বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'প্রান্তিক মানব' নামে (২০১৩)। এখানে তিনি দেখিয়েছেন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গমুখি হয়েছিলেন তাদের শ্রেণিগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় উঠে আসে। তা হল প্রথম পর্যায়ে যে সমস্ত উদ্বাস্তু হিন্দুরা চলে এসেছিল তাদের সংখ্যার বিন্যাস ছিল এইরকম- ১৯৪৮ সালে মার্চে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। ওই বছর জুনে তাদের সংখ্যা ১১ লক্ষে পৌঁছে যায়। এই ১১ লক্ষ উদ্বাস্তুর মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির,

[55] বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, (১৯৬০), 'উদ্বাস্তু', কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।

[56] চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), 'প্রান্তিক মানব', কলকাতা. দীপ প্রকাশন, পৃ. ১৭।

৫ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির, ১ লক্ষের কিছু বেশী ছিল কৃষক এবং ১ লক্ষের কিছু কম ছিল কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর।[57] এই পরিসংখ্যান থেকে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হল প্রথম পর্যায়ে যেসমস্ত উদ্বাস্তু দেশত্যাগ করেছিলেন তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ ছিল বেশি। কারণ এই শ্রেণিভুক্ত মানুষের তেমন কোনো পিছুটান না থাকায় এবং জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার সম্ভাবনা বেশি থাকার দরুন তারা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে দেশত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যথাযথ চাষের জমি পাওয়া অথবা নিজের জমি ঠিক দামে বিনিময় করার ক্ষেত্রে অসুবিধার দরুন কৃষিজীবী মানুষ নানা কষ্ট সহ্য করেও কিন্তু দেশত্যাগ করে নিজের ভিটেমাটি ত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপত্তার জন্য চলে যেতে চাননি। সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও দাঙ্গা যখন তীব্র আকার ধারণ করে এবং আর কোনো মতেই ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকা সম্ভবপর হয়নি তখনই কেবলমাত্র এই কৃষিজীবী ও নিম্ন জাতির হিন্দুরা পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে।[58]

১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের আগমণ ঘটে। স্থানান্তরন প্রসঙ্গে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে আগত এই জনস্রোত পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তর স্থানান্তরিতের স্রোত বলে আজও চিহ্নিত। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদেরই নাগরিক পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর যে নৃশংস হত্যালীলা চালিয়েছিল তার হাত থেকে বাঁচতে ভারতে ১ কোটিরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর এদের অধিকাংশ ফিরে গেলেও এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানান্তরিত মানুষ ভারতে থেকে গিয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন তাদের খুব সামান্য অংশই সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারা মানুষের সংখ্যা ৩৫ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল।[59]

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উদ্বাস্তু' (১৯৬০) গ্রন্থে দেখিয়েছেন ১৯৫৪ সালের মধ্যে পূর্ববাংলার ২৬,৬২,৬০১ জন উদ্বাস্তু আসে পশ্চিমবঙ্গে। এদের মধ্যে ৫,৫৭,৫৪৪ জনের স্থান হয়েছিল বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আর আশ্রয় শিবির থেকে ৪,০৮,৫৫০ জনকে পাঠানো হয় পুনর্বাসন কেন্দ্রে। তিনি দেখিয়েছেন ৫৪ সালের পর থেকেও পূর্ববংলা থেকে মানুষের আসা থেমে থাকেনি। ১৯৫৫ সালে দৈনিক গড়ে ১০০ পরিবার আশ্রয় শিবিরে আসতে থাকে। ১৯৬৫ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গায় বহু ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসে অসহায়

[57] তদেব, পৃ. ১৮।

[58] চক্রবর্তী, সুজন, (২০২২), 'সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৮২।

[59] চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, (১৯৯৭), 'প্রান্তিক মানব', কলকাতা. দীপ প্রকাশন, পৃ. ১৮।

অবস্থায় পড়ে। সেই সময় তাদের পাঠানো হয়েছিল মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সীমান্ত দণ্ডকারণ্যে।[60] প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিন্দুদের আগমনের স্রোত অব্যাহত থাকে।

১৯৭১ সালের জনগণনার সময় উদ্বাস্তু শরণার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়। ঐ তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা তখন প্রায় ৬০ লক্ষে পৌঁছায় যা কিনা রাজ্যের তৎকালীন মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী এসেছিল তার একটি চিত্র উল্লেখ করা হল-

সারণিঃ ৫.৪ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু সংখ্যা

জেলা	উদ্বাস্তু সংখ্যা
১) অবিভিক্ত ২৪ পরগণা	১৬৫০০০০
২) নদিয়া	১৫০০৭৫০
৩) কলকাতা	৯০০০০০
৪) কুচবিহার	৪৪২৫০০
৫) দিনাজপুর	২৯২৫০০
৬) জলপাইগুড়ি	২৪৯০০০
৭) বর্ধমান	২৪০০০০
৮) হুগলি	১৫৯০০০
৯) হাওড়া	১৪৪০০০
১০) মুর্শিদাবাদ	১৩৫০০০
১১) মালদাহ	১২৭৫০০
১২) মেদিনীপুর	৬৩০০০
১৩) দার্জিলিং	৪৮০০০
১৪) বীরভূম	৩১৫০০
১৫) বাঁকুড়া	১৫৭৫০
১৬) পুরুলিয়া	৯৭৫
মোট	৫৯৯৯৪৭৫

তথ্যসূত্রঃ U.C.R.C. Record. অনুসারে।

[60] বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, (১৯৭০), ,উদ্বাস্তু', কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৩৪৩।

শিবাজী প্রতীম বসু তাঁর 'ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধে (২০০৮)[61] একটি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে জনবিন্যাসে তার প্রভাব কতখানি পড়েছিল সেটা তিনি উল্লেখ করেছেন-পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ

সারণিঃ ৫.৫ পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যায় উদ্বাস্তু সংখ্যার শতাংশভিত্তিক হার

বছর	মোট জনসংখ্যা	পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু	মোট জনসংখ্যার তুলনায় উদ্বাস্তুদের শতাংশ
১৯৫১	২,৬২,৯৯,৯৮০	২১,০৪,২৪১	৮%
১৯৬১	৩,৪৯,২৬,২৭৯	৩০,৬৮,৭৫০	৮.৭৮%
১৯৭১	৪,৪৩,১২,০১১	৪২,৯৩,০০০	৯.৬৮%

তথ্যসূত্রঃ বসু, শিবাজী প্রতীম, ২০০৮, 'ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে', দেশভাগঃ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, (সম্পাদনাঃ সেমন্তী ঘোষ), কলকাতা, গাঙচিল, পৃ- ৭৮-৭৯।

পশ্চিমবঙ্গে ঠিক কত জন মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল সেই সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। উপরে যে পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হয়েছে বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল। কারণ হিংসার ত্রাস অথবা অজ্ঞতা যে কোনও কারণেই হোক অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের সময় 'বর্ডার স্লিপ' সংগ্রহ করেনি। সুতরাং সরকারি পরিসংখ্যানের বাইরেই তারা থেকে যায়। ফলে উদ্বাস্তুদের সঠিক পরিসংখ্যানের একটা গ্যাপ থেকে যায়। এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু যাদের স্থানীয় মানুষ উপেক্ষা, ঘৃণা আর অনাদর করেছে, সরকার ও সরকারি আমলারা যাদের প্রতারণা করেছে, সেই উদ্বাস্তু জনতার দল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে যেতে থাকে। সরকার যাদের অক্ষম, নিষ্কর্মা ভেবেছিল, সেই সমস্ত মানুষ শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রাতারাতি এক একটি করে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তুলতে থাকে। দেশভাগ পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে এভাবে ক্রমবর্ধমান হারে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু উপনিবেশের চিত্রটি তুলে ধরা হল-

[61] বসু, শিবাজী প্রতীম, (২০০৮), 'ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে', দেশভাগঃ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, (সম্পাদনাঃ সেমন্তী ঘোষ), কলকাতা, গাঙচিল, পৃ- ৭৮-৭৯।

সারণিঃ ৫.৬ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু উপনিবেশ

জেলার নাম	জবরদখল কলোনি	সরকারি পুনর্বাসন কলোনি	প্রাইভেট কলোনি	মোট কলোনির সংখ্যা
১) কলকাতা	৯৬	-	-	৯৬
২) উত্তর ২৪ পরগণা	৪১৯	২৭২	৫০	৭৪১
৩) দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৯৬	৬৮	১৩	১৭৭
৪) নদিয়া	১১২	৬০	৪৭	২১৯
৫) মুর্শিদাবাদ	১৪	২৭	১৫	৫৬
৬) হাওড়া	৯১	২৩	১২	১২৬
৭) হুগলি	১৫৯	৬৩	১৯	২৪১
৮) বর্ধমান	১১৯	২৯	৪২	১৯০
৯) মেদিনীপুর	২৬	৫৪	০৩	৮৩
১০) বাঁকুড়া	৩৮	০৩	-	৪১
১১) বীরভূম	৭৬	১৯	০১	৯৬
১২) দার্জিলিং	৯৩	০৪	-	৯৭
১৩) জলপাইগুড়ি	১৩৭	১৪	১৮	১৬৯
১৪) কোচবিহার	৪৩	১৬	২৬	৮৫
১৫) মালদাহ	১৬৬	১৫	৪২	২২৩
১৬) উত্তর দিনাজপুর	১৪৭	১২	১২	১৭১
১৭) দক্ষিণ দিনাজপুর	৯৩	-	-	৯৩
মোট	১৯২৫	৬৭৯	২৯৯	২৯০৪

তথ্যসূত্রঃ কমল, চৌধুরী,(২০০৯), 'বাংলায় গণআন্দোলনের ছয় দশক' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, পত্র ভারতী, পৃ ৪১৫।

উপরোক্ত সারণি ৫.৬-এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী উদ্বাস্তু মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেসব কলোনি গড়ে তুলেছিল তার মোট সংখ্যা ২৯০৪। এর মধ্যে সরকারি সাহায্যে গড়ে ওঠা কলোনির সংখ্যা ছিল ৬৭৯টি অর্থাৎ তা মোট কলোনি সংখ্যার ২৩.৩৮ শতাংশ মাত্র। বাকি ৭৬.৬২ শতাংশ কলোনি উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগেই গড়ে তুলেছিল।[62] এই যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের পুনর্বাসন মূলত তিন ধরনের পদ্ধতিতে ঘটেছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন তৎকালীন রিফিউজি এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার

[62] চৌধুরী, কমল, (২০০৯), 'বাংলায় গণআন্দোলনের ছয় দশক' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, পত্র ভারতী, পৃ ৪১৫।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে প্রথমত, যে সমস্ত বাস্তুহারা আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন তারা সরকারি কোন সহায়তা ছাড়াই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, যে উদ্বস্তুদের উদ্যমের অভাব ছিলনা কিন্তু সম্পদের যথেষ্ট অভাব ছিল তারা মূলত অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমি ও বাড়িতে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয় অংশে ছিল সেই সমস্ত অসহায়, দরিদ্র উদ্বাস্তু মানুষ যাদের সরকারি সহায়তা ছাড়া কোনোভাবেই নিজেদের পুনর্বাসিত করা সম্ভবপর ছিল না।[63] সরকারি প্রতিরোধ, অসহযোগিতা, স্থানীয় মানুষের উপেক্ষা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের দমিয়ে রাখা যায়নি, কারণ এইসব মানুষের ফিরে যাবার কোনও উপায় ছিল না। তাই উদ্বাস্তুরা শেষ পর্যন্ত সংগঠিত হতে থাকে এবং সংগঠিতভাবে তারা পড়ে থাকা অনাবাদি সরকারি জমি, ব্যক্তিমালিকানার জমিতে জোর করে কলোনি গড়ার কাজ শুরু করে। এসব করতে গিয়ে তারা জমির মালিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের লাঠি-গুলিকেও উপেক্ষা করে জেলায় জেলায় কলোনি গড়ে তুলতে থাকে। সংগঠিতভাবে পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই এদেশের মাটিতে শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ উত্তর ২৪ পরগণায় চাঁদপাড়া ও গোবরডাঙা স্টেশনের মাঝখানে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ জুড়ে গড়ে ওঠে। বর্তমান যা ঠাকুরনগর নামে পরিচিত এবং এই ঠাকুরনগর পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে গোটা ভারতবর্ষের বাঙালি দলিত উদ্বাস্তুদের একটি প্রধান মিলনকেন্দ্র। তাছাড়া নদিয়ার কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প এবং ২৪ পরগনার বাগজোলা ক্যাম্প সর্বত্রই ছিল উদ্বাস্তু মানুষের মিলনক্ষেত্র।[64] এছাড়া কলকাতায় টালিগঞ্জ, যাদবপুর, কসবা, দমদম, সন্তোষপুর, সোদপুর প্রভৃতি স্থানে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠে। কলকাতায় কলোনিগুলির মধ্যে বেলঘরিয়ায় অবস্থিত শহীদ যতীন দাস কলোনি এবং যাদবপুরের নিকট অবস্থিত বিবেকানন্দ কলোনি, নেতাজী কলোনি ছিল বৃহদাকার। বর্তমানে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রয়েছে এই উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর বসবাস।

স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব শাসনকালের পরবর্তী সময় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে তা জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মানব মুখার্জি তাঁর গ্রন্থ 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশঃ রাজনীতি ও বাস্তবতা' (১৯৯৪)। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি 'অনুপ্রবেশকারী' যে আছে তাতে কোনো বিতর্ক নেই। বিতর্ক শুধু সংখ্যা নিয়ে। তিনি তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন ১৯৭২-৯২ সালের মধ্যে ভিসা ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে যায়নি এমন লোকের সংখ্যা ৬,৭৫,১৯৫ জন। এর মধ্যে হিন্দু ৪,৮১,৩৬৮ জন ও বাকিরা মুসলমান। তিনি যেহেতু 'বামফ্রন্ট' সরকারের মন্ত্রী তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি

[63] বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, (১৯৭০), 'উদ্বাস্তু'. কলকাতা. সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২২।

[64] ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, (২০২০), 'দেশভাগ ও বাংলার দলিত সমাজ', 'দেশভাগে নিম্নবর্ণ,(সম্পদনাঃ আশিস হীরা), কলকাতা, গাঙচিল, পৃ-২৫।

সরকারি তথ্যই ব্যবহার করেছেন। সেক্ষেত্রে বিনা পাসপোর্টে যারা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসে তার কোন হিসেব নেই। বলা বাহুল্য পাসপোর্টে যত লোক ভারতে আসে তার বহুগুণ আসে বিনা পাসপোর্টে। তাঁর মতে এই 'অনুপ্রবেশকারীদের' মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছে।[65] বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে আর একটি তথ্য উল্লেখ করা যায়, এই তথ্যটি দিয়েছে জাতিসংঘের 'ডিপার্টমেন্ট অব ইকনোমিক অ্যান্ড সোশাল এফেয়ার্স (ডেসা, ফিনান্সিয়েল একপ্রেস, ঢাকা, ২০১৩) এখানে দেখানো হয়েছে গত কয়েক দশকে ৩২ লক্ষ বাংলাদেশি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে।[66]

এই বিপুল সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বসবাসের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিচিতি অর্থাৎ আত্মীয়-সজন, বন্ধুবান্ধব, পাতানো সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ককে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গে যেমন বসতি স্থাপন করছে, সেই সাথে আঞ্চলিকতা এবং জাতীয়তাবোধকে সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে চলেছে।

সাম্প্রতিক কালে প্রায় এক দশক ধরে উত্তর ২৪ পরগণা ও বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে মানবপাচার বা অনুপ্রবেশ ঘটানোর অভিযোগে NIA-র হাতে ধরা পড়েছে সঞ্জীব দেব, বিকাশ সরকার ও রাজু রুদ্র। তারা শুধু এ রাজ্যে প্রবেশ করানোই নয়, অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা করার জন্য যা যা প্রমাণপত্র দরকার তার ব্যবস্থাও করে দিত। NIA-র দাবি, ধৃত তিন জন আসলে বাংলাদেশের বাসিন্দা। সঞ্জীব এবং রাজু নয়ের দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে ঢুকে এ দেশের জন্মের শংসাপত্র, ভোটার কার্ড এবং পাসপোর্ট তৈরী করে ২০০৫ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সেই সাথে গত দু'দশকে কয়েক হাজার বাংলাদেশিকে তারা এ রাজ্যে প্রবেশ করাতে সাহায্য করেছে। প্রথমে তাদের আত্মীয় বলে ভাড়া বাড়িতে তুলত। পরে স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র তৈরী করে দিত।[67] এই ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা তাদের পূর্ব পরিচিতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে তাদের আশেপাশে বসতি স্থাপন করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জীবন প্রবাহ

বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুরা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে ছিন্নমূল শরনার্থী হয়ে চলে এসেছিল তা অত্যন্ত বেদনার। দেশত্যাগের মাশুল দিয়ে উদ্বাস্তু হিন্দুরা যে অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তাদেরকে প্রাথমিকভাবে বিচলিত করলেও জীবনবিমুখ করতে পারেনি। নতুন পরিবেশে নতুনভাবে জীবনের নির্মাণ করেছেন তারা। নিজেস্ব জীবনভূমি থেকে উৎখাত হয়ে যেখানেই বসতি স্থাপন করেছেন সেখানেই দ্রুত স্থানীয়

[65] মুখার্জি, মাবব, (১৯৯৪), 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশঃ রাজনীতি ও বাস্তবতা', কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

[66] ডিপার্টমেন্ট অব ইকনোমিক অ্যান্ড সোশাল এফেয়ার্স (ডেসা), (২০১৩), ঢাকা, ফিনান্সিয়েল একপ্রেস।

[67] আনান্দবাজার পত্রিকা, ৮ নভেম্বর ২০২৩।

মানুষদের সাথে নিজেদের মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তারা মানসিক দূরত্ব ঘুচিয়ে নতুন জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন।[68] পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণী এই মানুষদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। কাতারে কাতারে উদ্বাস্তুদের আগমন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে চাকরী, বাসস্থান ও কর্মজীবনের মতো নানা বিষয়ে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের অপ্রতুলতা পুনর্বাসন সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল। ফলে প্রথম দিকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরকারি সাহায্য পাওয়া না গেলেও, তাদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বেসককারি প্রতিষ্ঠান যেমন ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়ারি রিলিফ কমিটি, বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, নারী সংগঠন এগিয়ে এসেছিল।[69]

জয়ন্তী বসু তাঁর 'Reconstructing the Bengal Partition: The psyche under a different violence', (2013) গ্রন্থে পূর্ব বাংলার মানুষের বিত্তশালী জীবন, প্রকৃতি ভরা মনোরম পরিবেশ এর সাথে পশ্চিমবঙ্গে সেই সকল মানুষের উদ্বাস্তু জীবন, রুক্ষ পরিবেশ, কষ্ট ও দৈন্য দশার উল্লেখ করেছেন। দেশত্যাগ এই মানুষদের জীবনে কী ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সে কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন।[70]

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁর 'দেশভাগ ও বাংলার দলিত সমাজ', 'দেশভাগে নিম্নবর্ণ' (২০২০)[71] প্রবন্ধে দেখিয়েছেন দেশত্যাগে বাঙালি শরণার্থীদের মধ্যে সব থেকে বেশি দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়েছিল দলিত কৃষিজিবীদেরই। দেশভাগের সুধাটুকু করায়ত্ত করতে পেরেছিলেন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এক শ্রেনির মানুষ। গরলটাই যেন রাখা ছিল এই দলিত শ্রেণির জন্য। তারা নিরুপায় হয়ে নীলকণ্ঠের মতো তা গ্রহণ করেছিলেন। যাঁদের সামান্য সামর্থ্য ছিল তাঁরা নিজেরাই জমি কিনে বসতি স্থাপন করে নিয়েছিলেন, বাকিরা কর্মহীন, ক্ষুধাকাতর জীবন যাপন করতেন বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে। এই ক্যাম্পগুলির দুর্গতির কথা উল্লেখ করেছেন মনিকুন্তলা সেন, তাঁর 'সেদিনের কথা',(১৯৮২) বইতে 'ক্যাম্প জীবন যে মানুষের সম্মান বোধ কত নীচে নামিয়ে দেয় সেসব তিনি নিজের চোখে দেখেছেন বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে'। তিনি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "কোনো ক্যাম্পে গেলে সবাই আমাকে তাদের কি ধরণের বিশ্রী কাপড় দেওয়া হচ্ছে, কি রকম বিশ্রী চাল দেওয়া হচ্ছে সেসব দেখাতেন। তাই নিয়ে সরকারের কাছে দরবারও করতাম। কিন্তু তাদেরকে বলতাম ভিক্ষের চাল কাপড়ের তো ভালমন্দ নেই। আপনারা কাজ দেওয়ার দাবী করুন এবং তার বিনিময়েই চাল কাপড় নেবেন। তখন ঐসব জিনিস খারাপ হলে যারা দিচ্ছে তাদের মুখের উপর ছুড়ে ফেলবেন। কিন্তু এ

---

[68] চক্রবর্তী, সুজন, (২০২২), সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ। ৮২।

[69] আনান্দবাজার পত্রিকা, ৪ নভেম্বর ১৯৪৮।

[70] Basu, Jayanti, (2013), 'Reconstructing the Bengal Partition: The psyche under a different violence', Kolkata, Samya.

[71] ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, (২০২০), 'দেশভাগ ও বাংলার দলিত সমাজ', 'দেশভাগে নিম্নবর্ণ,(সম্পদনাঃ আশিস হীরা), কলকাতা, গাঙচিল, পৃ. ২৫।

বোধটা জাগাতে পারতাম না। এরা তো এমন ছিল না। দেশ গাঁয়ে এরা যে যার মতো কাজ করে খেত। ভিক্ষের অসম্মানে তো যেত না। দীর্ঘদিন ক্যাম্পে করে এরা যে একটা পরনির্ভরশীল শ্রেণিতে পরিনত হলো এবং আত্মসম্মানবোধটা হারিয়ে ফেললো। সেটাই এক পীড়াদায়ক ঘটনা"।[72]

তবে এই উদ্বাস্তুদের জীবন পুরোটাই হতাশার চিত্র ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুরা রাষ্ট্রীয় বাধাকে উপেক্ষা করে, পুলিশ ও জমি মালিকদের আক্রমণ প্রতিহত করে পতিত জমিতে গড়ে তুলেছিল নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অনাবাদি অঞ্চল বাস্তুহারাদের উদ্যমের সুবাদে উর্বর, জনবহুল হয়ে উঠেছিল। পেয়েছিল প্রানের স্পর্শ। ভৌগলিক কারণেই পূর্ববঙ্গ ছিল কৃষিপ্রধান অঞ্চল। বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হওয়া লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী বাঙালি উদ্বাস্তু কেবল পশ্চিমবঙ্গে নয়, এ দেশের যেখানেই পুনর্বাসিত হয়েছেন সেখানেই বন-জঙ্গল, পাথুরে-পতিত-অনাবাদি জমিকে চাষযোগ্য, বাসযোগ্য করে তুলেছেন। এ রাজ্য তো বটেই, বাংলার বাইরে যেখানেই বাঙালি উদ্বাস্তুরা গিয়েছেন সেখানকার কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখিয়েছেন।[73]

জয়া চ্যাটার্জী তাঁর 'The Spoils of Pratition, Bengal and India, 1947-1967 (2007) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, দেশত্যাগী উদ্বাস্তুদের অনেকেই সে সময়ে সরকারি-সওদাগরি, মাড়োয়ারি গদিতে চাকরির চেষ্টার পাশাপাশি ঠিকা শ্রমিক থেকে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে, বিভিন্ন কারখানার দৈনিক ভাতার শ্রমিক থেকে ফুটপাথের সব্জি বিক্রি, বড় বাজারের মুটে-মজুর, হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশনের কুলি কাজের সাথে নিজেদের নিযুক্ত করে। এছাড়া কলকাতা ও শহরতলিতে হকারি এবং রিকশা ও ঠেলাগাড়ি চালকের কাজে ভিড়ে গিয়েছে অনেকে।[74] বাংলাদেশ থেকে আগত এক শ্রেণির মানুষ রেললাইনের ধারে ঝুপড়ি বেঁধে আজও বসবাস করছে। এবং রুটি-রুজির তাগিদে তারা ভোর না হতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জনমজুরির সন্ধানে ছোটে। এক চিলতে জায়গা কিনে বসতি গড়ার সামর্থ্য তাদের আজও হয়নি।

বর্তমানে নদীয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্প, রানাঘাটের রঘুনাথপুর ও শান্তিপুরের ৪ নং কলোনিতে বসবাসরত বাংলাদেশ থেকে আগত জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহের চিত্র বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তুলে ধরা হল-

সাক্ষাৎকার : ১, নাম: বিপ্লব রায়। (নাম পরিবর্তিত), বয়স: ৫৯, ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় বসবাস করতেন ১৯৭১ সালে দাঙ্গার সময় প্রাণের ভয়ে মায়ের সাথে চলে আসেন এপার বাংলায় কথা পশ্চিমবঙ্গে। পরিবারের বাকি সদস্য ও আত্মীয়রা পরে পরে সবাই চলে আসেন। আশ্রয় নেয় নদীয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্পে। ওপার বাংলায় তথা বাংলাদেশে ছেড়ে এসেছেন পৈতৃক

[72] সেন, মনিকুন্তলা, (১৯৮২), 'সেদিনের কথা', কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন।

[73] চক্রবর্তী, সুজন, (২০২২), 'সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৩৯।

[74] Chatterji, Joya, (2007), 'The Spoils of Pratition, Bengal and India 1947-1967', Cambridge University Press, p. 124.

ভিটে-বাড়ি, জমি- জমা ও পুকুরসহ যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি যার অধিকাংশই মুসলিমরা জবরদখল করে নিয়েছিল। শেষে প্রাণের তাগিদে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা পরিত্যাগ করে এপার বাংলায় আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কর্মজীবন: এপার বাংলায় আসার পর নানা রকম অসুবিধা সম্মুখীন হন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, "আমরা নিচু শ্রেণির লোক তাই খুব একটা সুযোগ সুবিধা পায়নি, তার উপর বাবা নেই একাকী মা ও দুই বোন" সরকারি তরফ থেকে যা ত্রাণ সামগ্রী পেতেন তাই দিয়ে দৈনিক জীবন নির্বাহ করতেন। তবে সময়ের সাথে সাথে তিনি বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা সচ্ছন্দতা লাভ করতে পেরেছেন। পড়াশোনার সুযোগ পাননি, তাই ছোট থেকেই ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে নিজেকে নিযুক্ত করেন। ওপার বাংলায় মামার বাড়ি থাকায় তাদের সাথে এখনো আত্মীয়তার সূত্রে সংযোগ রয়েছে। যে কারণে তিনি এখনও শিকড়ের টান অনুভব করেন। এবং টিভি কিংবা খবরের কাগজের পাতায় ধর্মীয় অত্যাচারের কোন কাহিনী শুনলে এখনো তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

সাক্ষাৎকার:২, নাম: বিপুল মাঝি, বয়স: ৬৫, ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প ৬ নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: বাংলাদেশের খুলনা জেলায় বসবাস করতেন। ১৯৭১ সালে বাবার সাথে মাত্র ১১ বছর বয়সে চলে আসেন এপার বাংলায়। "ওপার বাংলা ছেড়ে আসার স্মৃতি এখনও কষ্ট দেয়" বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন "মুসলমানরা আমাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, শেষে প্রাণটাই না নিয়ে নেয় সেজন্য আমরা চলে এসেছি এখানে" ফেলে এসেছেন নিজেদের জন্মভূমি।

কর্মজীবন: এপার বাংলায় আসার পর নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হন। সরকারি ত্রানের উপর পুরোপুরি ভাবে নির্ভরশীল ছিলেন যতটুকু সাহায্য পেতেন তা জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য যথাযথ ছিল না। ওপার বাংলায় চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ হতো কিন্তু এখানে কোন জমি না থাকার কারণে চাষবাসের পরিবর্তে দোকান শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে সরকারি সাহায্যের পরিবর্তে নিজেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "আগে ভাত জুটত না এখন ভাত জোটে" বর্তমানে ওনার একমাত্র ছেলে আছেন যিনি প্রাইমারি শিক্ষা লাভের পর দৈনিক মজুরিভিত্তিক রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। জমির পার্টটাধিকার পেয়েছেন সেখানে টিনের চালের বাড়ি রয়েছে। এছাড়াও সরকারি ভাতা যেমন বার্ধক্য ভাতা পেয়ে থাকেন যা তার দৈনিক জীবন নির্বাহের জন্য উপযোগী বলে মনে করেন।

সাক্ষাৎকার: ৩, নাম: গৌতম সাহা, বয়স: ৪৮, ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প, ৬ নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: গৌতম সাহা-র জন্ম পশ্চিমবঙ্গে, উনার পূর্বপুরুষরা সপরিবারে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এদেশে চলে আসেন। আসতে বাধ্য হয়েছিলেন ধর্মীয় কারণে যে বিভাজন এবং তার ফলস্বরূপ হিন্দুদের ওপর

যে অকথ্য অত্যাচার যেমন -হত্যা, লুটপাট, সম্পত্তি জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া, শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহের হাত থেকে বাঁচতে।

এদেশে আসার পর ওনার বাবা ১৯৬৯ সালে কুড়ি টাকা মাসিক মাইনের রেল কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার আগে পর্যন্ত সরকারি ত্রাণ ও নিজেদের স্বল্প উপার্জনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছলতা ফিরে আশায় উনি পড়াশোনা করার সুযোগ পান এবং গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে উনি মিনিস্ট্রি অফ লেবার ওয়েলফেয়ার বিভাগে ক্যাজুয়াল স্টাফ হিসেবে কর্মরত আছেন। এখানে তিনি নিজেকে অনেক বেশি নিরাপদ বলে মনে করেন। তিনি বলেন "আমরা নিশ্চিত যে আমাদেরকে সরকার এখান থেকে সরিয়ে দেবে না। আমরা ভালো আছি। আমাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কও খুবই ভালো"। অর্থাৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ এখানে এসে একটি জায়গায় মিলিত হয়ে যে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তার মধ্যে তারা একাত্মতা খুঁজে পেয়েছেন। তবে তিনি এখনো কতগুলো বিষয় নিয়ে চিন্তিত। বিশেষ করে যারা এখনো পর্যন্ত জমির পাট্টাধিকার লাভ করেনি তারা যাতে এই অধিকার পান সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

সাক্ষাৎকার: ৪, নাম: দেবেন্দ্রনাথ দে, বয়স: ৮৬, ঠিকানা কুপার্স ক্যাম্প, ৪ নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: বাংলাদেশের বরিশালে বসবাস করতেন। নিজস্ব ঘরবাড়ি জমি জায়গা সবই ছিল চাষবাসের উপর নির্ভর করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে বাধ্য হয়ে সপরিবারে মাত্র আট বছর বয়সে বাবা-মায়ের হাত ধরে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন।

কর্মজীবন: এ দেশে জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করাটাও ছিল অত্যন্ত কঠিন তবে তিনি বলেন "ওদেশে থাকলে তো আর প্রাণটা বাঁচাতে পারতাম না, তাই এখানে এসে প্রাণে যখন বেঁচে গেছি তখন যেকোনো কঠিন লড়াই লড়ে নিতে পারব" এইভাবে মন থেকে দীর্ঘ সংকল্পবদ্ধ হয়ে প্রাথমিকভাবে সরকারি ত্রাণ নিয়ে জীবন নির্বাহ করলেও পরে পরে স্বইচ্ছায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। ওপারে থাকাকালীন চাষবাস করলেও এপারে এসে জমি জমার অভাবে চাষাবাদ করে উঠতে পারেননি। দৈনিক শ্রমিক হিসেবে কাজে নিযুক্ত হন। পরে কিছু জমি কিনে চাষাবাদ শুরু করেন। বর্তমানে ওনার দুই ছেলে যার মধ্যে বড় ছেলে মারা গিয়েছেন এবং ছোট ছেলে চিকেন শপ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

সাক্ষাৎকার: ৫, নাম: সুখেন হালদার, বয়স: ৪৮, ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প, চার নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: উনার জন্ম পশ্চিমবঙ্গেই কিন্তু পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল বাংলাদেশের বরিশালে। ১৯৫১ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচার জন্য সপরিবারে এদেশে চলে এসেছিলেন। জমি জায়গার আশায় অনেকেই পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন কিন্তু ওনার বাবা যেতে চাননি। তাঁর কথায় "প্রাণ নিয়ে পালিয়ে

এসেছি, আর যাব না" তাই আশ্রয় নিয়েছিলেন সরকারি ক্যাম্পে সেখান থেকেই জীবনের নতুন সংগ্রাম শুরু। সরকারি ডোল (খাদ্য সামগ্রী) প্রথম প্রথম পেতো যা জীবন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই নিজে উদ্যোগে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করলে সরকারি ডোল পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাই শেষমেষ সরকারি ডোল এর আশা পরিত্যাগ করে আত্মসম্মানের সহিত স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সাইকেলে করে চাল ডাল তেল মসলা বিক্রি করতেন। সেই সময় ক্যাম্পের আশেপাশের কোন বাজার ছিল না পরে ধীরে ধীরে বাজার গড়ে উঠলে সেই বাজারে মোদির দোকান শুরু করেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপযুক্ত কোন পরিকাঠামো ছিল না শুরুর দিকে। ১৯৭০ এর দশকের পরে নিজেদের উদ্যোগে স্কুল গড়ে তোলার পরে সরকারি অনুমোদন পায়।

তিন ভাই বোনেদের মধ্যে উনি একাই পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন উনার বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে পড়াশোনা করে কোন সরকারি চাকরি করুক। বি.এ পাস করার পরে বর্তমানে উনি কুপার্স ক্যাম্প নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি তে ক্লার্কের পদে কর্মরত আছেন। উনার জন্ম এ দেশে হলেও বাংলাদেশের প্রতি শিকড়ের টান অনুভব করেন। তিনি বলেন "মরার আগে একবার হলেও যাবো" নিকট আত্মীয় কেউ বাংলাদেশে নেই তবে দূর সম্পর্কের কিংবা বন্ধু-বান্ধবের পরিচিত আত্মীয় যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের সাথে এখনো সংযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান।

সাক্ষাৎকার: ৬, নাম: রবীন্দ্রনাথ হালদার, বয়স: ৭৪, ঠিকানা: শান্তিপুর, 4 নম্বর কলোনি, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: বাংলাদেশের কুষ্টিয়াতে জন্ম। অর্থনৈতিকভাবে খুব একটা সচ্ছল ছিলেন না। জমি -জমা খুব বেশি না থাকার কারণে মূলত মাছ ধরেই দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু ১৯৭১ এর দাঙ্গার পর জীবন সংকটের মুখোমুখি হওয়ার কারণে কুড়ি বছর বয়সে সপরিবারে এ দেশে চলে আসেন। আশ্রয় নেন শরণার্থী শিবিরে। অসহায় দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে সরকারি সাহায্য নিয়ে কোনো রকম বেঁচে থাকেন বলে জানান।

কর্মজীবন: "সরকারি সাহায্য নিয়ে তো আর বেঁচে থাকা যায় না" এই বলে তিনি জানান যে এদেশে এসেও তিনি মাছ ধরার কাজ শুরু করেন এছাড়া কিছু জমি অন্যের থেকে নিয়ে ভাগ চাষ করা শুরু করেন। যা থেকে সামান্য যেটুকু উপার্জন হত তাই দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। বর্তমানে টিনের চালের কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন। জমির পাটটাধিকার ছাড়া বিশেষ কোন সরকারি সুযোগ সুবিধা পাননি বলে জানান একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পর তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে গোঁসাই হন এবং নিজেকে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত রাখেন।

সাক্ষাৎকার: ৭, নাম: সুমন বিশ্বাস, বয়স: ৩৫ ঠিকানা: শান্তিপুর ৪ নম্বর কলোনি

জীবন বৃত্তান্ত: বাংলাদেশের যশোর জেলায় পূর্বপুরুষরা বাস করতেন। জমি -জমা বিশেষ কিছু না থাকার কারণে বাবা ভ্যান চালাতেন এবং যা উপার্জন করতেন তাই দিয়ে কোনভাবে জীবিকা নির্বাহ হতো। তিনি দাবি করেন যে তার পূর্বপুরুষরা হিন্দু হওয়ার কারণে সরকারি কোনরকম সুযোগ-সুবিধা পেতেন না, তার ওপর মুসলমানদের অত্যাচার এই সব কিছুর জন্যই তারা বাধ্য হয়েছিলেন স্বদেশ ছেড়ে এদেশে আসতে, যাতে জীবন বাঁচানো যায় এবং তুলনামূলকভাবে এখানে কিছুটা ভালো থাকা যায় এই আশায় ১৯৬৮ সালে সপরিবারে উনার পূর্বপুরুষরা চলে আসেন এদেশে। আশ্রয় নেয় শরণার্থী শিবিরে। ভিটে মাটির টানে কয়েক বছর পর পুনরায় উনার বাবা নিজ দেশে তথা বাংলাদেশে ফিরে যান এবং সেখানে গিয়ে বিয়ে করে স্থায়ী ভাবে থাকার পরিকল্পনা করেন কিন্তু পরিস্থিতির কারণে পুনরায় এদেশে আসতে বাধ্য হন।

কর্মজীবন: এদেশে এসে উনার বাবা চাষাবাদ শুরু করেন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমির পাট্টাধিকার লাভ করেন এভাবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির সাথে সবকিছু মানিয়ে নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন তিনি বলেন "বাবা পড়াশোনার সুযোগ পায়নি বলে আমাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দেন" কিন্তু আর্থিক অভাব অনটনের কারণে মাধ্যমিক পাশের পর পড়াশোনা ছেড়ে হোটেলের কাজ করতে বাধ্য হন। সরকারি সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার কারণে মাসে সামান্যতম যা উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর বলে তিনি জানান।

সাক্ষাৎকার: ৮, নাম: সঞ্জয় সান্যাল, বয়স: ৩৮, ঠিকানা: শান্তিপুর, চার নম্বর কলোনি, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: সঞ্জয় সান্যাল জন্ম এ দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে, উনার পূর্বপুরুষরা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় চলে আসেন সপরিবারে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ চাষযোগ্য জমি ছিল। যা চাষাবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ হতো। কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ নিয়ে সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় এদেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন ভরসা ছিল সরকারি সাহায্যের ওপর।

কর্মজীবন: এদেশে এসে উনার বাবা প্রথমে তাঁতকলে শ্রমিকের কাজ করতেন যা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই নিজ উদ্যোগে কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। পরে ওনার বড় দাদা এই ব্যবসা সামলান। মেজ দাদা ইংলিশে এম.এ পাস করার পরেও কোন সরকারি চাকরি পায়নি। সেজ দাদা মাধ্যমিক পাস করে গোয়াতে হোটেলের কাজে নিযুক্ত হন। উনি নিজে বাংলায় এম.এ পাস করার পর BLRO অফিসে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করছেন সামান্য মাসিক আয়ে। তাই তিনি বলেন "অভাব অনটন নিত্যদিনের সঙ্গী" এছাড়াও বাবা ঠাকুরদার পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকার কারণে হতাশার সুর শোনা যায় তার গলায়। তিনি বলেন "শূন্য থেকে শুরু করেছি, যে পরিমাণ সম্পত্তি বাংলাদেশ ছিল সেই জায়গায় এখনও পৌঁছাতে পারেনি"। তবে এখানে তিনি নিশ্চিন্তে আছেন, কলোনির মানুষের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক খুব ভালো, নাগরিকত্ব নিয়ে ভয় পান না তিনি বলেন "আমরা ভারতের নাগরিক জমির পাট্টা পেয়েছি। সরকারি সুযোগ-সুবিধা পায়। এখানে

অনেক নিরাপদে আছি।" বিশেষ করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিকতম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজেকে আরও বেশি নিরাপদ মনে করেন এদেশে। কিন্তু কলোনির সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব যথাযথ কর্মসংস্থানের অভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আর্থিক সহায়তা না থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সাক্ষাৎকার: ৯, নাম: দুলাল রায়, বয়স: ৮৫, ঠিকানা: শান্তিপুর, 4 নম্বর কলোনি, নদীয়া

জীবন বৃত্তান্ত: মাত্র ১০ বছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে মূলত ধর্মীয় অত্যাচারের ভয় থেকে এপার বাংলায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে আসেন ওপার বাংলায় থাকাকালীন পৈত্রিক পেশা ছিলনা ও মাছ ধরা সামান্য যা উপার্জন হত তা দিয়েই দৈনিক জীবিকা নির্বাহ হতো আর্থিক অভাব অনটনের কারণে যেখানে দুবেলা পেটের ভাত জোটানো মুশকিল ছিল সেখানে পড়াশোনা করা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল এই মানুষগুলোর কাছ। তার ওপর হিন্দু হওয়ার কারণে জীবন সংকটের আশঙ্কা। তাই ভালো থাকার আশায় এবং নতুন জীবনের খোঁজে এদেশে চলে এসেছিলেন।

কর্মজীবন: এবার বাংলায় আসার পরও পৈত্রিক পেশার ওপর নির্ভর করে বাবা ও ছেলে দুজনেই জাল বুনতেন ও মাছ ধরতেন। বর্তমানে ওনার চার মেয়ে ও এক ছেলে যার মধ্যে দুজন মেয়ে মারা গেছেন বাকি দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে একমাত্র ছেলে দিনমজুর খাটে ও মাছ ধরে। ঘর বলতে টিনের ছাউনি কাঁচা বাড়িতে বসবাস। সরকারি সুযোগ-সুবিধা বিশেষ কিছুই পাননি। স্থানীয় নেতাদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন "সরকার কি দেয়? তোরা পাঁচ বিঘা জমি, দোতলা তিনতলা বাড়ি করে নিলি আমাদের কি দিলি? আমাদের বেলায় হয় না বেকার ভাতা ও পাইনা। বেকার ভাতায় নাম থাকা সত্ত্বেও নাম কাটা যায়"। তবে বাংলাদেশের তুলনায় এখানে তিনি ভালই আছেন। শান্তিপূর্ণভাবে কলোনির মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করছেন।

সাক্ষাৎকার: ১০, নাম: দেবাশীষ রায়, বয়স: ৫০, ঠিকানা: রঘুনাথপুর, রানাঘাট, নদিয়া

জীবন বৃত্তান্ত: খুব ছোট বেলায় বাবা মায়ের হাত ধরে স্বদেশভূমি পরিত্যাগ করে এবার বাংলায় চলে আসেন ১৯৭১ সালের দাঙ্গার পর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ নিয়ে। প্রাথমিকভাবে আশ্রয় নেয় সরকারি শরণার্থী শিবিরে পরে বন জঙ্গল পরিষ্কার করে ওনার বাবা চাষবাস ও অন্যান্য কাজকর্ম শুরু করলেও পরে চালের ব্যবসা শুরু করেন। সেখান থেকে পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদি বিভাগের চাকরিতে নিযুক্ত হন এবং 'সর্বদয় সেবা সংঘের' মাধ্যমে কলোনির মহিলাদের দিয়ে সুতো কাটাতেন। উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সাবলম্বী করে তোলা। এইভাবে যা উপার্জন হতো তাই দিয়ে পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি ওনার পড়াশোনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সর্বহারা মানুষটি। কিন্তু মাধ্যমিক দেওয়ার সময় উনার বাবা সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা যাওয়ায় উনারা নতুন করে আবার একটি সংকটের মুখোমুখি হন। "পরিবারের ওপর নেমে আসে অন্ধকারময় দিন। ভাতের জন্য এক মুঠো ক্ষুদও জুটত না" এই বলে তিনি ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসা অসহায় মানুষগুলোর দুঃখ দুর্দশার কথা আরেকবার স্মরণ করালেন।

আর্থিক প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে উনি বি.এ পাস করেন এবং মনস্থির করেন কলোনির অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াবেন তিনি। তাই জাতীয় কংগ্রেস দলের যোগদানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। কংগ্রেস দলের শ্রমিক সংগঠন INTUC-এর অধীনে একটি হকার্স ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর, শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইনে হকারীর কাজের সাথে যুক্ত প্রায় ৯৮% মানুষই হলেন ওপার বাংলা থেকে আসা, যারা রেললাইনের ধারে বিভিন্ন ঝুপড়িতে কিংবা আশেপাশের সংলগ্ন শরণার্থী শিবিরে বসবাস করতেন। এখনো বহু মানুষ হকারি করেন এবং এটাই তাদের আয়ের একমাত্র উৎস। যা দিয়ে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করান। তাদের মধ্যেই কেউ পলিটেকনিক কলেজে পড়ছে, কেউ কলকাতায় প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করছে পড়াশোনার শেষে, কেউ নাচ গান শিখছে ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্র সরকারের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন "কেন্দ্র সরকার হকার উচ্ছেদের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে ফাইন করছে কোনদিন ১২০০ টাকা কোনদিন ১৩০০ - ১৪০০ টাকা। আমাদের এই সামান্য আয়ের মধ্য থেকে গরিব মানুষদের কথা ভেবে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দিতে হয় এই টাকাটা। যাতে তারা অন্ততপক্ষে কষ্ট না পায়" এইভাবে তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থেকে কলোনির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন। বর্তমানে উনি তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTTUC-এর অধীনে হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে কাজ করে চলেছেন।

সাক্ষাৎকার: ১১, নাম: অভিজিৎ রায় (নাম পরিবর্তিত), বয়স ৪০, ঠিকানা: রঘুনাথপুর, রানাঘাট, নদীয়া

অভিজিৎ রায় এর জন্ম বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায়। জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। মা বাবা ও এক ভাইকে কেন্দ্র করে তার জীবন আবর্তিত হয় বাংলাদেশে প্রায় দশ বছর। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন বাংলাদেশেই। তিনি বলেন "বাংলাদেশে প্রতিবেশী মুসলিমদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভালো, সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ"। এর পেছনে তিনি কারণ দেখান যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তথাকথিত অশিক্ষিত অজ্ঞ গ্রামীণ মানুষকে খুব একটা স্পর্শ করত না। কবে, কিভাবে দেশভাগ হয়েছে, কিংবা বাংলাদেশ যে একসময় অখণ্ড ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ভারতের বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক ধারণা তৈরি হয় সেই সম্পর্কে তারা প্রায় কিছুই জানতেন না। লোকমুখে যেটুকু অস্পষ্ট ধারণা পেতেন সেটুকুই। তাই হিন্দু - মুসলিম দের মধ্যে সরাসরি কোন ধর্মীয় সংঘাতের মুখোমুখি তিনি হননি বলে জানান। কিন্তু তিনি ও তার পরিবার তাহলে কেন এদেশে চলে এলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন "ধর্মীয় কারণে কিংবা আর্থিক কারণে এদেশে চলে এসেছি তা নয়, বরং সবাই চলে যাচ্ছে তাই আমাদেরও চলে যেতে হবে"। প্রতিবেশী মুসলিম ভাই বোনেদের কথায় "তোমরা যেও না আমরা আছি" এই আশ্বাসবাণী সত্বেও ১৯৯০ দশকের পরে উনি সপরিবারে এপার বাংলায় এসে মামার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশে জমি জমা বিশেষ কিছুই ছিল না, তার ওপর একে একে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনরাই এপারে চলে আসছেন তাই কোন পিছুটানও ছিল না।

এপার বাংলায় আসার পর শ্রমিক হিসেবে ওনার বাবা কর্মজীবন শুরু করেন ধীরে ধীরে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছন্দতা লাভ করতে থাকেন। এখানে এসে উনি আবার পড়াশোনা শুরু করেন। এম.এ পাস করার পর শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন। তিনি মনে করেন ওপার বাংলা থেকে এখানে যারা এসেছেন তারা অনেক ভালো আছেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন "এখানে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা, আর্থিক উন্নয়নের সম্ভাবনা, প্রশাসনিক কাঠামোগত দিক দিয়ে অনেক বেশি উন্নত ইত্যাদি"। তাই এখনো অনেক মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় উন্নত জীবনের আশায় চলে আসছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরিচিতি সংকট নিয়ে সর্বদা আশঙ্কিত থাকেন। কেন্দ্র সরকারের নাগরিকত্ব আইন নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে মনের মধ্যে। তিনি বলেন "বাবার ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে সেটা যদি আমার কিংবা আমার সন্তানের সাথে ঘটে এই ভয় কাজ করে সর্বদা"। বিশেষ করে যারা ১৯৯০ এর দশকের পরে এদেশে এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই পরিচিতি সংকট দেখা যায়।

সাক্ষাৎকার: ১২, নাম: আশা লতা রায় (নাম পরিবর্তিত), বয়স ৬৮, ঠিকানা: রঘুনাথপুর, রানাঘাট, নদীয়া

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতেন। প্রতিবেশী মুসলিমদের সম্পর্কে উনার ধারণা খুব একটা ভালো না। তিনি জানান বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ দল করার জন্য কয়েকবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনরকম সহিংসতার সম্মুখীন হননি বলে তিনি জানান। কিন্তু ওনার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই চলে যাচ্ছে তাই ওনারাও সপরিবারে এদেশে চলে এসেছেন জমি জমা ঘরবাড়ি যেটুকু ছিল তা প্রতিবেশীদের বিক্রি করে।

এদেশে এসে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় নেয় দিদির বাড়িতে যাঁরা ১৯৭১ সালের পর চলে এসেছিলেন বাংলাদেশ ছেড়ে। এখানে আসার পর উনার কর্মজীবনে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ বাংলাদেশে থাকাকালীন সংসার সামলানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন এখানে আসার পরেও তাই। বরং উনার স্বামী বাংলাদেশে নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করতেন এখানে আসার পর কাঠের তৈরি দ্রব্য সামগ্রির ব্যবসা শুরু করেন। পরে দুই ছেলেও বাবার ব্যবসার সাথে যুক্ত হন। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবারের আর্থিক উন্নতি ঘটতে লাগলো বলে তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "ওখানের (বাংলাদেশ) থেকে আমরা এখানে ভালো আছি, এখানে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা"। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিচিত কোন আত্মীয়স্বজন না থাকায় যোগাযোগ সম্পন্ন বিচ্ছিন্ন। তবে জন্মভূমির প্রতি তাঁর আলাদা একটা অনুভূতি রয়েছে এখনও।

পর্যবেক্ষণঃ

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জীবনে দেখা দিয়েছিল অস্তিত্বের সঙ্কট নেমে এসেছি সাম্প্রদায়িক অত্যাচার। এবং এই জনগোষ্ঠী পরিণত হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে। ফলে স্বাধীনতার প্রকৃত অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র তৈরির জন্য বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধে এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছিল প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকার পাওয়ার আশায়। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানের রক্তে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন, কিন্তু অন্যান্য সংখ্যালঘুর মতো হিন্দুর অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং। অর্থাৎ ক্ষণকালের (১৯৭৩-৭৭) সমান নাগরিকত্বের পর বর্তমানে তাদের অবস্থা- স্থায়ী দ্বিতীয় শেণির নাগরিক ও স্থায়ী সংখ্যালঘু পরিচিতি। অর্থাৎ মাতৃভূমিতে আজ তারা পাকিস্তান আমলের মতো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক এবং বাঙালির দেশ বাংলাদেশে তারা বাঙালি হয়েও সংখ্যালঘু হিসেবে পরিচিত। ১৯৭১ সালের অত্যাচার লুটপাট হত্যাকাণ্ডের কাহিনী পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দিলেও বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিটি সরকারের শাসনকালে বিশেষ করে ১৯৯০, ১৯৯২, ২০০১-২০০৪ ও ২০১৩ সালগুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অত্যাচার লুটপাটের ঘটনা বাংলাদেশ সরকার অস্বীকার করতে পারে না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একতরফা অত্যাচারের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুদের ভূসম্পত্তি বাড়িঘরসহ স্থায়ী সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে উৎখাত করা ও তা দখল করাই হল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে কিভাবে একটা জনগোষ্ঠীকে একটি ভূখণ্ড (দেশ) থেকে উৎখাত করে ফেলার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় তা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর ক্রমহ্রাসমানতা প্রমাণ করে। বর্তমান সময়েও বাংলাদেশি হিন্দুরা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই অবহেলিত, উপেক্ষিত। বলা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে করুণা প্রার্থী একটা সম্প্রদায়। আশাহত সংখ্যালঘু প্রতিদিন তাই 'দেশত্যাগ' করছে এই বিশ্বাসে যে সমানাধিকার ও সম্মানের সাথে বসবাস করতে হলে শুধু ভাষা যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয় শুধু ধর্মও। দরকার এমন একটি বসবাসের স্থান যেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা ও ধর্ম তাদের মতো। মাতৃভূমির স্থলে দরকার এমন একটি আবাসস্থল যাকে স্বদেশ হিসেবে ভেবে প্রতারিত হতে না হয়। এই হিসেবে বাংলাদেশ ত্যাগ করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে।

বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে শুরু করে ১৯৯০ দশকের পরবর্তী সময়কালেও বাংলাদেশ থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠী এপার বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। প্রথমদিকে মূলত শহরে উচ্চবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দুরা এপার বাংলায় আসতে শুরু করেছিলেন যাদের চাষযোগ্য জমি জমা ছেড়ে আসার মত পিছুটান ছিল না। গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষজন সর্বোচ্চ দিয়ে নিজেদের ভিটেমাটি জমিজমা নিয়ে স্বদেশে আঁকড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের দাঙ্গায় ধর্মীয় কারণে অত্যাচার এতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগলো যে তখন কেবলমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ নিয়ে নিঃস্ব অসহায় মানুষগুলো এপার বাংলায় আসতে বাধ্য হলেন। তাদের মনের জোর ছিল অদম্য কেবলমাত্র সরকারি প্রাণের উপর ভরসা না করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার জন্য স্ব-স্ব উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দোকানপাঠ, হকারি, চাষবাস ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয় একটা বিষয় হলো ওপার বাংলায় যারা কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবার বাংলায় জমির অভাবে তারা অন্য কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন উনাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা এদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা কেউ কেউ পৈর্তৃক পেশায় যুক্ত হলেও অনেকে পড়াশোনা করে বিভিন্ন

সরকারি - বেসরকারি ক্ষেত্রে স্থায়ী ও অস্থায়ী পদে কর্মরত আছেন। জীবনের এই লড়াই সহজ ছিল না, তারা নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথমদিকে সন্তান-সন্ততিদের স্কুলে পড়ানোর মতো স্কুল ছিল না। উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেত না। সরকারি ত্রাণসামগ্রী জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে আজ তারা ভালো আছেন। অনেকেই দাবি করেছেন তারা বাংলাদেশের তুলনায় এখানে অনেক বেশি ভালো আছেন।

তাই ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে আসার প্রবাহমানতা ১৯৯০ দশকের পরেও বিদ্যমান যারা ধর্মীয় কারণে কোনরকম নিপীড়নের শিকার হননি তারাও চলে আসতে চাইছেন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের টানে যারা আগে এদেশে চলে এসেছেন, সর্বোপরি তারা আসতে চাইছেন একটা উন্নত জীবন লাভের আশায়। বর্তমান সময়ে যে সমস্ত মানুষ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসছে তারা সাধারণত তাদের পরিচিতির মাধ্যমে আসছে এবং এই পরিচিতির সূত্র ধরে সমাজের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করছে। ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী জনগণকে কর্মজীবনের ক্ষেত্রে একটা অঘোষিত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

"স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক ভূমিকাঃ একটি বিশ্লেষণ"—এই গবেষণা সন্দর্ভটি চারটি মৌলিক প্রশ্ন কে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যেখানে আমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এই উপসংহারে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সম্ভাব্য সুপারিশ উল্লেখ করেছি।

আমার গবেষণার প্রশ্নাবলী গুলো হলঃ

1. দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

2. স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে?

3. স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ কতদূর তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহায়ক হয়েছে?

4. পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গিয়ে কোন কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং নিজেদের স্থানীয় সমাজের অন্তর্ভুক্তিকরণ করতে কতখানি সফল হয়েছেন?

আমার গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র সমাজ ও কাঠামো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও অধিকারকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বলা যায় যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও অধিকার একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো, ন্যায়বিচার ও সমতার প্রতিফলন। দক্ষিণ এশিয়া মূলত ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় বৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল, যেখানে ধর্মীয় সহাবস্থান দীর্ঘকাল ধরে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে, কালানুক্রম অনুসারে এই সহাবস্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে, এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন মাত্রায় বৈষম্য, সহিংসতা ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন একটি বিভক্ত ও শাসনের নীতি অনুসরণ করেছিল, যার ফলে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সমাজে বিভাজন তৈরি হয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তানের বিভক্তির সময় ধর্ম ছিল প্রধান মানদণ্ড। স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রগুলো এই বিভাজনের উত্তরাধিকার বহন করে। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের কেন্দ্রে স্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে দুর্বল করেছে। ফলস্বরূপ এই উপমহাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও অধিকার এক জটিল ও বহুস্তরীয় রূপ ধারণ করেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার বিশ্লেষণ করলে

বোঝা যায় যে, এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো তাদের আইনি কাঠামোয় সমতা ও সহাবস্থানের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করলেও বাস্তব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে সংখ্যালঘুরা রয়ে গেছে একধরনের নিরাপত্তাহীনতা ও সীমিত নাগরিকত্বের মধ্যে। সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও অধিকারকে কেন্দ্র করে যে দ্বৈত বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, তা শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যাগত ব্যবধানের কারণে নয়, বরং রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর ফলেও। এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো—বিশেষত ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ—ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাঝে এক দ্বৈত টানাপোড়েনে অবস্থান করছে, যার মধ্যে সংখ্যালঘুরা ক্রমাগতভাবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে, বিশেষত আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলিতে। এখানে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর অবস্থান সংকটজনক হয়ে পড়েছে, আর তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যেমন আফগানিস্তান একটি জাতিগত ও ধর্মীয়ভাবে বৈচিত্র্যময় দেশ হলেও, ঐতিহাসিকভাবে এর রাষ্ট্র কাঠামো একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি পাশতুন প্রাধান্যশীল আদলে গঠিত। এই কাঠামো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, বিশেষত শিয়া (যারা হাজারা সম্প্রদায়ভুক্ত), হিন্দু, শিখ, ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বঞ্চনা ও পরিচয় সংকট সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র কাঠামোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর আধিপত্য সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, নাগরিক অধিকার, এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান থেকে তাদের বঞ্চিত করে। যেমন, হাজারা সম্প্রদায়, যারা শিয়া মুসলিম ও জাতিগত সংখ্যালঘু, দীর্ঘদিন ধরে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক উপেক্ষার শিকার হয়েছে। তাদের মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকায় নিয়মিত হামলা হয়েছে, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া ছিল অপ্রতুল। আফগান সমাজ কাঠামোও একটি পিতৃতান্ত্রিক, ধর্মকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীভিত্তিক কাঠামো, যেখানে সামাজিক মর্যাদা ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ফলে সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীরা প্রায়শই নীচু স্তরের সামাজিক অবস্থান লাভ করে এবং শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। তাই শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের ধর্মীয় চর্চার ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তালেবান শাসনামলে রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর এই বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য আরও প্রবল হয়েছে। তালেবান একটি কট্টর সুন্নি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলে। তাদের প্রশাসনে সংখ্যালঘুদের কোনও স্থান নেই, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ন্যূনতম সুযোগও তারা দেয় না। এর ফলে সংখ্যালঘুদের পরিচয় ধীরে ধীরে মুছে যেতে বসেছে এবং তাদের অধিকারের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই।

পাকিস্তানে, ইসলাম রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় মুসলিম সংখ্যাগুরু সমাজের বাইরে থাকা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়— বিশেষত হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ ও আহমদিয়া সম্প্রদায় বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষপাতিত্ব এবং সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এই সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে। ব্লাসফেমি আইন সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ প্রয়োগের একটি নিয়মিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ২০২৪ সালে, পাঞ্জাবের ফয়সালাবাদে দুই খ্রিস্টান ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে শতাধিক ব্যক্তি তাদের বসতি ও গির্জায় হামলা চালায়। সিন্ধু প্রদেশে হিন্দু নারীদের জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও বিয়ের ঘটনা ক্রমবর্ধমান, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের স্পষ্ট উদাহরণ।। পাকিস্তান মূলত একটি একক ধর্মীয় পরিচয়ের জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করেছে, যার ফলে বাকি পরিচয়গুলি নিরাপত্তাহীন ও অসম নাগরিকত্বের কাঠামোয় আবদ্ধ।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ নিজেকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেও, ১৯৭৭ ও ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের – বিশেষত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর – নাগরিক পরিচয় ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তন সংখ্যালঘুদের মনে রাষ্ট্রের প্রতি এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা ও অচ্ছুৎ অনুভূতির জন্ম দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে রাখার এই দ্বৈততা রাষ্ট্রের নীতিগত স্তরেই একটি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করে, যা সংখ্যালঘুদের অধিকারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এর প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও বিচার বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ। সংখ্যালঘুদের এসব কাঠামোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম, যার ফলে তাদের দাবি ও উদ্বেগ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায় না। হিন্দু সম্প্রদায়ের জমিজমা দখল, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, মন্দির ধ্বংস বা ধর্মীয় উৎসবের সময় হামলার মতো ঘটনা অনেক সময়ই স্থানীয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা বা মদদপুষ্ট গোষ্ঠীর কারণে ঘটে থাকে, যা রাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থানকে তুলে ধরে। অপরদিকে, সমাজ কাঠামোও একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি সংস্কৃতিভিত্তিক চর্চার সঙ্গে জড়িত, যা সংখ্যালঘু ধর্মীয় পরিচয়কে প্রান্তিক করে তোলে। শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়া, এবং সামাজিক আচরণে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির আধিপত্য সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চর্চাকে গৌণ করে তোলে। এই সমস্ত কারণে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাছাড়া যখনই কোনও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে দেশের মধ্যে তখনই সংখ্যালঘুদের ওপর নেমে এসেছে নির্মম অত্যাচার। অতি সম্প্রতি ২০২৪ সালের ৫ই অগাস্ট গণ-অভ্যুত্থান-কে কেন্দ্র করে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশে তৈরি হয় তার ফলে সংখ্যালঘুরা নতুন করে আবার সঙ্কটের সম্মুখীন হন, যা তাদের অস্থিত্বকে বিপন্ন করে তোলে।

ভারতের প্রেক্ষাপটে, যদিও সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমতার নিশ্চয়তা দেয়, কিন্তু সংখ্যালঘু অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নটি কেবল একটি সাংবিধানিক বা আইনগত বিষয় নয়, বরং এটি দেশটির রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজকাঠামো এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করার একটি অনিবার্য ক্ষেত্র। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমতা, ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের নিশ্চয়তা থাকলেও বাস্তবিক অর্থে সংখ্যালঘুদের অধিকার চর্চা বহু বাধা-বিপত্তি ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা—বিশেষ করে মুসলমানরা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের শিকার নন, বরং তারা প্রায়শই রাজনৈতিক সংশয়ের বস্তুও হয়ে ওঠেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে থাকলেও, গত কয়েক দশকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান সংখ্যালঘুদের জন্য এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অসুরক্ষা এবং সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির অবক্ষয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে। 'মব লিঞ্চিং', নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA), ও জাতীয় নাগরিক তালিকা (NRC)–এর মতো রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের মধ্যে এক ধরনের চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে, যা তাদের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ও নাগরিকত্বের বোধকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে।

সমাজ কাঠামোর মধ্যেও সংখ্যালঘুদের পরিচয় একটি প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। শিক্ষায়, সরকারি চাকরিতে, সামাজিক প্রতিনিধিত্বে কিংবা গণমাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ এখনও নগণ্য, এবং প্রায়শই তারা সাংস্কৃতিকভাবে 'অন্য' হিসেবে চিহ্নিত হন। তবে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলো—যেমন একটি সক্রিয় নাগরিক সমাজ, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, এবং একাধিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মতের সহাবস্থান—সংখ্যালঘুদের জন্য এখনও প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র গড়ে তোলে। ফলে, ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় ও অধিকারকে যেমন সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রাখে, তেমনি তা প্রতিরোধ ও পুনর্দাবির সংগ্রামের মাধ্যমে নতুন পরিচয় নির্মাণেরও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

নেপাল ২০০৮ সালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তবে বহু দশক ধরে হিন্দু রাজতন্ত্রের অধীনে পরিচালিত হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় স্তরে হিন্দুধর্ম একটি সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ধরে রেখেছে। সংবিধানিকভাবে (Nepal Constitution 2015, Article 4) ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণা করা হলেও মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা, উৎসব উদযাপন এবং ধর্মান্তরের অধিকার প্রসঙ্গে বৈষম্যের শিকার হন। বিশেষ করে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরের অধিকার নিয়ে একাধিকবার বিতর্ক ও দমন-পীড়নের অভিযোগ উঠেছে।

ভুটান একটি বৌদ্ধ ধর্মপ্রধান রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে Drukpa Buddhism রাষ্ট্রীয় আইডেনটিটির অংশ। সংখ্যালঘু নেপালি বংশোদ্ভূত লোটশাম্পা জনগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু, দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব, ভাষা, পোশাক ও ধর্মচর্চার দিক থেকে বৈষম্যের শিকার। ১৯৮০-৯০ দশকে হাজার হাজার লোটশাম্পা নাগরিককে

"অবৈধ" ঘোষণার মাধ্যমে দেশ থেকে বিতাড়ন করা হয়, যা দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম বড় জাতিগত বিতাড়নের ঘটনা।

শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে, বৌদ্ধ সংখ্যাগুরু জাতীয়তাবাদের ছায়ায় তামিল খ্রিস্টান ও মুসলিমদের প্রান্তিকতা স্পষ্ট। গৃহযুদ্ধকালীন ও পরবর্তী পরিস্থিতিতে তামিল সংখ্যালঘুদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক একটি দীর্ঘস্থায়ী অবিশ্বাস ও সহিংসতার ইতিহাস গড়ে তোলে। সংখ্যালঘুরা কেবল জাতিগত নয়, ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেও বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে।

সুতরাং, দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর একটি প্রান্তিক ও অনগ্রসর অবস্থানে অবস্থান করছেন। সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভূমিকা কেবল সংবিধানিক ভাষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; বাস্তবতা বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরু-বাদী রাজনৈতিক চর্চার দ্বারা প্রভাবিত। উইল কিমলিকা, মার্গারেট সিংহ কিংবা টেড রবার্ট গার-এর মত তাত্ত্বিকরা যে বাস্তবতার কথা বলেন—সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, স্বীকৃতি ও প্রতিনিধিত্ব—তা দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে এখনও অসমাপ্ত একটি লড়াই। যদিও গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচনী রাজনীতি ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু অন্তর্ভুক্তির সুযোগ তৈরি করে, তবুও বাস্তবিক পরিসরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রায়শই হয়ে পড়ে 'symbolic inclusion but material exclusion'-এর শিকার। তাঁদের সাংস্কৃতিক উৎসব, ভাষা ও ধর্মীয় অভ্যাস একদিকে সহনশীলতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হলেও, অন্যদিকে তাঁদের নিরাপত্তা, জমির অধিকার, শিক্ষা, ও রাজনৈতিক প্রভাবশক্তি প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায় থেকে যায়। অতএব, দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় কেবল সংখ্যাগত নয়, বরং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস, আইনি কাঠামোর সংকীর্ণতা, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মনোভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত এক জটিল বাস্তবতা।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের ভিত্তিতে নির্মিত জাতিরাষ্ট্রের কল্পনাকে Anderson-এর 'Imagined Communities' তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়। Benedict Anderson-এর 'Imagined Communities' তত্ত্বের মূল ভাবনা হলো, জাতি একটি 'কল্পিত' রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যা প্রকৃতপক্ষে সীমিত, সার্বভৌম, এবং তার সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য বা ভ্রাতৃত্ববোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত। Anderson-এর মতে, জাতির সদস্যরা একে অপরকে বাস্তবে কখনো না দেখলেও, তারা নিজেদের একটি সম্মিলিত জাতিসত্তা হিসেবে কল্পনা করে এবং এই কল্পনা তাদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য সৃষ্টি করে।[1] দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো—বিশেষত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা—এই কল্পিত জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় সাধারণত জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের কেন্দ্রে

[1] Anderson, Benedict, (1983), 'Imagined Communities: Reflections on the Origin Spread of Nationalism', New York, Verso, p.6.

থাকে। এ ক্ষেত্রে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্থান প্রায়শই রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে 'অন্য' (Different) হিসেবে চিহ্নিত হয়।

বস্তুতপক্ষে, যখন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো শুধুমাত্র সমতার নিশ্চয়তা দেয়, তখন সংখ্যালঘুদের স্বীকৃতির প্রশ্নটি সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি বা গোষ্ঠীভিত্তিক অধিকার প্রদান ছাড়া পূর্ণতা পায় না। তাই রাষ্ট্র যখন 'equal citizenship' এর নামে সংখ্যালঘুদের গোষ্ঠিগত চাহিদা অগ্রাহ্য করে, তখন সেই সমতা কার্যত বিভাজনকেই দৃঢ় করে। অতএব, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের সহনশীলতার ভিত্তিতে না দেখে, তাদের অধিকার ও মর্যাদাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কেন্দ্রে স্থান দিতে হবে। অন্যথায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাস্তবতা শুধু ঐতিহাসিক বঞ্চনার ধারাবাহিকতা হিসেবেই থেকে যাবে, যা সামাজিক সংহতি ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে।

আমার গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে -এই বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান একটি জটিল ও বহুস্তরীয় বিশ্লেষণের দাবি রাখে, যা ঐতিহাসিক, নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে গভীরভাবে সংযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা কেবলমাত্র সংখ্যাগত উপস্থিতির ভিত্তিতে বোঝা যায় না, বরং তা প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন সামাজিক সূচক, নীতি প্রয়োগের প্রভাব ও সামষ্টিক উন্নয়নমূলক নীতির মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই বাংলার মুসলিম সমাজ একটি পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে, ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগ পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যালঘুদের জীবনে এক গভীর অভিঘাত বয়ে নিয়ে আসে। দেশভাগ-উত্তর পরিস্থিতিতে মুসলিমদের উপর আরোপিত অবিশ্বাস, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে ক্রমাগত দুর্বল করে তোলে। জমির মালিকানা হারানো, উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি, শিক্ষা থেকে বঞ্চিতকরণ এবং রাজনৈতিক উপেক্ষা—এই বিষয়গুলো বিশেষভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় নীতিতে সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও, বাস্তব প্রয়োগে মুসলিম সম্প্রদায় উপেক্ষিত এবং প্রান্তিকই রয়ে যায়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আগমন মুসলিম সমাজে আশার সঞ্চার করে। ভূমিসংস্কার, বর্গাদার স্বীকৃতি, ও গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে কিছু মুসলিম কৃষিজীবী শ্রেণির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ ঘটে। বামফ্রন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ বাড়ায় এবং কিছু মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে আধুনিকিকরণ ঘটায়। তবে এর কার্যকারিতা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং অসম। ভূমিসংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে কিছু অংশ আর্থিকভাবে লাভবান হলেও, বৃহৎ সংখ্যক মুসলিম এই কাঠামোর বাইরেই থেকে যায়। একইভাবে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রেও মুসলিমদের প্রবেশাধিকার সীমিত ছিল, যা তাদের মানব উন্নয়ন সূচকে

পিছিয়ে রাখে। রাজনৈতিকভাবে তারা 'ভোটব্যাংক' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন থেকে তারা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন ছিল।

সাচার কমিটির রিপোর্ট (২০০৬) এই অব্যবস্থার প্রকাশ্য দলিল, যেখানে দেখা যায় মুসলিমরা জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে নয়, বরং এক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমরা শুধু আর্থিকভাবেই নয়, শিক্ষাগত, পেশাগত এবং প্রশাসনিকভাবে বহুক্ষেত্রেই অবহেলিত ও পশ্চাদপদ। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ হলেও, সরকারি চাকরি, ব্যাংক ঋণ, শিক্ষাক্ষেত্র বা স্বাস্থ্য পরিসেবায় মুসলিমদের অংশগ্রহণ নগণ্য। ফলে, বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নের যে রাষ্ট্রীয় বয়ান, তার সঙ্গে সংখ্যালঘু অভিজ্ঞতার একটি গভীর ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২০০৬-এর পরবর্তী সময়েও রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য কিছু প্রকল্প গ্রহণ করলেও—যেমন: মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ, সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগম সহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহন করলেও—তা বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। এর অন্যতম কারণ, এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে প্রশাসনিক উদাসীনতা ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব। পাশাপাশি, নিরাপত্তার প্রশ্নে মুসলিমদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আস্থাহীনতা এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা তাদের স্বাভাবিক নাগরিক অংশগ্রহণকে ব্যাহত করে রেখেছে।

দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান এর মধ্য দিয়ে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হয়ে ওঠে। এই সময় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের বিস্তৃতি ঘটে, এবং মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী, ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মতো বেশ কিছু জনপ্রিয় প্রকল্পে মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির হার বাড়ানো হয়। অর্থনৈতিকভাবে কিছু অঞ্চলে মুসলিম যুবকদের স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরি হলেও, এই উন্নয়ন ছিল বিক্ষিপ্ত ও প্রকল্পভিত্তিক। প্রকৃতপক্ষে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংখ্যালঘুবান্ধব বক্তব্য ও প্রতীকী পদক্ষেপ যেমন ইমাম ভাতা, সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প, বা শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির মতো নীতিগুলো একধরনের রাজনৈতিক সমীহ ও স্বীকৃতির জন্ম দিয়েছে। তবে এগুলোর অধিকাংশই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বল্পমেয়াদী, এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গভীরে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারেনি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় একটি দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যে অবস্থান করছে। একদিকে শহরাঞ্চলে একটি শিক্ষিত, সচেতন ও স্বনির্ভর শ্রেণির উদ্ভব ঘটছে, যারা সরকারি, বেসরকারি খাতে ও পেশাভিত্তিক উদ্যোগে যুক্ত হয়ে আর্থিক স্থিতি অর্জন করছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ ও নিম্নবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠী এখনও শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামোগত সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় এই পশ্চাদপদতা আরও প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

গবেষকের মাঠ জরিপের মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুসলিম সমাজের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে এখনও গুরুতর ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষা খাতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। তারা এখনও রাজ্যের গড়ের তুলনায় পিছিয়ে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উচ্চ ড্রপআউট হার, গার্হস্থ্য দারিদ্র্য এবং মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষার আধিক্য—এই তিনটি কারণ একে অপরকে প্রভাবিত করে শিক্ষাগত পশ্চাদপসরণকে আরো তীব্র করে তুলেছে। উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকেও মুসলিম তরুণরা পিছিয়ে থাকে, ফলে তারা কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় স্থান করে নিতে পারেন না। মহিলাদের মধ্যে এই প্রবণতা আরও প্রকট, কারণ তারা একদিকে মুসলিম সমাজের আর্থ-সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা, অন্যদিকে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার। তাছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার সীমিত সামাজিক ও আর্থিক মূল্য, এবং মূলধারার শিক্ষায় প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা মুসলিম তরুণ সমাজকে একটি দ্বৈত শিক্ষাগত দোলাচলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় দেখা যায় যে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, যেমন—হাতের কাজ, ছোটখাটো ব্যবসা, রিকশা চালানো, বস্ত্রশিল্প, কাঁচামাল পরিবহন, হকারি, কারিগরি পেশা সহ বিভিন্ন শ্রম ক্ষেত্র ইত্যাদি। মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিড়ি শ্রমিক হিসেবে নিযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই সব ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে কম মজুরিভিত্তিক, অনিশ্চিত এবং সামাজিক সুরক্ষা বিমার আওতার বাইরে। এদের মধ্যে সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সহজে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বসবাসযোগ্য বাসস্থান প্রাপ্তিতে এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সুবিধাভোগেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক অবস্থা স্পষ্ট। জমির মালিকানা ও সম্পদের প্রাপ্তির প্রশ্নে মুসলিমরা এখনও বঞ্চিত, যার ফলে তারা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতেও দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করতে পারে না। গ্রামীণ অঞ্চলে ভূমিহীনতা এবং শহরে বসবাসরত মুসলিমদের বড় অংশই বস্তি বা নিম্নমানের বসতিতে বাস করে, যা আর্থিক অস্থিরতার সাথে সাথে সামাজিক হীনমন্যতাকেও বহন করে।

রাষ্ট্রযন্ত্রের নীতিগত হস্তক্ষেপ—যেমন সংরক্ষণ নীতি, বিকাশমূলক প্রকল্প বা বিশেষ স্কিম—প্রচারে যতটা উচ্চকণ্ঠ, বাস্তবায়নে ততটাই দুর্বল। অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানরা এইসব সুবিধার বিষয়ে অজ্ঞ বা সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে তা থেকে বঞ্চিত হয়।

তত্ত্বগতভাবে, মুসলিমদের এই অবস্থানকে পিয়েরে বুরদিয়ু (Pierre Bourdieu) এর "capital theory" এর আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বুরদিয়ু তাঁর বিখ্যাত "The Forms of Capital" (1986)[2] গ্রন্থে তিন ধরনের পুঁজির কথা বলেছেন - অর্থনৈতিক পুঁজি (Economic Capital), সাংস্কৃতিক পুঁজি (Cultural

[2] Bourdieu, Pierre, (1986), 'The Forms of Capital' In John. G. Richardson (ed). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, Greenwood Press. p.p. 241–258.

Capital), ও সামাজিক পুঁজি (Social Capital) যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক পুঁজি নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজি একটি ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সমাজে অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক পুঁজি (Economic Capital) বলতে সরাসরি উপার্জনযোগ্য সম্পদ বা আয় কে বোঝায়, যা অন্য পুঁজিতে রূপান্তরযোগ্য—যেমন অর্থ ব্যয় করে শিক্ষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পুঁজি অর্জন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা ঐতিহাসিকভাবে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার, তাঁতি বা শ্রমজীবী পেশায় যুক্ত। ফলে তাদের হাতে অর্থনৈতিক পুঁজি সীমিত। এই সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ্য তাদের জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য, আবাসন ও শিক্ষার সুযোগে প্রভাব ফেলেছে। সাংস্কৃতিক পুঁজি (Cultural Capital) কে তিনি তিনটি রূপে চিহ্নিত করেন—অন্তর্নিহিত বা ব্যক্তিগত (embodied), বস্তুগত (objectified), এবং প্রাতিষ্ঠানিক (institutionalized)। অন্তর্নিহিত রূপ হলো শিক্ষা, ভাষার দক্ষতা, রুচিবোধ ও আচরণগত নমনীয়তা, যা দেহ ও মন দ্বারা ধারণযোগ্য এবং সময় সাপেক্ষে অর্জিত হয়। বস্তুগত রূপে সাংস্কৃতিক পুঁজি প্রকাশ পায় বই, বাদ্যযন্ত্র, চিত্রকর্ম বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে, কিন্তু এগুলো অর্থবহ হয় তখনই যখন ব্যবহারের সক্ষমতা থাকে—অর্থাৎ পূর্ববর্তী অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক পুঁজি থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলো শিক্ষা বা ডিগ্রির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পুঁজির স্বীকৃতি, যা সমাজে একজন ব্যক্তির মর্যাদা, চাকরির সুযোগ, বা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণে সাহায্য করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু অংশ শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে, উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার কম, এবং অনেক সময় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপদ্ধতির সাথে সাংস্কৃতিক দূরত্ব তৈরি হয়। ফলে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক পুঁজি অর্জন করার সুযোগ সীমিত, যার ফলে চাকরি বা সমাজে মর্যাদার প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে থাকে। সামাজিক পুঁজি বলতে বোঝায় এমন সম্পর্ক বা সামাজিক নেটওয়ার্ক, যা একজন ব্যক্তিকে সম্মিলিত সম্পদের সুবিধা এনে দেয়—যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব, দল বা সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া। এটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তথ্য, সহায়তা বা সুযোগ প্রদান করে এবং সামগ্রিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বহু অংশ পল্লি বা শহরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে, যেখানে প্রভাবশালী রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার কম। ফলে তারা এমন সামাজিক সংযোগ গড়ে তুলতে পারে না, যা উচ্চশ্রেণির সঙ্গে যুক্ত থাকার মাধ্যমে সুযোগ তৈরি করে। সুতরাং, এই তিনটি পুঁজির ঘাটতির ফলে মুসলমানদের সমাজে উচ্চতর অবস্থানে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়ে। বুরদিয়ুর মতে, ক্যাপিটাল হস্তান্তর একটি উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ঘটে—যেমন পরিবার থেকে সাংস্কৃতিক পুঁজি শিশুর মধ্যে স্থানান্তর। মুসলিম সমাজে এই সাংস্কৃতিক হস্তান্তর প্রক্রিয়াও ব্যাহত, বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে। এর ফলে একটি "স্ট্রাকচারাল মার্জিনালাইজেশন" সৃষ্টি হয়, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের বঞ্চনা কেবল আর্থিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর ভেতরেও গভীরভাবে নিহিত।

এইভাবে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত বাস্তবতা একটি নীতিনির্ধারণমূলক এবং তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ, যা শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ নয়, বরং একটি ইতিহাস সচেতন, ন্যায়ভিত্তিক ও সমাজতাত্ত্বিক সংবেদনার মাধ্যমে পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে এই বাস্তবতার মধ্য

থেকেও কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কিছু আংশিক অগ্রগতি, মুসলিম মধ্যবিত্তের উত্থান এবং নারী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি একটি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। তবে সেটি ছিল খণ্ডিত, অসম ও প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলায় জর্জরিত। রাজনীতি, প্রশাসন ও সমাজ—তিনটি ক্ষেত্রেই তাদের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে সীমিত পরিসরে এবং বেশিরভাগ সময়েই প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রতীকী স্তরে। এমনকি যেখানে উন্নয়ন ঘটেছে, সেখানেও তার সামাজিক সম্প্রসারণ বা ক্ষমতায়নের ধারাটি সুসংহত হয়নি। অতএব, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত, ধর্মনিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন নীতি, যা শুধু অর্থনৈতিক সাহায্য নয়, বরং সামাজিক স্বীকৃতি, নিরাপত্তা এবং মর্যাদার নিশ্চয়তাও দেবে।

আমার গবেষণা সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ কতদূর তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহায়ক হয়েছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (political empowerment) একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা কেবলমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একদিকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, নেতৃত্বে অংশগ্রহণ, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা বোঝায়; অন্যদিকে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার ও অধিকার আদায়ের দক্ষতা অর্জনের দিকটিও এতে অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (political empowerment) – এই দুইয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে এক ধরনের জটিলতা ও বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠী নানা সময়ে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থেকেছে, বিশেষত কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং পরে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনামলে। তবে এই সক্রিয়তা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সমার্থক হয়েছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একদিকে দেখা যায়, মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গের ভোটব্যাংক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। নির্বাচনের সময়ে এই সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে নানা রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে এবং মুসলিম ভোট একাংশ নির্ধারণ করে দেয় কোন দল ক্ষমতায় আসবে। উদাহরণস্বরূপ, বামফ্রন্ট সরকারের সময় মুসলিমদের সমর্থন তাদের দীর্ঘ শাসনকাল ধরে রাখতে সাহায্য করে। তেমনি, তৃণমূল কংগ্রেসও মুসলিম ভোটব্যাংকের ওপর ভর করেই ক্ষমতায় আসে এবং বারংবার নির্বাচনী সাফল্য পেয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন শাসন করলেও মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব একটি ‘symbolic inclusion’-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় ভারসাম্য রক্ষা এবং ভোটব্যাংক রক্ষার প্রয়াস থাকলেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পশ্চাদপদতা প্রকৃতপক্ষে পাল্টায়নি। এই প্রতিনিধিত্ব প্রায়শই দলীয় আনুগত্য এবং শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ফলে মুসলিম প্রতিনিধিরা স্বাধীন রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেননি। ২০১১-পরবর্তী তৃণমূল আমলে মুসলিমদের আরও বেশি সংখ্যক বিধায়ক নির্বাচিত হলেও এ প্রতিনিধিত্বের চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ। একদিকে মুসলিম ভোটব্যাংককে

তৃণমূল সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করেছে, অন্যদিকে 'নিরাপত্তা' ও 'সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি' প্রদানকে প্রাধান্য দিয়ে মৌলিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দাবিগুলিকে উপেক্ষা করেছে।

বস্তুতপক্ষে, ১৯৫২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আইনসভার নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এর শতকরা হার গড়ে ১৩.৯২ শতাংশ যা তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে যথাযথ নয়। এছাড়াও, রাজনৈতিক দলে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের স্তরে মুসলিমদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠভিত্তিক জেলাগুলোতে (বিশেষ করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর) রাজ্য আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের হার যথেষ্ট ভালো। যেমন মুর্শিদাবাদ যেখানে জনসংখ্যার শতকরা হার ৬৬.৮৮ শতাংশ সেখানে রাজ্য বিধানসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের হার গড়ে ৫৭.৬৫ শতাংশ, যা সংখ্যাগত বিচারে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব এর দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধিত্বের উদাহরণকে ভিত্তি করে বলা যায় যে, মুসলিমদের মধ্যে আঞ্চলিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কিছু লক্ষণ দৃশ্যমান—কিন্তু রাজ্য বা সামগ্রিক স্তরে এটিকে পূর্ণাঙ্গ বা সমন্বিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (comprehensive political empowerment) বলা যাবে না। তাছাড়া মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা কিছু জেলায় বেশি হলেও রাজ্য মন্ত্রী সভায় তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগন্য, ফলত তারা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কতটা প্রভাব রাখছেন—তা অনিশ্চিত। অনেক সময় দেখা যায়, তাঁরা 'সিম্বলিক প্রতিনিধি' হলেও বাস্তব নীতিনির্ধারণে প্রান্তিক থাকেন। এব্যাপারে হান্না পিটকিন (Hanna Fenichel Pitkin) এর "representational theory"[3] এবং পার্থ চ্যাটার্জি (Partha Chatterjee) এর "political society"[4] ধারণা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। হান্না পিটকিন প্রতিনিধিত্বকে কেবলমাত্র উপস্থিতির (descriptive representation) মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব কার্যকারিতার (substantive representation) দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপস্থিতি (বিশেষ করে ২০১১ সালের পর) বৃদ্ধি পেলেও সেটি কার্যকর প্রতিনিধিত্বে রূপান্তরিত হয়নি। তাদের পলিসি প্রণয়নে অংশগ্রহণ, ক্ষমতার কেন্দ্রভাগে অবস্থান, বা নিজ জনগোষ্ঠীর মৌলিক দাবি নিয়ে কার্যকর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সীমিত ছিল। ফলে এই প্রতিনিধিত্ব অধিকাংশ সময় "Symbollic" হয়ে পড়েছে, যা কেবল প্রতীকী স্বীকৃতির নামান্তর।

অন্যদিকে, পার্থ চ্যাটার্জি "political society" ধারণা ব্যবহার করলে আমরা দেখতে পারি যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ রাষ্ট্রের "civil society"-তে প্রবেশ করতে না পারলেও "political society"-র মধ্যে একটি ভোট-কেন্দ্রিক বিনিময় কাঠামোর মধ্য দিয়ে তাদের উপস্থিতি বজায় রেখেছে। এই কাঠামোতে নাগরিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মত মৌলিক বিষয়গুলো রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার আওতায়

[3] Pitkin, Hanna F. (1967),' The Concept of Representation', London, University of California Press, p.p. 60-111

[4] Chatterjee, Partha, (2011), 'Lineages of Political Society', New York, Columbia University Press, p.p. 234

থেকে যায়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব তাই প্রায়শই নির্বাচনী তৎপরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে তা পর্যাপ্তভাবে সংযুক্ত নয়।

বস্তুতপক্ষে, মুসলিমদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যদি প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটাতে পারত, তবে তা প্রভাব ফেলত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে প্রবেশাধিকারে, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে তাদের প্রতিনিধিত্বে। অথচ বাস্তবতা হলো, মুসলিমদের একটি বড় অংশ এখনও দরিদ্র, শিক্ষার হারে পিছিয়ে, এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি অত্যন্ত সীমিত। এর মানে দাঁড়ায়—রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আংশিক, অসম্পূর্ণ এবং প্রায়শই প্রতীকী।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়গুলোর একটি হলো নির্বাচনী কাঠামো ও দলীয় রাজনীতির স্বরূপ। ভারতের প্রথম-পাস্ট-দ্য-পোস্ট (FPTP) নির্বাচন ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটকে প্রাধান্য দেয়, যার ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের স্থান অনেক সীমিত হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে, যেখানে হিন্দু-মুসলিম দ্বিধাবিভক্ত ভোটব্যাংক রাজনীতির প্রধান চালিকাশক্তি, সেখানে মুসলিমদের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন প্রায় অসম্ভব, যদি না তারা কোনো প্রধান রাজনৈতিক দলের অংশ হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিমরা মূলত দুটি অবস্থানের মধ্যে বন্দী হয়ে যায়—তারা হয় একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের 'ভোটব্যাংক' হিসেবে কাজ করে, নয়তো স্বতন্ত্র দল গঠনের প্রচেষ্টায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। এই কাঠামোগত বাস্তবতা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগকে কার্যত রুদ্ধ করে দেয়। যেমন, 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট' বা ISF-এর মতো উদ্যোগ মুসলিমদের পক্ষ থেকে এক ধরণের আত্মনির্ভরশীলতার চেষ্টার নিদর্শন হলেও, তা মূলধারার রাজনীতিতে স্থান পেতে এখনো সংগ্রামরত। সার্বিকভাবে বলা যায়, মুসলিমদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তাদের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি এবং নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু এই অংশগ্রহণ এখনও পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে রূপান্তরিত হয়নি। ক্ষমতার কাঠামোতে সক্রিয় অবস্থান অর্জন এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের পথ এখনও বহু দূর বাকি।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবন, সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির দিকগুলিকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উভয় জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠলেও, তাদের প্রান্তিকতার অভিজ্ঞতায় কিছু মৌলিক মিল এবং অমিল রয়েছে। যেমন - পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার পর একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যেখানে সাংবিধানিকভাবে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেশভাগের তিক্ত স্মৃতি, দাঙ্গার অভিঘাত এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্য মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার দিকে ঠেলে দেয়। সাচার কমিটি (২০০৬) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা শিক্ষা, সরকারি চাকরি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের

ক্ষেত্রে বহুলাংশে বঞ্চিত। যদিও সাম্প্রতিক দশকে রাজনৈতিক ক্ষমতার কাঠামোয় তাদের অংশগ্রহণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সূচকে তারা এখনো পিছিয়ে আছে। অপরদিকে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ছিল আরও সংকটপূর্ণ। দেশভাগের পর বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ছিল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, যেখানে হিন্দুরা এক প্রকার রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে সংবিধানিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ইসলামের উত্থান হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকারকে সংকুচিত করেছে। 'শত্রু সম্পত্তি আইন' হিন্দুদের ভূমি অধিকারের ওপর ভয়াবহ আঘাত হানে, যার ফলে বহু হিন্দু পরিবার জমি ও সম্পত্তি হারিয়ে গৃহহীন হয়। এই প্রক্রিয়া কেবল আর্থিক দারিদ্র্য নয়, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রান্তিকতাকেও ত্বরান্বিত করে।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা সংখ্যাগত শক্তির কারণে (বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে) নির্বাচনী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে তারা রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিনির্ধারণে ও প্রার্থী নির্বাচনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করতে পেরেছে। তবে উচ্চ প্রশাসনিক স্তরে (যেমন IAS, IPS ক্যাডার) মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এখনও অপ্রতুল। বাংলাদেশের হিন্দুদের ক্ষেত্রে, তারা সামগ্রিকভাবে ক্ষমতার কাঠামো থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন। জাতীয় সংসদে কিছু হিন্দু সদস্য থাকলেও, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং, তাদের প্রতিনিধিত্ব মূলত ক্ষমতাসীন দলের আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে, স্বাধীন কণ্ঠস্বর বিরল।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের দিকে তাকালে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সমাজের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়লেও, এখনও তা জাতীয় গড়ের নিচে। গ্রামীণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার উদ্বেগজনকভাবে কম। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় শিক্ষার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে ছিল, কিন্তু দেশত্যাগ এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু ভারত অভিমুখে চলে এসেছে। ফলে গ্রামীণ হিন্দু সমাজে শিক্ষার হার ও মানের পতন ঘটেছে।

উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক নিরাপত্তার অনুভূতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে সাংবিধানিক সুরক্ষা পেলেও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনা (যেমন ধর্মীয় মেরুকরণ) তাদের নিরাপত্তাবোধে চিড় ধরিয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের হিন্দুরা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও ভূমি-সংক্রান্ত সহিংসতার কারণে একটি দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশে বসবাস করছে।

সবশেষে, ভবিষ্যত প্রবণতা বিচারে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নতির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি কারণ তারা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ

পাচ্ছে। বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও গভীর, কারণ তাদের নিরাপত্তা, সম্পদ অধিকার এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা আজও অনিশ্চিত। তাদের মধ্যে ক্রমাগত দেশান্তরের প্রবণতা এবং সামাজিক অবক্ষয় ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ সংকটের জন্ম দিতে পারে।

এই গবেষণা সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গিয়ে কোন কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং নিজেদের স্থানীয় সমাজের অন্তর্ভুক্তিকরণ করতে কতখানি সফল হয়েছে? –এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয়-জাতিগত অভিবাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশভাগ-পরবর্তীকালে বিশেষ করে ১৯৪৭, ১৯৭১, ১৯৯২ এবং ২০০১ সাল সহ বিভিন্ন সময়কালে তারা যে অভিজ্ঞান বহন করে এনেছে, তা কেবলমাত্র উদ্বাস্তু বা শরণার্থী পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়—বরং তা এক গভীর সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা, স্মৃতি ও সামাজিক উত্তরণের ইতিহাস। তারা বসতভিটা হারিয়েছিল, বহুক্ষেত্রে শিক্ষাগত ও আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, এবং নতুন ভূখণ্ডে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাব ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রশাসনিক জটিলতা, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনি বাধা, বাসস্থানের সমস্যা এবং পেশাগত স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে তারা একাধিক স্তরে বঞ্চনার শিকার হয়।

প্রথমত, তারা আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে এলেও পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে তাদের অভ্যর্থনা সবসময় স্বাগতসূচক ছিল না। বিশেষত নাগরিকত্বের আইনি জটিলতা, জমি অধিগ্রহণে অস্থিরতা, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহারের প্রবণতা এবং ‘আদি বনাম বাঙাল’ বিভাজন—এসব তাদের অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়াকে ধীর ও অসম করেছে। নানা সময়ে এদের ‘ভোট ব্যাংক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, বাস্তব জীবনে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির বাইরে।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সমাজের সঙ্গে তাদের অন্তর্ভুক্তি এক রৈখিক ও স্বাভাবিক গতি পায়নি। ভাষা, ধর্ম ও জাতিগত মিল থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক স্বর ও সামাজিক অভ্যস্ততা—যেমন খাদ্যাভ্যাস, উচ্চারণভঙ্গি, আঞ্চলিক পরিচয়—একটি গভীর পার্থক্য তৈরি করেছে, যা রাজনৈতিক মঞ্চে কখনও কখনও প্রান্তিকীকরণকে আরও প্রগাঢ় করেছে। বিশেষত শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ‘আদি’ হিন্দু সমাজে একটি সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধ কাজ করেছে, যা এই অভিবাসীদের ‘অন্য’ (Different) হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সুতরাং এই জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুতি ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যন্ত্রণার পাশাপাশি এক নতুন ভূখণ্ডে আত্মস্থ হওয়ার লড়াইয়ে নেমেছে, যেখানে গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতার প্রশ্ন ক্রমাগত তাদের তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। তবে সময়ের সাথে সাথে এই জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সমাজের সঙ্গে এক প্রকার পারস্পরিক অভিযোজনমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ভাষাগত ও ধর্মীয় মিল তাদের অন্তর্ভুক্তিকে সহজতর করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক মেরুকরন, অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিন্যাস, এবং ‘আদি বনাম নতুন’ বিভাজন তাদের ওপর এক ধরনের

প্রাত্যহিক সাংস্কৃতিক পরীক্ষাও চাপিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে, তারা নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করতে নিজস্ব সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্র গড়ে তোলে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক কাঠামোতে এক নতুন স্তরের বৈচিত্র্য যুক্ত হয়। তবে একইসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পথ গ্রহণ করেছে। তারা গড়ে তুলেছে নিজস্ব হাউজিং কলোনি, বাজার, পূজা কমিটি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমনকি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাও অর্জন করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজে সামাজিকভাবে সফল হয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষাগত ও পেশাগত ক্ষেত্রে। ফলে, তাদের এই অন্তর্ভুক্তি একধরনের স্বীকৃতিসম্পন্ন নাগরিকত্ব লাভ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায়, এই অভিবাসী সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা কেবল বঞ্চনার নয়, বরং তা প্রতিরোধ, অভিযোজন, ও নিজস্ব সামাজিক ভিত্তি নির্মাণের এক জটিল ইতিহাস। এটি নিছক আশ্রয়প্রাপ্তির ইতিহাস নয়, বরং রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একটি চলমান সংঘাত ও সমঝোতার প্রক্রিয়া—যা কখনও রাজনৈতিক সুযোগে এগিয়েছে, আবার কখনও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ায় প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে। তাদের অস্তিত্ব এখন পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু সেটি একরৈখিক অন্তর্ভুক্তির নয়, বরং তা এক বিরোধ-সমঝোতা-নির্মাণের গতিশীল ইতিহাস।

সুপারিশ সমূহঃ এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ, সমতা-ভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা, যার লক্ষ্য হবে শুধু সংখ্যাতাত্ত্বিক উন্নয়ন নয়, বরং গুণগত পরিবর্তন। এই উদ্দ্যেশ্য পূরণের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করা হলও-

- মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত পশ্চাদপসরণ দূর করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মুসলিম শিশুদের ড্রপ আউট রোধে পরিপূর্ণ বৃত্তি, মিড-ডে মিলের মানোন্নয়ন, এবং মাদ্রাসাগুলোর আধুনিকীকরণ অত্যাবশ্যক। উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারে উৎসাহ দিতে হবে হোস্টেল সুবিধা, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ, কোচিং প্রোগ্রাম ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে। তদুপরি, মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার।

- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে মুসলিম শ্রমজীবীদের সংগঠিত খাতে স্থানান্তর করার জন্য দক্ষ প্রশিক্ষণ (skill development) কেন্দ্র, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে প্রণোদনা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া উচিত। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ প্রদান করতে হবে। এছাড়া, মুসলিম বস্তি ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্লাস্টার তৈরি করে আত্মনির্ভরতা গড়ে তুলতে হবে।

- মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিস্তার করা দরকার—বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্যবিমা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবাও বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

- মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যেন কেবল ভোট প্রদানে সীমাবদ্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা ও রাজ্য পর্যায়ের রাজনীতিতে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সচেতনতা তৈরি দরকার। তাছাড়া, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মুসলিম সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে, যাতে তারা নিজ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- মুসলিমদের ব্যাংক ঋণপ্রাপ্তি, সরকারি চাকরির কোটা ও নির্বাচনী এলাকা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এই সমস্যা দূর করতে 'positive discrimination' বা অনুকূল বৈষম্য নীতিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য রোধে বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

- মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ঘিরে থাকা সামাজিক গোঁড়ামি ও বিভেদমুলক মনোভাব দূর করতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা এবং আন্ত-সম্প্রদায়িক সংলাপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্কুল-কলেজে মানবিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সহায়ক হয়।

- রাষ্ট্রীয় নীতির কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, যা অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূর করে স্থানীয় বাস্তবতাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে স্বল্পসুদে ঋণ, নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং স্থানীয় শিল্পভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প চালু করতে হবে।

এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র সরকার নয়, বরং বেসরকারি সংগঠন, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজকর্মীদের একযোগে কাজ করতে হবে। মুসলিম সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোনো দয়ার বিষয় নয়—এটি গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন এবং একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত। পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে শুধুমাত্র একটি 'সংখ্যালঘু' ইস্যু হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি রাজ্যের সার্বিক মানবোন্নয়ন, সামাজিক সংহতি ও গণতন্ত্রের টেকসই রূপায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই জনগোষ্ঠীকে অবজ্ঞা করা মানে রাজ্যের একটি বড় অংশের সম্ভাবনাকে অবজ্ঞা করা। তাই তাদের আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কেবল ন্যায়সঙ্গতই নয়, বরং একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের পূর্বশর্ত।

মন্তব্যঃ সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু। কিন্তু কিছু জেলা রয়েছে যেমন মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর - যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ আইন (Waqf Act) কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবল জনবিক্ষোভ গড়ে উঠে, যেখানে মুসলিমরা হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, দোকানপাট লুঠ করা, মহিলাদের উপর আক্রমণ করা সহ নানাবিধ হিংসাত্মক কার্যক্রম অবলম্বন করেন। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুতা সাধারণত একটি বৃহত্তর রাষ্ট্র কাঠামোয় গোষ্ঠীগত দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হলেও এই সংখ্যালঘুত্ব যখন ভৌগোলিকভাবে স্থানিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রূপ নেয়, তখন তাদের আচরণ, সামাজিক ক্ষমতা এবং অপর গোষ্ঠীর প্রতি মনোভাব একটি নতুন রূপ পেতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা, যেখানে মুসলমানরা জনসংখ্যাগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলি এই প্রশ্নটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে যে— সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠলে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণে কী ধরনের রূপান্তর ঘটে এবং সেই রূপান্তরের ফলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কোন কোন কাঠামো গড়ে ওঠে?

আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও বিধানসভা নির্বাচন ভিত্তিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভার রাজনীতিতে মুসলিমদের ক্ষমতায়ন এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলারা কতখানি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অধিকারী হতে পেরেছে এই দিকটি তুলে ধরার একটি অবকাশ থেকে যায়, যা পাঠক ও নতুন গবেষকের দল বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করতে গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

(Bibliography)

Government Sources (সরকারি উৎসসমূহ)

1. বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো, *আদমশুমারি ও গৃহগণনা,* ঢাকাঃ ২০২২।
2. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, পরিসংখ্যান প্রতিবেদনঃ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ঢাকা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ২০০১, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮।
3. Govt. of India, (Ministry of Minority Affairs), *Annual Reports-2010-11,* New Delhi: 2015.
4. Bangladesh Bureau of Statistics, *Bangladesh Population Census 1991, Community Series, Sixty Four Districts,* Dhaka: 1992.
5. Bangladesh Election Commission, '*Statistical Report, Jatiya Shangshad Election'* Dhaka: Election Commission Secretariat, 1973, 1979, 1986, 1991, 1996.
6. Govt. of India, (Ministry of Home Affairs), *Census of India* 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
7. Govt. of India, (Ministry of Home Affairs), *Population by religious community, West Bengal-2011,* Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, 2011.
8. Govt. of India, (Ministry of Minority Affairs), *PM 15 Points Programme*, New Delhi: https://www.minorityaffairs.gov.in/ (accessed on 24.08.2023)
9. Govt. of India, (Ministry of Minority Affairs), *National Commission for Minorities*, New Delhi: https://ncm.nic.in/homepage/homepage.php (accessed on 23.01.2022)
10. Govt. of West Bengal, (WBMDFC), *Micro Finance (Directly to SHGs)*, Kolkata: http://dls.wbmdfc.org:8086/loanapp2/ (accessed on 05.04.2023)
11. Govt. of West Bengal, (Minority Affairs), Darjeeling, Kolkata: https://darjeeling.gov.in/minorityaffairs/#:~:text=Schemes%20of%20Directorate%20of%20Madrasah,in%20Class%20V%20to%20VIII (accessed on 11.03.2023)
12. Govt. Of India, (Ministry of Minority Affairs), *The Report of the National Commission for Religious and Linguistic Minorities*, New Delhi: 2007,

https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=327&lid=263 (accessed on 20.11.2024)

13. Govt. of India, *Sachar Committee Report Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India*, 2006.
14. Govt. of West Bengal, *Report of the Madrasah Education Committee, West Bengal*, Kolkata: 2002.
15. Govt. of Bangladesh, *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, Dhaka: 1972.
16. Sri Lanka, (Ministry of Finance and Planning), *Census of Population and Housing 2012: Key Findings,* Colombo: UNFPA, Department of Census and statistics, 2014.

বাংলা ভাষায় লেখা উৎসসমূহ

বই ও প্রবন্ধসমূহ

1. আজাদ, সালাম, *হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে,* ঢাকাঃ সাস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।
2. আজাদ, সালাম, *বাংলাদেশে বিপন্ন সংখ্যালঘু,* কলকাতাঃ অভিযান পাবলিশার্স, ২০০৯।
3. আহমেদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৯।
4. ইসলাম, আমীরুল মোল্লা, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-২০১১): খুলনা জেলা,* ঢাকাঃ সুবর্ন প্রকাশনী, ২০১৮।
5. কবীর, শাহরিয়ার, *বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা,* ঢাকাঃ অনন্যা, ১৯৯৭।
6. কবীর, শাহরিয়ার, শ্বেতপত্রঃ *বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন,* ঢাকাঃ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ২০০৫।
7. কবির, শাহরিয়ার, *বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কঃ বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা,* ঢাকাঃ অনন্যা, ২০১৩।
8. কাওছার, এ.বি.এম রিয়াজুল কবির, *বাংলাদেশ নির্বাচন, জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৪৭-২০০৬),* ঢাকাঃ আগমনী প্রকাশনী, ২০১৬।
9. খান, ইয়াসিন, 'ভারতীয় গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার ও রাজনীতি' In সু. সেন, *ভারতীয় গণতন্ত্র প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা,* কলকাতাঃ লাকী পাবলিশার্স, ২০১৮।
10. গোস্বামী, অর্জুন, *দেশভাগ, দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,* কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০১৭।
11. চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ, *বাংলার রায়,* কলকাতাঃ গ্রন্থমিত্র প্রকাশনী, ২০১১।

12. চক্রবর্তী, দীপংকর, *বাংলাদেশ প্রসঙ্গে,* কলকাতাঃ অনীক, ২০০৭।
13. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানব,* কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭।
14. চক্রবর্তী, সুজন, *সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত,* কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২২।
15. চৌধুরী, কমল, *বাংলায় গণআন্দোলনের ছয় দশক (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতাঃ পত্র ভারতী, ২০০৯।
16. জাহান, মো. এমরান ও মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭২-২০১৪,* ঢাকাঃ অবসর, ২০১৮।
17. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, 'দেশভাগ ও বাংলার দলিত সমাজ'. In আ. হীরা, *দেশভাগে নিম্নবর্ণ,* কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০২০।
18. নাহার, মীরাতুন, *সংখ্যালঘু মানবী আমি,* কলকাতাঃ গাংচিল, ২০১২।
19. নাহার, সুলতানা, *সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও ভারত,* ঢাকাঃ ঢাকা প্রকাশনী, ১৯৯৪।
20. প্রামাণিক, বিমল, *পশ্চিমবঙ্গের অশনিসংকেত বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ,* কলকাতাঃ জি. সি. মোদক, ২০০৮।
21. পাল, বাবুল কুমার, *বরিশাল থেকে দণ্ডকারন্য পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস,* কলকাতাঃ গ্রন্থমিত্র, ২০১০।
22. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, *উদ্বাস্তু,* কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭০।
23. বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল ও সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিঃ ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮।
24. বর্মণ, রূপ কুমার, *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক,* কলকাতাঃ অ্যালফাবেট বুকস, ২০১৯।
25. বসু, দুর্গাদাস, *ভারতের সংবিধান পরিচয়,* হরিয়ানা, ভারতঃ লেক্সিস নেক্সিস, ২০১৫।
26. বসু, শিবাজী প্রতীম, 'ছিন্নমূল রাজনীতির উৎস সন্ধানে' In স. ঘোষ, *দেশভাগঃ স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০০৮।
27. বারকাত, আবুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা, অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস,* ঢাকাঃ পাঠক সমাবেশ, ২০০৯।
28. দে, অমলেন্দু, *হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রসঙ্গে,* কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০১৭।
29. দত্ত, মিলন, *কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান,* কলকাতাঃ আমারবই ডটকম, ২০২০।
30. মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ, *স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ,* কলকাতাঃ একক মাত্রা, ২০১৯।
31. মুখার্জি, মাবব, *বাংলাদেশী অনুপ্রবেশঃ রাজনীতি ও বাস্তবতা,* কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৪।
32. মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, *আমাদের জাতীয় সংসদ ও নির্বাচন,* ঢাকাঃ সময়, ২০১৭।

33. রায়, তথাগত, *যা ছিল আমার দেশ,* কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ, ২০২২।
34. রায়, মোহিত, *সংখ্যালঘু ও পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চিত ধর্মনিরপেক্ষ ভবিষ্যৎ,* কলকাতাঃ ওয়াল্ড প্রেস, ২০১৭।
35. রহমান, মতিউর ও সৈয়দ আজিজুল হক, *বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়,* ঢাকাঃ জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৯০।
36. শরীফ, আহমেদ, *বাংলাদেশ নির্বাচন ও গণতন্ত্র,* ঢাকাঃ অনন্যা, ২০১৭।
37. সরকার, দিব্যদ্যুতি, *বাংলাদেশি হিন্দু ডায়াস্পোরিক হিন্দু,* ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৯।
38. সেন, সুজিত, *ভারতীয় গণতন্ত্র প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা,* কলকাতাঃ লাকী পাবলিশার্স, ২০১৫।
39. সিংহ, কঙ্কর, *নির্বাচন, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব,* ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫।
40. সেন, মনিকুন্তলা, *সেদিনের কথা,* কলকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।
41. সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, *সাম্প্রদায়িক-জঙ্গিবাদ বিরোধী মঞ্চ, নির্যাতনের দলিল-২০০১ (নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-উত্তর সংখ্যালঘু নিপীড়ন) জঙ্গিবাদ তান্ডব-২০১২,* ঢাকাঃ ২০১২।
42. হাসান, মইনুল, *হান্টার থেকে সাচারঃ ভারতের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান,* কলকাতাঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ২০২৪।
43. হোসেন, মোল্লা আমীর, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (খুলনা পর্ব) ১৯৪৭-৭১,* ঢাকাঃ সুবর্ণ প্রকাশণী, ২০১৮।
44. হাসিনা, শেখ, *দারিদ্র্য দূরীকরণঃ কিছু চিন্তাভাবনা,* ঢাকাঃ ওসমান গনি আগানী প্রকাশনী, ২০১১।

অন্যান্য উৎসসমূহ

1. আনন্দবাজার পত্রিকা, (২০২১), মমতার পাশেই সংখ্যালঘু ভোটাররা ৩ রা মে।
2. আহমেদ, সাব্বির, (২০২২), হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমা নিয়ে বিতর্ক, ই-পেপার সময়ের আলো, ৩০ শে জুলাই। https://www.shomoyeralo.com/news/189070 (Accessed 13 May, 2024)।
3. ডয়ওচে ভেলে (Deutsche Welle), (২০২০) অস্তিত্ব সংকটে আফগান হিন্দু ও শিখরা, ১ অক্টোবর। https://www.dw.com/bn/%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AB%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81-

%E0%A6%93-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A6%B0%E0%A6%BE/a-55121944 (Accessed 10 April, 2024)

4. চৌধুরী, শুভনীল, (২০২১), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থাঃ রাজ্যে সবেতেই পিছিয়ে মুসলমানরা, আনন্দবাজার অনলাইন ২০ জানুয়ারি। https://www.anandabazar.com/editorial/minorities-of-bengal-is-lagging-behind-in-education-health-and-employment/cid/1262183
5. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, (২০২৪) জাতিগণনাই কি সমাধান, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯ শে জুন।
6. ওয়ার্ল্ড ফেইথস ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ, (২০২১), দক্ষিণ ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ১৭ই জুন। https://www.peacemakersnetwork.org/wp-content/uploads/2021/06/Bengali-Minority-Rights-and-Freedom-of-Religion-or-Belief-in-South-and-Southeast-Asia.pdf (Accessed 10 September, 2024)
7. নাগ, সৌমেন, (২০১৯), স্থানান্তরিত জনস্রোতের সুনামি আনতে পারে বিপর্যয়. একক মাত্রা, মার্চ।
8. পণ্ডিত, হীরেন, (২০২২), সংখ্যালঘু নির্যাতনঃ যে গল্পের শেষ নেই, অপরাজেয় বাংলা ২৩ শে ফেব্রুয়ারি। https://www.aparajeobangla.com/opinions/news/21703 (Accessed 12 September, 2024)
9. বেরা, অঞ্জন, (২০২৪), বামফ্রন্ট সরকার বিকল্প নীতির দিশা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ২১ শে জুন https://cpimwb.org.in/left-front-government-the-ardent-alternative/ (accessed on 23.01.2025)
10. ভট্টাচার্য, সায়ন্ (২০১৫), সংখ্যালঘু উন্নয়নের ফানুস ফুটো নবান্নেরই রিপোর্টে, আনন্দবাজার পত্রিকা ১ লা জানুয়ারি। https://www.anandabazar.com/west-bengal/%E0%A6%B8-%E0%A6%96-%E0%A6%AF-%E0%A6%B2%E0%A6%98-%E0%A6%89%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B0-%E0%A6%AB-%E0%A6%A8-%E0%A6%B8-%E0%A6%AB-%E0%A6%9F-%E0%A6%A8%E0%A6%AC-%E0%A6%A8-%E0%A6%A8-%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%B0-%E0%A6%AA-%E0%A6%B0-%E0%A6%9F-1.101724 (accessed on 12.04.2023)
11. মুখোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ (২০১৯), স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, একক মাত্রা, মার্চ।
12. মোড়ল, শিশির, (২০২১), ৫০ বছরে দেশে ৭৫ লাখ হিন্দু কমেছে, ঢাকাঃ প্রথম আলো, ১৪ই নভেম্বর। https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A7%AB%E0%A7%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AB-

%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96-
%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81-
%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87 (accessed on 03.02.2025)

13. আনন্দবাজার পত্রিকা, (২০২৪), মুসলিমদের স্বাস্থ্য-শিক্ষায় উন্নয়ন চাই, ৫ জন বাচ্চার কথা ভাবব কেন? ফিরহাদের উল্টো সুর হুমায়ুনের, ১৬ ই ডিসেম্বর। (https://bengali.abplive.com/district/tmc-mla-humayun-kabir-expresses-separate-opinion-on-minority-controversy-raised-by-firhad-hakim-1110798 (accessed on 23.12.2024)
14. হক, সেখ সাইদুল, (২০২৩), রাজ্যে বাম জমানায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং গ্রাম বাংলার সংখ্যালঘু জনগণ, দেশহিতৈষী, ২৮ শে এপ্রিল।
15. রায়, সুমিত, (২০১৮), সংখ্যালঘু বিতর্ক, লিটলম্যাগ আনএডিটেড, ২৯ শে এপ্রিল। https://www.littlemag.org/2018/04/discussion-on-minority.html (accessed 12 February, 2024)
16. স্মারকলিপি (২০০৯), সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭ ই ডিসেম্বর।

English Language Sources

Books & Journals

1. Alam, Mohd. Sanjeer, 'Educational Status of Muslims', in Hilal Ahmed et Al. *Rethinking Affirmative Action for Muslims in India*, Hyderabad: Centre For Development Policy and Practice (CDPP), 2025.
2. Aleaz, Bonita, 'Madrasa Education, State and Community Consciousness: Muslims in West Bengal', Economic and Political Weekly, Vol. 40. No. 6. 2005.
3. Akbar, M.J. 'Minority and Minorityism: The Challenge before Indian Muslims' In A. Shaban (ed). *Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence*, London and New York: Routledge, 2018.
4. Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin Spread of Nationalism*, New York: Verso, 1983.

5. Bandhopadhya, Sekhar, 'The Minorities in Post-Partition West Bengal: The Riots of 1950' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed). *Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal*, New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.
6. Basu, Durga Das, *Introduction to the Constitution of India*, Nagpur: LexisNexis, 2011.
7. Basu, Jayanti, *Reconstructing the Bengal Partition: The psyche under a different violence*, Kolkata: Samya, 2013.
8. Barkar, Abul, *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property*, Dhaka: Pathak Shamabesh, 2008.
9. Banerjee, Dilip, *Election Recorder: A Analytical Reference*, Kolkata: Star Publishing House, 2012.
10. Baxter, Craig, and M. Rashiduzzaman, 'Bangladesh Votes: 1978 and 1979', Asian Survey, Vol. 21, No. 4, April, 1981.
11. Bourdieu, Pierre 'The Forms of Capital' In John G. Richardson (ed). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press, 1986.
12. Chatterji, Joya, *The Spoils of Pratition, Bengal and India 1947-1967*, Cambridge University Press, 2007.
13. Chatterji, Joya, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
14. Chatterjee, Partha, *Lineages of Political Society*, New York: Columbia University Press, 2011.
15. Chopra, Suneet, 'Problems of the Muslim Minority in India', Social Scientist, Vol. 5, No. 2, September 1976.
16. Dasgupta, Abhijit, Masahiko Togawa and Abul Barkat (ed). *Minorities and the State: Changing Social and Political Landscape of Bengal*, New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.
17. Das, Pranab Kumar and Sugata Marjit, 'Socio-economic Status of Muslims in West Bengal: Reflections on a Recent Report', Economic and Political Weekly, Vol.51, No.46. November 12, 2016.

18. Das, Samir Kumar (ed). *Minorities in South Asia and Europe*, Kolkata: SAMYA Publications, 2010.
19. Das, Samir Kumar, 'wrestling with My Shadow: The state and the Immigrant Muslims in Contemporary West Bengal' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) *Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal*, New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.
20. Deng, F. M. 'Minorities, Rights, and Conflict', Journal of International Affairs, Vol. 52, No. 2, 1998.
21. Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Pantheon Books, 1977.
22. Foucault, Michel, *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*, New York: Pantheon Books, 1976.
23. Giddens, Anthony, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge, UK: Polity Press, 1991.
24. Gurr, Ted Robert, and James R. Scarritt, 'Minorities Rights at Risk: A Global Survey', Human Rights Quarterly, Vol. 11, No. 3, 1989.
25. Gurr, Ted Robert, *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*, Washington D.C: United States Institute of Peace, 1993.
26. Halim, Ssdeka, 'Status of Hindu Women: Spheres of Human Rights Violation in Bangladesh' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) *Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal*, New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.
27. Hasan, Zoya, *Politics of Inclusion: Caste, Minorities and Affirmative Action*, New Delhi: Oxford University Press, 2009.
28. Husain, Zakir and Amrita Chatterjee, 'Primary Completion Rates across Socio-Religious Communities in West Bengal', Economic and Political Weekly, Vol. 44, No. 15, 2009.
29. Islam, Maidul 'Communists and the fulfillment of secular promises in West Bengal', Pakistan Monthly Review: An Independent Socialist Journal, vol. 7, No.3. March, 2025, https://pakistanmonthlyreview.com/communists-and-the-fulfilment-of-secular-promises-in-west-bengal/?utm_source=chatgpt.com (accessed on 02.01.2025)

30. Justice Sinha, Surendra Kumar, *A BROKEN DREAM: Rule of Law, Human Rights & Democracy*, USA: Lalitmohan-Dhanabati Memorial Foundation, 2018.
31. Kabir, Muhammad Ghulam, *Minority Politics in Bangladesh*, Dhaka: Vikas Publisher, 1980.
32. Kathinka Sinha- Kerkhoff, *Tyranny of Partition: Hindu in Bangladesh and Muslims in India*, New Delhi: Gyan Publishing, 2006.
33. Khan, Muin-Ud-Din Ahmad, 'Economic Conditions of the Muslims of Bengal under the East India Company (1737–1860)', Islamic Studies, Vol. 6, No. 3. 1967.
34. Kottak, Conrad Philip, *Anthropology: Appreciating Human Diversity*, New York: McGraw-Hill Education, 2021.
35. Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, New York: Oxford University Press, 1995.
36. Maharana, Dilip Kumar, 'In Defence of Indian Perspective of Multiculturalism', The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 1, 2010.
37. Nakatani, Tetsuya, 'Partition Refugees on Borders: Assimilation in West Bengal' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) *Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal*, New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.
38. Niaz, Noorjehan Safia and Apte, J. S., 'Muslim Women and Law Reforms: Concerns and Initiatives of the Excluded within the Excluded' In A. Shaban (ed). *Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence*, London and New York, Routledge, 2018.
39. Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge: Massachusetts, Harvard University Press, 2000.
40. Parekh, Bhikhu 'Defining India's Identity', India International Centre Quarterly, Vol. 33, No. 1, 2006.
41. Pitkin, Hanna F. *The Concept of Representation*, London: University of California Press, 1967.
42. Puniyani, Ram, 'Muslims and Politics of Exclusion' In A. Shaban (Ed). *Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence*, London and New York, Routledge, 2018.

43. Oxford University Press. (n.d.), 'Minority', In Oxford English Dictionary.
44. Robertson, Ian, *Sociology*, New York: Worth Publication, 1978.
45. Robinson, Rowena, (ed.) *Minority Studies*, New Delhi: Oxford University Press, 2012.
46. Robinson, Rowena, 'Socio-economic Backwardness & Discrimination: The Case of Indian Muslims', Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 44, No. 2. 2008.
47. Sen, Rangalal, 'Role of Civil Society in Combating Violance aganist Religious Minorities during the Post-2001 General Elections of Bangladesh' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) *Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal*, New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.
48. Shaban, Abdul, *Lives of Muslims in India: Politics, Exclusion and Violence*, London and New York: Routledge, 2018.
49. Singha, Manoj Kumar, 'Minority Rights: A Case Study of India', International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 12, No. 4, 2005.
50. Singh, Rajeev, 'Citizenship, Exclusion & Indian Muslims', The Indian Journal of Political Science, Vol. 71, No. 2. April-June, 2010.
51. Sumon, Mahmudul H., 'Why Refer to the Hindus in Bangladesh as a Minority', No. 40, Modern South Asia: A Space of Intercultural Dialogue, 2016.
52. Taylor, Charles 'The Politics of Recognition' In A. Gutmann, (ed). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, New Jersey: Princeton University Press, 1992.
53. Togawa, Masahiko, 'Hindu Minority in Bangladesh: Migration, Marginalization, and Minority Politics in Bengal' In A. Dasgupta, M. Togawa and A. Barkat (Ed.) *Minorities and the State, Changing Social and Political Landscape of Bengal*, New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd, 2011.
54. Weber, Max, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Los Angeles: University of California Press, 1978.
55. Weiner, Myron, 'India's Minorities: Who Are They? What Do They Want?' In P. Chatterjee (ed). *State and Politics in India*, Calcutta: Oxford University Press, 1998.

56. Wirth, Louis, *The Problem of Minority Groups*, New York: Irvington Publication, 1993.
57. Yasmin, Taslima, 'The enemy property laws in Bangladesh: Grabbing lands under the guise of legislation', Oxford University Commonwealth Law Journal, 15(1), October, 2015.

Other Sources

1. Aid to the Church in Need (ACN), (2023), Religious Freedom in the World Report: Bhutan.https://acninternational.org/religiousfreedomreport/reports/country/2023/bhutan (accessed on 20.08.2023)
2. Akins, Harrison, (2020), Challenges to Religious Freedom in Bangladesh, USCIRF, Washington DC https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Bangladesh%20Country%20Update.pdf (accessed on 03.01.2025)
3. Amnesty International, (2020), Pakistan: Accusations of Blasphemy continue to endanger lives, 25th August. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/accusations-of-blasphemy-in-pakistan-continue-to-endanger-lives/ (accessed on 15.04.2023)
4. Anandakugan, Nithyani, (2020), The Sri Lankan Civil War and Its History, Revisited in 2020, Harvard International Review, 31st August, https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war (accessed on 03.01.2025)
5. Bhutan Constitution https://www.constituteproject.org/constitution/Bhutan_2008 (accessed on 03.06.2023)
6. CPI (M), (2009), Thirty Years of West Bengal Left Front Govt. 9th September. https://cpim.org/thirty-years-west-bengal-left-front-govt/ (accessed on 10.09.2024)
7. CPI (M) Campaign Material, (2011), Left Front Government & The Development of Muslim Minorities in West Bengal, West Bengal Assembly Election, April-May,

https://cpim.org/wp-content/uploads/old/documents/2011-minority.development_wb.pdf (accessed on 13.09.2024)

8. Choudhary, Vikash K. (2021), 'The Idea of Religious Minorities and Social Cohesion in India's Constitution: Reflections on the Indian Experience', MDPI, 21st October. https://www.mdpi.com/2077-1444/12/11/910 (accessed on 05.07.2023)
9. Datta, Biplab Kumar and Chowdhury, Sanjoy Kumar, (2024), Religious minority status and risk of hypertension in women: Evidence from Bangladesh, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39035524/ (accessed on 17.01.2025)
10. Datta, Romita (2023), Didi's gifts for Minorities in West Bengal, India Today. 1st May. https://www.indiatoday.in/magazine/up-front/story/20230501-didis-gifts-for-minorities-in-west-bengal-2362845-2023-04-21 (accessed on 21.03.2024)
11. Deschenes, Jules (1985), Promotion, Protection and Restoration of Human Rights at the National, Regional and International Levels. 181, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31. file:///C:/Users/HP/Downloads/E_CN.4_Sub.2_1985_31-EN.pdf (accessed on 23.03.2024)
12. EASO, (2020), Country of Origin Information Report – Afghanistan: Sikhs and Hindus, European Asylum Support Office. https://euaa.europa.eu/publications/country-guidance-afghanistan-may-2024 (accessed on 12.12.2024)
13. Economics Times Analysis Group, (2015)
14. European Parliament (2019-2024), Blasphemy laws in Pakistan, in particular the case of Shagufta Kausar and Shafqat Emmanuel, P9_TA (2021)0157, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0157_EN.pdf (accessed on 23.01.2024)
15. Hanstad, Tim and Brown, Jennifer (2001) Land Reform Law and Implementation in West Bengal: Lessons and Recommendations, RDI (Rural Development Institute) Reports on Foreign Aid Development, December, https://www.researchgate.net/publication/228163446_Land_Reform_Law_and_Im

plementation_in_West_Bengal_Lessons_and_Recommendations (accessed on 23.02.2024)

16. Human Rights Watch, (2010), Pakistan: Massacre of Minority Ahmadis. New York: 1st June. https://www.hrw.org/news/2010/06/01/pakistan-massacre-minority-ahmadis (accessed on 09.07.2023)
17. Hussan, MD Nazeer, Minorities of Pakistan, https://ebooks.inflibnet.ac.in/hrdp06/chapter/minorities-of-pakistan/ (Accessed 12 April, 2024)
18. International Commission of Jurists, (2018), Challenges to Freedom of Religion or Belief in Nepal: A Briefing Paper International Commission of Jurists, July, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/08/Nepal-Freedom-of-religion-brief-Advocacy-Analysis-brief-2018-ENG.pdf (accessed on 09.10.2024)
19. Association SNAP, Guidance Guild, Pratichi Institute, Living Reality of Muslims in West Bengal: A Report, Pratichi Institute. 2016.
20. Maldives, (2023), Minority Rights Group, https://minorityrights.org/country/maldives/ (Accessed 13 April, 2024)
21. Maldives (2023), International Religious Freedom Report, USCIRF https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/maldives/ (accessed on 23.01.2024)
22. Mishra, Piyush (2024), 2,200 cases of violence against Hindus in Bangladesh, 112 in Pakistan: Government. India Today, 20th December. https://www.indiatoday.in/india/story/government-data-violence-against-hindus-minorities-bangladesh-pakistan-2652948-2024-12-20 (accessed on 05.03.2025)
23. Pakistan, Minority Rights Group, https://minorityrights.org/country/pakistan/ (Accessed 12 April, 2024)
24. Ray, Atmadip (2009), Multinational consultant for SHGs in West Bengal, The Economic Times, 13th July. https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/multinational-consultant-for-shgs-in-west-bengal/articleshow/4772502.cms (accessed on 04.08.2024)

25. Sengupta, Anwesha, (2024), The Refugee Colonies of Kolkata: History, Politics and Memory, New Delhi: Sahapedia. https://www.sahapedia.org/refugee-colonies-kolkata-history-politics-and-memory?utm_source=chatgpt.com (accessed on 03.01.2025)
26. Sharda, Divyanshi, (2024), Land Reforms in India's West Bengal: Through the Lense of Policy Theories, Centre for Development Policy and Practice, 29th May. https://www.cdpp.co.in/articles/land-reforms-in-india-s-west-bengal-through-the-lens-of-policy-theories#:~:text=However%2C%20this%20centuries%2Dold%20stability,only%20obtain%20a%20much%20higher (accessed on 03.01.2025)
27. Singh, Shiv Sahay, (2021), 'Old and new faces, Representation for Women and Muslims in West Bengal Cabinet', The Hindu, 10th May. https://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/old-and-new-faces-representation-to-women-and-muslims-in-west-bengal-cabinet/article34524022.ece (Accessed 25 April, 2024)
28. The Hindu, (2011), Mamata boost to projects for minorities, 31st July. https://www.thehindu.com/news/national/mamata-boost-to-projects-for-minorities/article2309056.ece (accessed on 12.07.2024)
29. The Hindu, (2016), List of Ministers in Mamata's Cabinet, 27th May. https://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/list-of-ministers-in-mamatas-cabinet/article8654872.ece (Accessed 22 April, 2024)
30. The Hindu, (2024), Minorities faced 205 attacks after fall of Sheikh Hasina government in Bangladesh: Hindu groups, 10th August. https://www.thehindu.com/news/international/minorities-faced-205-attacks-after-fall-of-sheikh-hasina-government-in-bangladesh-hindu-groups/article68508954.ece (accessed on 02.03.2025)
31. The Statesman, (2024), Budget allocation for minority affairs & madrasah education goes up, 9th February. https://www.thestatesman.com/bengal/budget-allocation-for-minority-affairs-madrasah-education-goes-up-1503268027.html (accessed on 24.03.2025)

32. U.S. Department of State, (Office of International Religious Freedom), (2020), Bhutan 2020 International Religious Freedom Report, USA: https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/bhutan/ (accessed on 12.07.2023)
33. U.S. Department of State, (Office of International Religious Freedom), (2023), Report on International Religious Freedom: Bangladesh. USA: https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/bangladesh/ (accessed on 23.04.2024)
34. The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition.
35. United Nations Human Rights, (Office of the High Commission), (1992), Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 18th December, General Assembly resolution 47/135.
36. USCIRF- Recommended for Countries of Particular Concern CPC), (2023), Annual Report-2023. https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2023-05/Pakistan.pdf (accessed on 23. 02, 2024).
37. UNESCO, Universal Declaration on Linguistic Rights, 1996, Article 3.1
38. Varennes, Fernand de, (2023), Report of the Special Rapporteur on minority issues, A/74/160, United Nations General Assembly, 26th January. https://digitallibrary.un.org/record/3823138 (accessed on 23.03.2025)
39. Vulnerability and Religious Minorities in Nepal in the context of Covid-19 pandemic (2020), Samari Utthan Sewa (SUS), Nepal. http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-ANM-011-2020/ (accessed on 12.06.2024).
40. V. Pillai, Aneesh, Protection of Minorities under International Law, https://ebooks.inflibnet.ac.in/hrdp04/chapter/protection-of-minorities-under-international-law/ (Accessed 12 December, 2024)'

সাক্ষাৎকারঃ

1. বিপুল মাঝি, ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প ৬ নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া (০৫.০৪.২০২৫)
2. গৌতম সাহা, ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প, ৬ নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া (০৫.০৪.২০২৫)
3. দেবেন্দ্রনাথ দে, ঠিকানা কুপার্স ক্যাম্প, ৪ নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া (০৫.০৪.২০২৫)
4. বিপ্লব রায়, (নাম পরিবর্তিত), ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প, নদীয়া (০৫.০৪.২০২৫)
5. সুখেন হালদার, ঠিকানা: কুপার্স ক্যাম্প, চার নম্বর ওয়ার্ড, নদীয়া (০৫.০৪.২০২৫)
6. রবীন্দ্রনাথ হালদার, ঠিকানা: শান্তিপুর, 4 নম্বর কলোনি, নদীয়া (০৬.০৪.২০২৫)
7. সুমন বিশ্বাস, ঠিকানা: শান্তিপুর ৪ নম্বর কলোনি (০৬.০৪.২০২৫)
8. সঞ্জয় সান্যাল, ঠিকানা: শান্তিপুর, চার নম্বর কলোনি, নদীয়া (০৬.০৪.২০২৫)
9. দুলাল রায়, ঠিকানা: শান্তিপুর, 4 নম্বর কলোনি, নদীয়া (০৬.০৪.২০২৫)
10. দেবাশীষ রায়, ঠিকানা: রঘুনাথপুর, রানাঘাট, নদিয়া (০৫.০৪.২০২৫)
11. অভিজিৎ রায় (নাম পরিবর্তিত), ঠিকানা: রঘুনাথপুর, রানাঘাট, নদীয়া (০৬.০৪.২০২৫)
12. আশা লতা রায় (নাম পরিবর্তিত), ঠিকানা: রঘুনাথপুর, রানাঘাট, নদীয়া (০৬.০৪.২০২৫)

পরিশিষ্ট (Appendix)

নমুনা প্রশ্নবলী (Sample Questionnaire)

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field Survey)

(মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পৌরসভা এবং তিন পাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত)

তারিখঃ _____

১। উত্তরদাতার নামঃ _____

২। অভিভাবকের নামঃ_____

৩। ঠিকানাঃ _____

৪। লিঙ্গঃ পুরুষ/ মহিলা/ অন্যান্য

৫। বয়স পরিসরঃ (ক) ১৮-২৫, (খ) ২৫-৩৫, (গ) ৩৫-৬০, (ঘ) ৬০ এর ঊর্ধ্বে

৬। বৈবাহিক অবস্থানঃ বিবাহিত/ অবিবাহিত/ বিবাহবিচ্ছিন্না/ বিধবা

৭। আপনি কোন শ্রেণীর তালিকাভূক্তঃ সাধারণ/ ওবিসি এ/ওবিসি বি/ তপশীল জাতি/তপশীল উপজাতি।

৮। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নিরক্ষর/ প্রাথমিক/ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/অন্যান্য।

৯। আপনার পেশাঃ কৃষিকাজ/ দিনমজুর/ সরকারি চাকরী/ বেসরকারি চাকরী/ ব্যবসা/ শিক্ষার্থী/ অন্যান্য।

১০। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যাঃ_____

১১। পরিবারের মোট উপার্জনশীল ব্যাক্তির সংখ্যাঃ_____

১২। আপনার পরিবারের গড় মাসিক আয়ঃ (ক) ১০, ০০০ টাকা পর্যন্ত (খ) ১০,০০১ - ২০,০০০ টাকা (গ) ২০,০০১ - ৩০,০০০ টাকা (ঘ) ৩০,০০১ - ৫০,০০০ টাকা (ঙ) ৫০,০০১ ও তার ঊর্ধ্বে

১৩। আপনার বাসস্থান সম্পর্কিত নিচের কোন কোন সুবিধা বর্তমান আছে? (একাধিক অপশনে টিক দিতে পারেন)

(ক) কাঁচা ঘর/পাকা ঘর/ (খ) নিজস্ব শৌচালয় আছে/শৌচালয় নেই/ (গ) বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ আছে/বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ নেই/ (ঘ) বিদ্যুৎ সংযোগ আছে/বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।

১৪। আপনি কি কোন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন? হ্যাঁ/ না।

(যদি উত্তর "হ্যাঁ" হয়, তাহলে নিচের প্রকল্পগুলোর মধ্যে আপনি যেসব প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন, সেগুলির পাশে টিক দিন)

ক্রমিক নম্বর	বর্তমান সরকারের সময়কালে গৃহীত সরকারি প্রকল্পসমূহ	সাহায্য পাওয়া প্রকল্পে (টিক চিহ্ন দিন)
১	ওবিসি তালিকায় নাম অন্তভূক্তিকরণ সাহায্য	
২	বাংলা আবাস যোজনা/গীতাঞ্জলী প্রকল্প	
৩	কৃষক বন্ধু প্রকল্প	
৪	মানবিক পেনশন প্রকল্প	
৫	অসহায় পরিত্যক্তা সংখ্যালঘু মহিলা পুনর্বাসন কর্মসূচী প্রকল্প	
৬	বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প	
৭	ঋণ সহায়তা প্রকল্প	
৮	লক্ষ্মীরভাণ্ডার প্রকল্প	
৯	ঐক্যশ্রী প্রকল্প	
১০	কন্যাশ্রী প্রকল্প	
১১	রুপশ্রী প্রকল্প	
১২	স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প	
১৩	খাদ্যসাথী প্রকল্প	
১৪	অন্যান্য সরকারি প্রকল্প	

১৫। সরকারি প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার কোন অপ্রিয় অভিজ্ঞতা?

১৬। সরকারের থেকে আর কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন----

১৭। আপনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত---- হ্যাঁ/ না।

(উত্তর হ্যাঁ হলে) বর্তমানে কোন পদে আছেন বা অতীতে পদে ছিলেন-

রাজনৈতিক দলের নাম	রাজনৈতিক পদের নাম	সময়কাল
তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)	সাংসদ	
বামফ্রন্ট (CPIM)	বিধায়ক	
জাতীয় কংগ্রেস (INC)	প্রধান	
ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)	গ্রাম সদস্য	
ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (ISF)	সভাপতি	
অন্যান্য	অন্যান্য	

১৮। আপনার রাজনৈতিক কাজকর্মের কোন অভিজ্ঞতা---

১৯। আপনি কী ডিজিট্যাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করেন---হ্যাঁ/ না।

(উত্তর হ্যাঁ হলে) ডিজিট্যাল ডিভাইসের নাম ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য-

ডিজিট্যাল ডিভাইসের নাম	ব্যবহারের মাধ্যম	ব্যবহারের উদ্দেশ্য
স্মার্ট ফোন	ফেসবুক	এডুকেশন
ল্যাপটপ	হোয়াটসঅ্যাপ	অনলাইন শপিং
কম্পিউটার	ইউটিউব	ব্যবসা-বানিজ্য
অন্যান্য	ইনস্টাগ্রাম	অফিসিয়াল কাজকর্ম
	ট্যুইটার	বিনোদন
	অন্যান্য	অন্যান্য

২০। আপনি কী পশ্চিমবঙ্গে যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন----হ্যাঁ। না।

(উত্তর না হলে) কর্মসংস্থানের জন্য আপনাকে কোথায় চলে যেতে হচ্ছে—

(i)

২১। এখানে কর্মসংস্থানের জন্য আপনাকে কী ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন/মুখোমুখি হতে হচ্ছে?

২২। আপনি কী প্রথম থেকে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন---হ্যাঁ/ না। (উত্তর না হলে) আপনি আগে কোথায় বসবাস করতেন—

(i)

২৩। আপনি কোন সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন---হ্যাঁ/ না।

(উত্তর হ্যাঁ হলে) তার অভিজ্ঞতা কী--

২৪। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ব হিসেবে আপনি কি কখনো হিংসার সম্মুখীন হয়েছেন---হ্যাঁ/ না।

(উত্তর হ্যাঁ হলে) কোন সময়ে এবং কী ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন-

সহিংসতার ধরণ (পরিবারের যে কোনো সদস্য)	তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনকাল (২০১১-২০২৪)	বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকাল (১৯৯১-২০১১)	উত্তরদাতার মতে সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংসতা ছিল কোনটি
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা			
ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া			
সরকার নির্বাচনে ভোট প্রদানে বাধা			
শারীরিক নির্যাতন			
মেয়েদের উত্যক্ত করা			
ধর্ষণ			
হত্যা			
ব্যবসা-বাণিজ্য বাধার সম্মুখীন			
কর্মস্থলে ভয়ভীতি প্রদর্শন			
সম্পত্তি লুঠ			
অন্যান্য			

মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্র সমীক্ষার বিশেষ কিছু চিত্রঃ

MOB - 9732628360
ধুলিয়ান পৌরসভার নতুন বাজার ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার
মহঃ পারভেজ আলম (পুতুল)-এর অফিস
০৮ নং ওয়ার্ডের সকল নাগরীকদের পরিষেবা দেওয়ায়
একমাত্র আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
নতুন বাজার, ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
GPS Map Camera
Dhuliyan, West Bengal, India
MWMX+7PH, Thakurpara, Dhuliyan, Anup Nagar, West Bengal 742202, India
Lat 24.683387°
Long 87.949492°
24/06/24 11:34 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Dhuliyan, West Bengal, India
MWMX+7PH, Thakurpara, Dhuliyan, Anup Nagar, West Bengal 742202, India
Lat 24.683165°
Long 87.949362°
24/06/24 11:08 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Dhuliyan, West Bengal, India
MWMX+7PH, Thakurpara, Dhuliyan, Anup Nagar, West Bengal 742202, India
Lat 24.683069°
Long 87.949327°
24/06/24 10:50 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Dhuliyan, West Bengal, India
MXM2+F9J, Dhuliyan, West Bengal 742202, India
Lat 24.683843°
Long 87.951083°
23/06/24 01:32 PM GMT +05:30

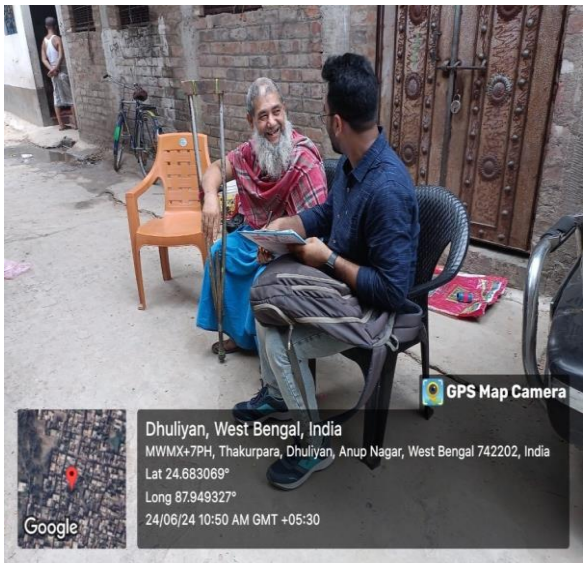

নদীয়া জেলার সাক্ষাৎকারের বিশেষ কিছু চিত্রঃ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীঃ একটি সামগ্রিক পরিচয়

তৃতীয় অধ্যায়

সংখ্যালঘু মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতার পর বাংলার রাজনীতিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অংশগ্রহণ

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ববঙ্গ/বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি কেস স্টাডি

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার